1951, 52

বিজ্ঞাপন

প্রতি সংখ্যার জন্য চাঁদার হার ঃ—

ভারতের মধ্যে (ডাকমাশুল নিয়ে)	২৷৷০ টাকা
প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য—	১৷৷০ „
ভারতের বাইরে	৪ শিলিং

প্রেসিডেন্সি কলেজের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র, অধ্যাপক বা কলেজ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে রচনা আহ্বান করা হচ্ছে সাদরে। সাধারণের কৌতূহলোদ্দীপক হৃদয়গ্রাহী রচনাবলী এবং এই কলেজ ও বিদ্যালয় সম্পর্কিত পত্রাদি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। উপযুক্ত ডাকটিকিট-যুক্ত শিরোনামা লিখিত লেফাফা সংগে না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

রচনা কাগজের একপিঠে লিখে "সম্পাদক, প্রে. ক. প"এর নামে পাঠাতে হবে। রচনা সংগে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা পাঠাতে হবে।

পত্রিকা-সক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে প্রকাশনা বিভাগের সম্পাদকের সংগে পত্রালাপ চলবে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

আশ্বিন ১৩৫৮ ঃঃ ~~দ্বাত্রিংশ বর্ষ~~ Vol. 33 ঃঃ অক্টোবর ১৯৫১

কলেজ প্রসঙ্গ

শোকসংবাদ

অর্থনীতির অধ্যাপক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়ের আকস্মিক মৃত্যু সবাইকে গভীরভাবে বিচলিত করেছে। মাত্র গত বৎসর অগাস্ট মাসে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাদের কলেজে আসেন; গ্রীষ্মাবকাশের পরে কলেজ খোলবার অতি অল্পদিন আগে দিন-কয়েকের নিউমোনিয়া রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। এই কয়েকমাসেই তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী ও ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর শোচনীয় মৃত্যুতে অর্থনীতি বিভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হল—বিশেষ করে এই অভাব বোধ করবে অনার্স ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা।

অধ্যাপকমণ্ডলীতে পরিবর্তন

বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র হুগলী মহসীন কলেজে যোগদান করেছেন, এবং আমাদের কলেজে এই বিভাগে এসেছেন শ্রীভূদেব চৌধুরী। দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর সরোজকুমার দাস অবসরগ্রহণ করেছেন। ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত সংস্কৃত কলেজে যোগ দেবেন, তবে আপাততঃ তিনি এখানেও ক্লাস নিচ্ছেন। গণিতের অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন বিদায় নিয়েছেন; পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগে নূতন এসেছেন শ্রীসনতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার শূরের কার্য্যভার নিয়েছেন শ্রীপরেশকিশোর সেন চৌধুরী। শ্রীসুবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রসায়ন বিভাগে এবং শ্রীঅজিতকুমার সাহা ভূবিদ্যা বিভাগে যোগদান করেছেন, শেষোক্ত বিভাগে পার্ট-টাইম অধ্যাপক হিসাবে এসেছেন শ্রীযুক্ত পি. কে. চট্টোপাধ্যায়। উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শ্রীনীরদকুমার সেন লেডী ব্রেবোর্ন কলেজে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন।

তিনি আবার ফিরে এসেছেন। শারীরবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় বিদায় নিয়েছেন এবং নূতন এসেছেন শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রুদ্র এবং শ্রীঅচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়। গাণতের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর বিভূতিভূষণ সেন হুগলী মহ্‌সীন কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছেন। মোটামুটি এই হ'ল আমাদের অধ্যাপকমণ্ডলীতে সাম্প্রতিক পরিবর্ত্তন।

ডক্টর সরোজকুমার দাসের অবসর গ্রহণে দর্শনবিভাগের অধ্যাপকবৃন্দ এবং ছাত্রছাত্রীরা পদে-পদে তাঁর অভাব অনুভব করছেন। তাঁর মতন অভিজ্ঞ এবং সুযোগ্য অধ্যাপকের স্থান পূর্ণ করা কঠিন হবে।

শারীরবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জ্জী সম্প্রতি American Association for the Advancement of Science-এর Fellow নির্ব্বাচিত হয়েছেন; আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ছাত্রছাত্রী সংবাদ

বিজ্ঞানে ৭২৫ জন এবং আর্ট্‌সে ৩৬৪ জন নিয়ে ৩১।৩।৫১ তারিখে আমাদের কলেজের মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল ১০৪৯। এঁদের মধ্যে আনুমানিক ১০০ জন ছাত্রী আছেন।

পরীক্ষার ফলাফল এবারে ভালই হয়েছে। কতজন খুব উচ্চস্থান পেলেন, তার চেয়ে বড় কথা হ'ল অধিকসংখ্যক ছাত্রের পরীক্ষার ফল কেমন হয়েছে। এবারে আই. এ. ও আই. এস-সি. পরীক্ষায় আমাদের কলেজের পাশের হার যথাক্রমে ৮৭% ও ৯৩.৬%; প্রথম বিভাগ যথাক্রমে ৫৩% ও ৮৬.১%। বি. এ. পরীক্ষাতে পাশের হার ৬৯.০৫% এবং প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছেন ৭ জন, এঁদের মধ্যে বোধ হয় ৬ জনই বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম স্থান পেয়েছেন। বি. এস. সি.তে পাশের হার ৭১·৫% এবং প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছেন ১৫ জন। ১৯৫০ সালের এম. এ. ও এম. এস-সি. পরীক্ষাতে আমাদের কলেজের ছাত্রছাত্রীরা কেমন করেছেন তার বিস্তারিত খবর পাওয়া গেল না। বাকী পরীক্ষাগুলিতে যেসব ছাত্রছাত্রী প্রথম ১০ জনের মধ্যে স্থান বা প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছেন নীচে তাঁদের নাম দেওয়া হল:

আই. এ.—শ্রীসুখময় চক্রবর্ত্তী (২য়)
শ্রীযতিকুমার সেনগুপ্ত (৩য়)
শ্রীপার্থসারথি গুপ্ত (৬ষ্ঠ)
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ (৯ম)
আই. এস-সি.—শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য (৫ম)
বি. এ.—শ্রীশঙ্কর দত্ত (ইতিহাস)
শ্রী শ্রীলা মহলানবিশ (দর্শন)
শ্রীঅরুণ দাশগুপ্ত (ইংরাজী)

শ্রীঅতীন্দ্রমোহন গুণ (সংখ্যাবিজ্ঞান)
শ্রীঅনীশকুমার মৈত্র (গণিত)
শ্রীপ্রহ্লাদ বসু (অর্থনীতি)
শ্রীদেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (অর্থনীতি)

বি. এস. সি.—রসায়ন—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র দত্ত, শ্রীসমীর সরকার, শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
পদার্থবিজ্ঞান—শ্রীতুহিনা ঘোষ, শ্রীপ্রদ্যোত সেন, শ্রীপ্রভাকর পাত্র, শ্রীবিশ্বরঞ্জন নাগ
গণিত—শ্রীকমলেন্দু দাস, শ্রীঅম্বরীশ ঘোষ, শ্রীঅসীম রায়
শারীরবিজ্ঞান—শ্রীপুণ্যব্রত সরকার, শ্রীসুখময় লাহিড়ী, শ্রীরাজর্ষি মজুমদার
উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান—শ্রীঅশোক সিংহ
ভূবিজ্ঞান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রমোহন নাহা

কৃতী ছাত্রছাত্রীদের আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

খেলাধূলা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র পাওয়া যাবে। এবারে আমাদের ফুটবল টীম কয়েকটি দুর্দ্ধর্ষ কলেজকে হারিয়েছে। এটা নাকি আমাদের কলেজের ট্র্যাডিশন-বিরোধী—কথাটা অপ্রিয় হ'লেও বোধ হয় মিথ্যা নয়।

হিন্দীবিভাগের খবর—জয়পুরিয়া কলেজের হিন্দী-সমিতি পরিচালিত তুলসী-জয়ন্তী (৯ই অগাস্ট, ১৯৫১) উপলক্ষ্যে একটি আন্তঃকলেজ রচনা প্রতিযোগিতায় আমাদের কলেজের ২য় বার্ষিক বিজ্ঞান শ্রেণীর ছাত্র শ্রীউমাকান্ত উপাধ্যায় "ভারতীয় সংস্কৃতি এবং রামচরিতমানস : এক তুলনামূলক সমালোচনা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

প্রাক্তন ছাত্রসংবাদ

আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছেন। ফুটবল টীমের প্রাক্তন অধিনায়ক শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ঘোষ এখন ইংলণ্ডে, বিদেশেও তিনি ক্রীড়ানৈপুণ্যের জন্য খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন।

খবরাখবর

ডেনিশ ভূ-প্রদক্ষিণ অভিযানের অন্তর্ভুক্ত জাহাজ H. M. S. Galathea এখানে আসা উপলক্ষ্যে ২৭শে এপ্রিল আমাদের ফিজিক্স থিয়েটারে অনুষ্ঠিত একটি সভায় Dr. T. Wolff ফিল্‌মের সাহায্যে একটি বক্তৃতা দেন Means of Exploring Conditions of Life in Ocean Depths—এই বিষয়ে। অভিযানের নেতা Dr. A. Brunn এবং অন্যান্য বিদেশী অতিথিরা আমাদের বিজ্ঞান-বিভাগের প্রধান অধ্যাপকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা এবং আমাদের ল্যাবরেটরীগুলি পরিদর্শন করেন।

১৫ই অগাস্ট স্বাধীনতা-দিবস প্রতিপালন করা হয়, কলেজের ছাদে পতাকা-উত্তোলন হয় এবং পরে মিষ্টান্ন বিতরিত হয়।

৩০শে অগাস্ট Eastern Economist পত্রিকার সম্পাদক Mr. E. P. W. Da Costa আমাদের কলেজে Conditions of Economic Progress-শীর্ষক একটি বক্তৃতা দেন। সভায় প্রধানতঃ অর্থনীতি বিভাগের ছাত্ররা উপস্থিত থেকে প্রশ্নোত্তর এবং আলোচনায় উৎসাহ দেখান।

৩রা সেপ্টেম্বর N. C. C. 6th Bengal Battery (কলেজের একটি ইউনিট) যুদ্ধক্ষেত্রে artillery-র প্রয়োগ বুঝিয়ে দেবার জন্য কলেজের মাঠে একটি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। ৭ই সেপ্টেম্বর N. C. C.'র 1st Bengal Brigade Commandant মেজর গুরুবচন সিং ছাত্রদের একটি সমাবেশে N. C. C.তে যোগ দেওয়ার আবশ্যকতা সম্পর্কে বক্তৃতা দেন।

ছাত্রাবাস

২য়, ৩য় ও ৪র্থ বর্ষ মিলিয়ে ইডেন হিন্দু হস্টেলে ছাত্রসংখ্যা এখন ১৩০ ; পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ছাত্রাবাসে ২৭ জন আছেন। শ্রীভূপেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক-পদ ত্যাগ করেছেন, তাঁর বদলে এসেছেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীজনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী। হিন্দু হস্টেলে সহকারী তত্ত্বাবধায়ক শ্রীসত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ছাত্রাবাসে শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য্য। প্রসঙ্গত বলে রাখা যায় যে দু'টি পৃথক ছাত্রাবাস থাকার উপকারিতা বোধ হয় আবাসিকরা নিজেরাই উপলব্ধি করেন না, কারণ ইডেন হিন্দু হস্টেল থেকে ৫ম ও ৬ষ্ঠ বর্ষকে স্থানান্তরিত করাতে সবশ্রেণীর ছাত্রদেরই অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ মনে হয়।

লাইব্রেরী

৩১।৩।৫১ তারিখে বইয়ের সংখ্যা ছিল ৭০,৩৮১ ; সাময়িকীর সংখ্যা ১৬১। এই বছরে ৪১৮ খানা নূতন বই কেনা হয়েছে এবং সরকারী ও অন্যান্য স্থান থেকে ৯১ খানা বই এসেছে। কার্ড ইনডেক্স তৈরী করা অনেকটা অগ্রসর হয়েছে।

কলেজ পত্রিকা

গত সংখ্যায় সম্পাদক লিখেছিলেন "মুদ্রিত পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা দরকার।" এবারে কিছু বেশী টাকা মঞ্জুর হওয়ার ফলে দুটি সংখ্যাপ্রকাশ করা সম্ভব হবে, কিন্তু স্বভাবতঃই, আর্থিক বরাদ্দ সমস্তটা একটি সংখ্যার জন্য খরচ করলে সেটিকে যতটা চিত্তাকর্ষক করে তোলা যায়, এবারে তা আর সম্ভব নয়। তবু, পত্রিকা-উপসমিতির মতে একটির চেয়ে দুটি সংখ্যা বাঞ্ছনীয়—কিছুটা সঙ্কুচিত -কলেবর হ'লেও এই সঙ্কুচিত আকারের একটি পত্রিকায় মনোনীত রচনা সবগুলির স্থান হ'ল না, কয়েকটি তাই পরবর্ত্তী সংখ্যার জন্য তুলে রাখা হয়েছে।

পাঠ্য-বহির্ভূত কাজকর্মের একটা ঐতিহ্য আমাদের বরাবরই আছে। এবারেও দেখছি, নবাগত তৃতীয় বর্ষ এরই মধ্যে পাঠচক্র ও নিজস্ব পত্রিকার আয়োজন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন—এঁদেরই অনেকে প্রথম বর্ষে 'নবীন' বলে হাতে-লেখা পত্রিকাটিতে লেখার হাত পাকিয়েছিলেন। আমাদের প্রকাশনা-বিভাগ অবশেষে প্রাচীর পত্রিকাটিকে আবার চালু করেছেন, আশাকরি 'দেয়ালি' এবার থেকে নিয়মিত বার হবে। ছাত্রছাত্রীদের সমস্ত রচনা কলেজ পত্রিকায় প্রকাশ করা অসম্ভব; দেয়াল-পত্রিকা বা হাতে-লেখা পত্রিকার প্রয়োজন তাই খুব বেশী। প্রসঙ্গত, গতবারের রবীন্দ্রপরিষদের পরিচালনায় ছাত্রছাত্রীদের রচনা পাঠ ও আলোচনার জন্য ২।১টি সাহিত্যসভার আয়োজন হয়েছিল, এটা চালিয়ে যাওয়া উচিত মনে হয়। শান্তিনিকেতনে প্রচলিত এই নিয়মটির মধ্যে আপত্তিজনক কিছুই নেই। কলেজের, বিশেষতঃ কলেজ ইউনিয়ন-সংক্রান্ত নানা খবর দিয়ে গতবারের মত এবারেও একটি বুলেটিন ('প্রকাশনী') বার হবে বলে আশ্বাস পেয়েছি।

বিতর্ক-উপসমিতি বোধহয় বছরের প্রথম দিকে খানিকটা বিশ্রাম করে নিয়েছিলেন। এখন তাঁরা প্রশংসনীয়ভাবে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন—অতি অল্পদিনের মধ্যেই বেশ কয়েকটি চিত্তাকর্ষক বিতর্কের আয়োজন করা হয়েছে।

অন্যান্যবারের তুলনায় কিন্তু এবারে কয়েকটি সেমিনার একটু নিস্তেজ হয়ে পড়েছে মনে হয়। ইচ্ছা করলেই সেমিনারের আসর জমিয়ে তুলতে পারেন এমন ছাত্রের অভাব তো কলেজে নেই! অর্থনীতি সেমিনারের উদ্যোগে এবারে 'মক্-পার্লামেণ্ট' ব্যাপারটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজেও সংক্রামিত হয়েছে, সম্পূর্ণ নূতন একটি অনুষ্ঠানকে দাঁড় করানোয় অর্থনীতির ছাত্ররা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তবে এজন্য সময় এবং পরিশ্রম কম লাগেনি।

'মক্-পার্লামেণ্টে' ২।৩টি ছাত্রীকে সক্রিয়ভাবে যোগ দিতে দেখলাম আর সম্প্রতি মেয়েরা সম্পূর্ণ নিজেদের উদ্যমে একটি গীতিবিচিত্রার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু অনেক ব্যাপারে ছাত্রীদের নিষ্ক্রিয়তা দেখে একটু অবাক লাগে—উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি যে কলেজ পত্রিকার জন্য মেয়েদের কাছ থেকে এখনও একটি রচনাও পাইনি (অবশ্য এ বিষয়ে ছাত্ররাও প্রায় সমান উদাসীন)—অথচ সংখ্যার দিক দিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রীদের আর কিছুতেই নগণ্য বলা চলে না।

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে যাঁরা রচনা, বক্তৃতা বা কিছুটা গম্ভীর আলাপ-আলোচনায় উৎসাহী, তাঁদের অভিমত প্রকাশের সুযোগসুবিধা বোধ হয় অন্য সব কলেজের তুলনায় এখানে অনেক বেশী। তা সত্ত্বেও যদি দেখি যে পত্রিকাগুলি চলছে না, বিতর্ক-সভা জমছে না, বা সেমিনার অচল, তাহ'লে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকদের অনুযোগ করার আগে ভেবে দেখতে হয়—সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা কি লিখবার বা বলবার কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না, এবং কেন?

নোনাজল থেকে

অধ্যাপক **রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়**

সারা পৃথিবীতে জুড়ে রয়েছে মাটি, পাথর, জল আর বায়ু। এর প্রত্যেকটিকেই যুগ যুগ ধরে মানুষ কোন না কোন কাজে লাগিয়েছে। মাটির উপরের স্তর কর্ষণ করে শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছে। গভীরতর প্রদেশ থেকে উত্তোলন করেছে কয়লা, বিবিধ ধাতুর আকরিক, খনিজ তেল। বায়ুতে মিশে থাকা বিভিন্ন গ্যাসকে পৃথক করে চিনে নিয়েছে। মানুষের কাজে লাগিয়েছে। নাইট্রোজেন গ্যাসকে পৃথক করে নিয়ে তার থেকে সংশ্লেষণ করেছে অ্যামোনিয়া যার থেকে তৈরি হয়েছে অ্যামোনিয়ম সলফেট। জমির সার হিসাবে এর ব্যবহার খুব প্রচলিত। বিশুদ্ধ অক্সিজেন খুব বেশি পরিমাণে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, অগ্নিশিখার উত্তাপ বৃদ্ধির জন্যে অক্সিজেন মিশ্রিত অ্যাসিটিলিন কিংবা হাইড্রোজেন গ্যাসের ব্যবহার কলকারখানায় চালু হয়েছে। তারপর যে সব গ্যাস অত্যন্ত বিরল, খুব স্বল্প পরিমাণে যা' বায়ুতে বর্তমান, তাও বিজ্ঞানীর গোচরীভূত হয়েছে। আর্গন, আজ বিদ্যুৎ শিল্পে ব্যবহার হচ্ছে। নিয়ন গ্যাস রাজপথের প্রাচীর বিজ্ঞাপনে লাল আলো বিকিরণ করছে। হিলিয়ম বিমান পোতে ব্যবহার করা হচ্ছে, হালকা বলে।

পানীয় হিসাবে, ঘর দুয়ার পরিষ্কার করতে, জামা কাপড় কাচতে জলের ব্যবহার স্মরণাতীত যুগ থেকে চলে আসছে। বিজ্ঞানের প্রসারের সংগে সংগে জল বিভিন্ন কাজের উপযুক্ত করে তোলবার জন্যে সূক্ষ্মতর শোধনের প্রণালীও উদ্ভাবিত হয়েছে। পানের উপযোগী করতে জলের জীবাণু-নাশের ব্যবস্থা হয়েছে। কাপড় কাচতে সাবান যাতে বেশি না ক্ষয় হয়, তার জন্য জল কোমল করা প্রচলিত হয়েছে। বড় বড় বয়লারে জল ফোটালে কলাই যাতে কম পড়ে তার জন্য কোমলায়ন অপরিহার্য বলে জানা গেছে। ইঞ্জেকশন দেবার ঔষধের দ্রাবক হিসাবে বিশুদ্ধতম জলের প্রয়োজন। জল চোলাইয়ের বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারা বিশুদ্ধতম জল প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে।

সমুদ্রের জল স্বাদে কটু ;—পানীয় বা কাপড় কাচা বা বয়লারে ফোটানোর জন্যে একেবারে অযোগ্য। অথচ পৃথিবীতে সমুদ্রের অভাব নেই, সমুদ্রে জলের অভাব নেই। সমুদ্রের জল উবিয়ে কেলাসিত লবণের দানা মানুষ অনেক দিন থেকেই ব্যবহার করে আসছে। লবণ কেবল তরকারি স্বাদযুক্ত করবার জন্যেই ব্যবহার করা হয় না। শিল্পেও লবণের বহুল ব্যবহার চলেছে। সেকথা পরে আসছে। সাগরের জলে দ্রবিত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। খাদ্যলবণ ছাড়াও পাওয়া গেছে ম্যাগনেসিয়ম সলফেট, ভাল জোলাপ হিসাবে যা' সুপরিচিত। তার উপর আরও আছে আইওডিন, পটাসিয়ম আইওডাইড যৌগিক রূপে।

যদি এক মাইল লম্বা, একমাইল চওড়া আর এক মাইল গভীর সমুদ্রের জলের আয়তনের কল্পনা করি, তাহলে তার থেকে পাই খাদ্যলবণ যার বৈজ্ঞানিক নাম সোডিয়ম ক্লোরাইড। এর পরিমাণ ১২৮,০০০,০০০ টন। এর মূল্য প্রায় ১৩০ কোটি টাকা। এর পরেই পরিমাণের দিক থেকে নাম করা যায় ম্যাগনেসিয়ম ক্লোরাইডের, ১৮,০০০,০০০ টন। মূল্য প্রায় ৩৫ কোটি টাকা। তারপর ম্যাগনেসিয়ম সলফেট, যার উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি। পরিমাণ ৭,৮০০,০০০ টন, মূল্য প্রায় ১২ কোটি টাকা। শুধু এই নয়, আছে এক কোটি টাকা মূল্যের ৩৫৮,০০০ টন ম্যাগনেসিয়ম ব্রোমাইড ; আছে পটাসিয়ম সলফেট, ৪,০ ০,০০০ টন, মূল্য প্রায় চার কোটি টাকা। ব্রোমিন একটি তরল রাসায়নিক পদার্থ। আজকাল এর চাহিদা হয়েছে। সাগরজলে দ্রবিত ম্যাগনেসিয়ম ব্রোমাইড থেকে ব্রোমিন তৈরি সম্ভব এথিলিন ব্রোমাইড বলে একটি তরল রাসায়নিক পদার্থ আজকাল বিমান পোতে ব্যবহার হচ্ছে। এটি তৈরী করতে ব্রোমিন লাগে। সাতাশ মণ সাগর জলে প্রাপ্ত ম্যাগনেসিয়ম ব্রোমাইড থেকে মাত্র একছটাক ব্রোমিন পাওয়া যায়। অথচ এই ব্রোমিন তৈরী পদ্ধতি এত বেশি চালু হয়েছে যে কেবল এইভাবে আমেরিকায় এখন বছরে দশ হাজার টন ব্রোমিন সমুদ্রের জল থেকে পৃথক করা ম্যাগনেসিয়ম ব্রোমাইড থেকে তৈরি হচ্ছে।

তিরিশ বছর আগেও ম্যাগনেসিয়ম ধাতুর তেমন ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। বছরে বিশহাজার মণও না। অথচ এখন একমাত্র আমেরিকাতেই বছরে ৪৫ লক্ষ মণ ম্যাগনেসিয়ম ধাতু উৎপন্ন হচ্ছে। এর বেশির ভাগ পরিমাণই কেবল মাত্র সমুদ্রের জলে থাকা ম্যাগনেসিয়ম যৌগিক থেকে নিষ্কাশিত হয়। একশত ভাগ সাগরের জলে মাত্র চৌদ্দভাগ ম্যাগনেসিয়ম যৌগিক থাকে। অথচ এখন রসায়ন শিল্প পদ্ধতি এত অল্প পরিমাণ ম্যাগনেসিয়ম যৌগিক থেকেও লাভজনক প্রণালীতে ম্যাগনেসিয়ম ধাতু উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। ম্যাগনেসিয়ম ক্লোরাইড থেকে ম্যাগনেসিয়ম ধাতু নিষ্কাশন প্রণালী জানা ছিল। কিন্তু সস্তায় সমুদ্রের জল থেকে ম্যাগনেসিয়ম ক্লোরাইড পৃথক করে নেওয়ার পদ্ধতি মাত্র বিশ বছর আগে জানা গেছে। এক বছর ধরে আমেরিকার রসায়নবিদ আর এঞ্জিনীয়াররা মেক্সিকোর উপসাগরের তটভূমিতে উপযুক্ত স্থানের সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। দুটো জিনিষ সব চেয়ে বেশি দরকার চুণ আর ম্যাগনেসিয়ম ক্লোরাইড। দুটি যাতে সহজে পাওয়া যায় এবং এক জায়গায় এনে ফেলবার খরচা কম পড়ে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। টেক্সাস অঞ্চলে ফ্রিপোর্ট পোতাশ্রয় অঞ্চলে উপযুক্ত স্থান পাওয়া গেল। পোতাশ্রয়ের দিকে সমুদ্রের জল প্রবাহিত হয়ে এলে প্রায় ৩০০০ লক্ষ গ্যালন জল দৈনিক পাম্প করে টেনে নেওয়া হয়। প্রথমে এই বিপুল জলরাশি থিতিয়ে নিয়ে, পরিস্রুত করা হয়। তারপর দশফুট ব্যাসের মোটা নলে মিনিটে দশহাজার গ্যালন জল প্রবাহিত করে চুণ মিশ্রিত করবার পাত্রে ঢেলে দেবার জন্য তৈরি রাখা হয়। শামুকের খোলা পুড়িয়ে প্রয়োজনীয় চুণ তৈরি করে

নেওয়া হয়। শামুকের খোলা সংগ্রহ করা হয় নিকটবর্তী গ্যাল্‌ভস্টন উপসাগর অঞ্চল থেকে। প্রথমে খোলাগুলি ভাল করে সমুদ্রের জল দিয়ে ধুয়ে নেওয়া হয়। তারপর পাঁজা করে সাজিয়ে আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া হয়। পাঁজাগুলি খুব বেশি উঁচু করা হয় না, লম্বায় প্রায় তিনশত ফুট হয়, আর গ্যাস চুলার সাহায্যে দগ্ধ করা হয়। চুলার গ্যাসও পাওয়া যায় ঐ অঞ্চলের খনিজ তেলের খনি থেকে। তাই সব দিক থেকে বিবেচনা করে ফ্রিপোর্ট পোতাশ্রয় অঞ্চল ম্যাগনিসিয়ম নিষ্কাশনের উপযুক্ত স্থান বলে বেছে নেওয়া হয়েছে।

এখন সমুদ্রের জলে চূণ মেশাবার সময় বেশ ভাল জল নেড়ে নেবার ব্যবস্থা থাকে, জাহাজের জল-কাটা পাখার মত পাখা জলের ভিতরে ঘোড়ানো হয়, তাতেই জলে যথেষ্ট আলোড়ন হতে থাকে, আর চূণের গোলা বেশ ভাল করে মেশার সুযোগ পায়। তাতে ম্যাগনেসিয়ম যৌগিকগুলির ম্যাগনেসিয়ম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়ম সলফেট ও ম্যাগনেসিয়ম ব্রোমাইড-এর সংগে চূণ বা ক্যালসিয়ম হাইড্রক্সাইডের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ম্যাগনেসিয়ম হাইড্রক্সাইড সমুদ্রের জল থেকে কঠিন পদার্থরূপে পৃথক হয়ে আসে। তখন ম্যাগনেসিয়ম হাইড্রক্সাইড ঐ বিপুল পরিমাণ জল থেকে পরিস্রুত করে পৃথক করে নেওয়া হয়। এই ভাবে লব্ধ ম্যাগনেসিয়ম হাইড্রক্সাইড-এর সংগে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশ্রিত করে ম্যাগনেসিয়ম ক্লোরাইড যৌগিক তৈরি করে নেওয়া হয়। এবং ম্যাগনেসিয়ম ক্লোরাইড থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহের সাহায্যে ম্যাগনেসিয়ম ধাতু নিষ্কাশন করা সহজেই সম্ভবপর হয়। এই ভাবে ম্যাগনেসিয়ম ধাতু নিষ্কাশন করাতে ১৯১৫ সালে এক পাউণ্ডের দাম যেখানে কুড়ি টাকা ছিল আজ তা পাঁচ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে।

বিবিধ রাসায়নিক শিল্পের লবণ একটি অপরিহার্য অংগ। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে সমুদ্রের জল থেকে পাই লবণ আর লবণ থেকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ক্লোরিন গ্যাস আর সোডিয়ম হাইড্রক্সাইড বা ক্ষার। এ দুটি রাসায়নিক থেকে আবার বিবিধ শিল্পের অভ্যুদয়। ক্লোরিন থেকে পাই ব্লিচিং পাউডার, ক্লোরোফর্ম, বিবিধ বিষাক্ত গ্যাস, ক্লোর-অ্যাসেটিক অ্যাসিড আর ফস্‌জিন গ্যাস। ক্লোর-অ্যাসেটিক অ্যাসিড থেকে তৈরি হয় নীল রঞ্জন। ফস্‌জিন থেকে বিবিধ রঞ্জন দ্রব্য। এদিকে সোডিয়ম হাইড্রক্সাইডের সাহায্যে সাবান আর কৃত্রিম রেশম শিল্প গড়ে উঠেছে।

PRESIDENCY COLLEGE UNION COUNCIL

EXECUTIVE COMMITTEE

SESSION 1950-51

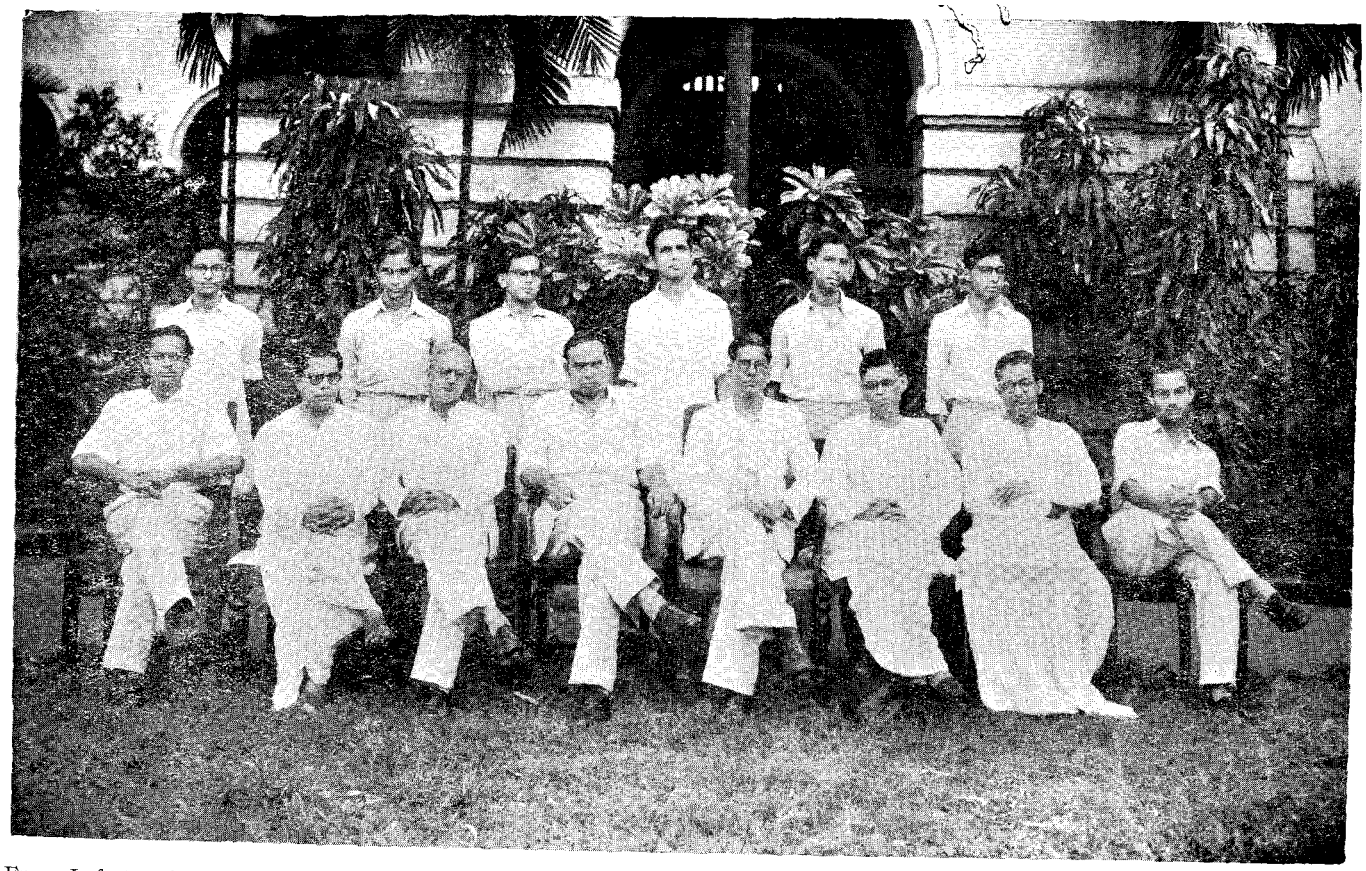

From Left to Right :
Sitting :—R. M. Ghosh (General Secretary), Prof. A. Majumdar (Chairman, Debate Section), Prof. F. D. Bhar (Bursar), *Principal* J. C. Sengupta, *Prof.* N. K. Sen (*Chairman*, Drama Section), Prof. J. Chakravarty (Chairman, S. S. Section), Prof. D. Bhattacharya (Chairman, Rabindra Parishad), Sri S. Chakravarty (Vice-Pesident).
Back Row :—M. Roy (Asst. General Secy.), S. Mukherjee (Secy., Debate Section), A. Dey (Junior Treasurer), Manas Mukutmoni (Secy., Publication Section), S. Chatterjee (Secy., S. S. League), Subir Bose (Secy., Junior Common Room).

PRESIDENCY COLLEGE ATHLETIC COMMITTEE

SESSION 1950-51

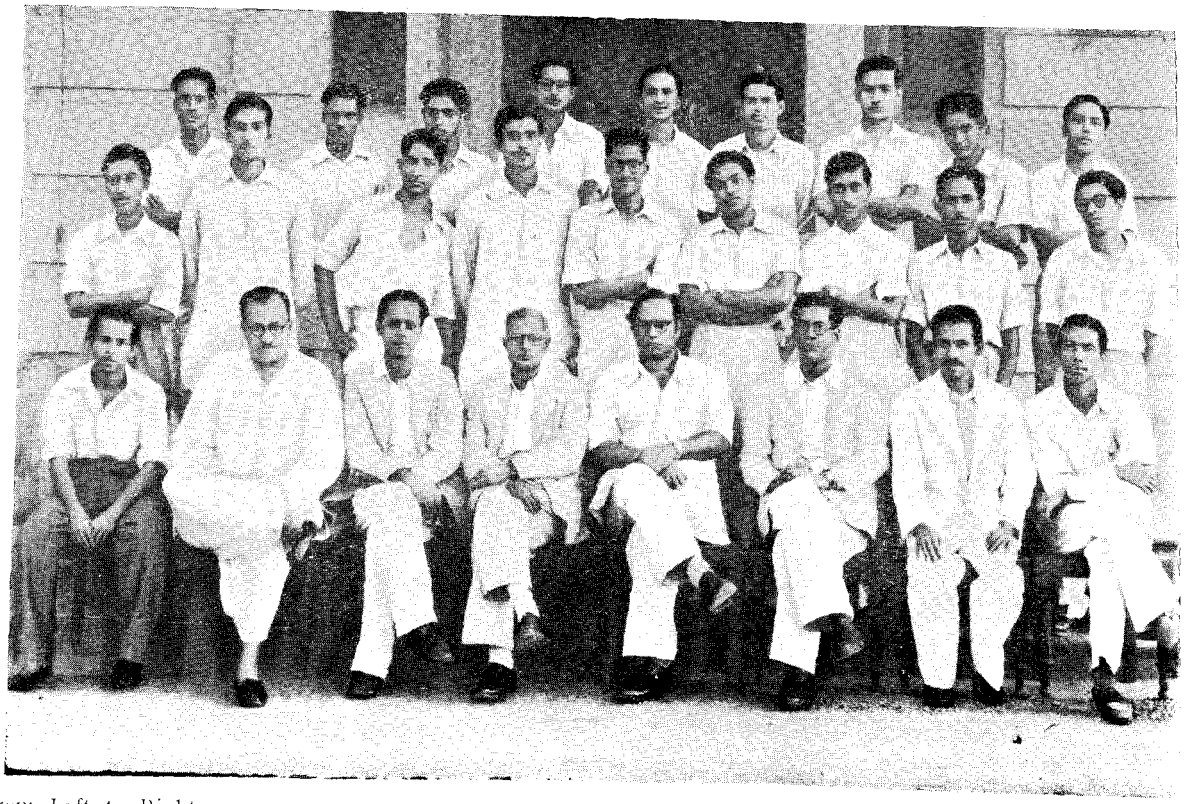

From Left to Right :

Front Row :—J. Mitter (Capt., Cricket), Prof. N. G. Chakravorty, Prof. S. Roy, Prof. G. D. Bhar (Bursar), Principal J. C. Sengupta (President), Prof. N.K. Sen, Sri N. N. Chatterjee (Physical Instructor), S. Chatterjee (Gen. Secy.).

Middle Row :—A. Sen (S. A. Games Secy.), T. Ganguly, K. Datta Gupta, S. Bh[illegible]se, S. Sen, S. Biswas, P. Chakravarty, D. Ghosh, G. Danda (Hockey Secy.).

Back Row :—Narsing (Bearer), Rajani (Bearer), P. Bose (Tennis Secy.), M. M[illegible]jee, A. Roy (Cricket Secy.), B. Bhattacharya (Football Capt.), D. Datta, S. Mukherjee ([illegible]ll Secy.), D. Ghosh (Hockey Capt.).

কবি সুকান্ত

শ্রীভারত ভট্টাচার্য্য—চতুর্থ বর্ষ, আর্ট্‌স

কাব্যরসপিপাসু পাঠক সমাজে কবি সুকান্তের পরিচয় নতুন নয়। এই তরুণ কবি তাঁর প্রগাঢ় উপলব্ধি ও প্রকট যুগচেতনার মাধ্যমে নিজেকে অতি অল্পকাল ও পরিসরের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। অত্যাধুনিককালে যখন আমাদের জাতীয় জীবনের নয়া ভিত্তি স্থাপিত হতে চলেছে তখন সুকান্তের কবিসত্তা ও কাব্যানুভূতির সামান্য আলোচনা হয়ত সম্পূর্ণ ব্যর্থ নাও হতে পারে।

সুকান্তের কবি প্রতিভার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে হ'লে, বিংশশতকের প্রথম ভাগ ও তৎপরবর্তীযুগের ভাবধারা ও জীবনধর্মের মূল সুরটা হৃদয়ঙ্গম করা বিশেষ দরকার। এ যুগে দেখতে পাই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির একাধিপত্যের অম্লান শিখা ক্রমশঃ ম্রিয়মাণ হয়ে চলেছে—ধনবাদীদের বিরাট প্রাসাদগুলো ধ্বসে পড়ছে আর সেখানে গড়ে উঠছে নতুন ইমারৎ। যারা এতদিন নীরবে সকল অত্যাচার অবিচার সহ্য করে নির্ভীক রক্তদানে 'সভ্যতার পিলসুজের' কাজ করে এসেছে, সেই ম্লান-মূক জনসাধারণের জাগরণ এ যুগের গোড়ার কথা। যে নতুন সমাজচেতনা ও শ্রেণীসচেতনতা যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর বুকে নতুন জীবনের সাড়া জাগিয়েছে, যে আশার বাণী "চিরপদানত" ও পদদলিতের অর্দ্ধমৃতপ্রায় জীবনে নতুন প্রাণের তুফান তুলেছে—মানবজীবনের সেই নয়া ইতিহাস রচনার কালে কবি সুকান্ত একনিষ্ঠ কারিগরের মতো জীবনপণ করে তাজা মালমশলা দিয়ে নতুন মানবসভ্যতার কঠিন চিরস্থায়ী ভিত্তি স্থাপনে তৎপর হয়েছেন—এই কর্মকে তিনি ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানব-সমাজ প্রাচীনকালের বর্বরতা থেকে মুক্তি পেয়েছে সত্য কিন্তু ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে আজ সে এক অভিনব ব্যবস্থার দাস হয়েছে। মুষ্টিমেয়ের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তাকে সমষ্টির বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা হচ্ছে; রাজনৈতিক ক্ষমতাপ্রিয়তার দরুণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে ভয়ানক মারণাস্ত্রের মুখে দাঁড়াতে হচ্ছে; অর্থনৈতিক জটিলতার ঘূর্ণাবর্তের মাঝখানে সে আপনার শুভবুদ্ধিকে হারাতে বাধ্য হচ্ছে—পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার এই কালরোগটীকে কবি সুকান্ত ধরতে পেরেছিলেন। তাই তথাকথিত উন্নততর মানবসভ্যতার নিদারুণ পরিহাসের বিরুদ্ধে কবি সুকান্তের লেখনী ছিল সজাগ; অসহায় মানবজাতিকে এই মর্মন্তুদ পতন থেকে বাঁচাবার জন্যে সুকান্তের রক্তাক্ত লেখনী স্পষ্ট ও সহজ ভাষায় লিখে গেছে সমাজ-শত্রুদের সঠিক পরিচয়, আর সংকটাকীর্ণ সংগ্রামের পথে মানবমঙ্গল-কর্মীদের জন্যে রেখে গেছে চলার পথের অমূল্য পাথেয়। কবি সুকান্তের জীবনদর্শনের এই গোড়ার কথাটা ভুলে গেলে তাঁর কোনও কবিতার আসল তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা কখনও সম্ভব হবে না।

উপরোক্ত জীবনদর্শনের কথা মনে রেখেই আমরা সুকান্তকে 'নতুন যুগের সার্থক কবি' বলতে পারি। বহুদিনের বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে যে যুগে সাধারণ মানুষ এমন অসাধারণ হয়ে উঠেছে—তাদের চিন্তা, কর্ম ও কৃষ্টি যখন নতুন ইতিহাস লিখছে—যে যুগে অত্যাচারীর কণ্ঠ চিরকালের জন্যে রুদ্ধ করবার মানসে উৎপীড়িত ও শৃঙ্খলিত জনসাধারণের নবজাগরণ দেখা যাচ্ছে দেশে দেশে—সে যুগে 'সাধারণ মানুষের সংগে এমন একাত্মতা', তাদের যুগসঞ্চিত প্রাণের সহজ কথাগুলো……

"……বহুদিন উপবাসী নিঃস্ব জনপদে
মাঠে মাঠে আমাদের ছড়ানো সম্পদ ;
কাস্তে দাও আমার এ হাতে।" (ফসলের ডাক :

বা "……লক্ষ লক্ষ প্রাণের দাম
অনেক দিয়েছি ; উজার গ্রাম।
সুদ ও আসলে আজকে ভাই
যুদ্ধ শেষের প্রাপ্য চাই।" (বোধন)

বা ": ……এ দাসত্ব ঘুচে যাক্, এ কলঙ্ক মুছে যাক আজ,
কাজ করো—কাজ।" (কলম)

'সোজাসুজি বলতে পারার এমন দুঃসাহসী ক্ষমতা' সুকান্তকে জনগণের কবি করে তুলেছে, তাঁকে জনমনের আদর্শ ব্যাখ্যাতার আসন দান করেছে।

কবি সুকান্তের অধিকাংশ কবিতাই কেন "জন্মমাত্র সুতীব্র চীৎকারে" সারা দেশের মধ্যে বিদ্রোহের আগুণ জ্বালিয়েছে, কেন তারা আগামী দিনের কণ্টকাকীর্ণ অগ্নিবর্ণ পথের পথিকের কাছে পথপ্রদর্শক হয়েছে—তার কারণ নিহিত আছে কবিতাগুলোর জন্মতারিখের মধ্যে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ সাল ; পৃথিবীর ভয়াবহ পরিণতি ও যুগসন্ধির—এ পাঁচটা বছর সুকান্তের অন্তরস্থিত কবিসত্তার বীজকে অংকুরিত করেই ক্ষান্ত হয় নি, তাকে বিরাট মহীরুহের সম্মানও দান করেছে। এই পাঁচটা বছরে—একদিকে দেখতে পাই পৃথিবীর নাট্যশালায় "মহামরণের মিলনযজ্ঞ" পর্বটা বিপুল বিক্রমে অভিনীত হয়ে চলেছে আর ভারতের মাটীতে বন্যামহামারী-দুর্ভিক্ষের কর্মতৎপরতায় শ্মশানকালীর রুদ্রনৃত্য শুরু হয়েছে ; আর অন্যদিকে দেখি 'জীবন প্রতিষ্ঠার মৃত্যুপণ সংগ্রাম—জয়পরাজয় আর উত্থানপতনে, সুখদুঃখে আর আশানিরাশায় ঘেরা এই পাঁচটা বছর' কবিকে কর্মবিহ্বল করে তুলেছিল। তাই একদিকে দেখি কবি মহামানবের প্রাণপ্রতিষ্ঠার মঙ্গলঘট স্থাপনা করে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে কোথাও বলছেন,

" ……তবু আমরা জানি
চিরকাল আর পৃথিবীর কাছে
চাপা থাকবে না
আমাদের দেহে তোমাদের পদাঘাত।" (সিঁড়ি)

আবার কোথাও বা জানাচ্ছেন,

"তাই আর নয় ;
আর আমরা বন্দী থাকবো না
····· ·নিঃশব্দে হঠাৎ জ্বলে উঠে
বাড়িশুদ্ধ পুড়িয়ে মারবো তোমাদের,
যেমন তোমরা আমাদের পুড়িয়ে মেরেছো এতোকাল।" (সিগারেট)

বা "···তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে,
দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে॥" (রবীন্দ্রনাথের প্রতি)

আর অন্যদিকে দেখি অভাব অনটনে ক্লিষ্ট মাতৃভূমির মৃত্যুজর্জর দেহখানি কবির মনঃপ্রাণ মথিত করে তাঁর অন্তঃকরণে জাগিয়েছে গভীর বেদনা। তাই তাঁর হতবাক্ লেখনীর মুখে দেখি হতাশার বাণী। করুণার্দ্র কণ্ঠ শুনতে পাই কবির, বলছেন—

"· ·· ·অবাক পৃথিবী···· ·
অবাক করলে আরো
দেখি এই দেশে অন্ন নেইকো কারো
অবাক পৃথিবী! অবাক যে বারবার
দেখি এই দেশে মৃত্যুরই কারবার· ·· ·" (অনুভব)

বা "পৃথিবীময় যে সংক্রামক রোগে
আজকে সকলে ভুগছে একযোগে
এখানে খানিক তারই পূর্বাভাস
পাচ্ছি, এখন বইছে পুব-বাতাস।" (মধ্যবিত্ত '৪২)

কবি সুকান্তের কাব্যধারার এই চিরন্তন অভিব্যক্তিকে ভুলে গিয়ে বহু সমালোচককে তাঁর বিরুদ্ধে প্রায়ই এক বিরাট অভিযোগ আনতে দেখা যায়। তাঁরা অনুমান করেন যে, কবি সুকান্ত আধুনিক সমাজের ব্যাধি দূর করবার জন্যে মাঝে মাঝে এত অধিক বস্তুনিষ্ঠ হয়েছেন যে অনেক সময় তাঁকে বস্তুর খাতিরে কাব্যধর্ম বিসর্জন দিতে হয়েছে। "পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটী"—উক্তিটীর ব্যাখ্যা প্রসংগে তাঁরা বলেন যে বিশেষ চিন্তাধারার দাস হওয়ার দরুণ কবি সুকান্ত কাব্যের 'spirit'কে জলাঞ্জলি দিয়েছেন বলে তাঁর 'আর্ট' ও সৃজনীপ্রতিভা উভয়ই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে। কিন্তু এঁরা ভুলে গেছেন যে, আধুনিক কালের বুভুক্ষু কবি তাঁর ছন্দহারা ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবন দিয়ে চাঁদের শাশ্বত সৌন্দর্য উপভোগ করতে অক্ষম; পূর্ণিমার গোল চাঁদটাকে ক্ষুন্নিবৃত্তির উপাদান হিসেবে কল্পনা করতেও তাঁর তৃপ্তি লাগে। এখানে কবি সুকান্তের হয়ে হয়ত এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে কোনও কবিকে বুঝতে হ'লে তাঁর সৃষ্ট অংশবিশেষের বিশ্লেষণ সংশ্লেষণ করলেই চলবে না, তাদের একটা সামগ্রিক মূল্য নিরূপণ করতে হবে। কারণ সাহিত্যে সৌন্দর্যসৃষ্টির বিচারের কষ্টি-পাথর হচ্ছে সৃষ্টির সামগ্রিক বিচার তার অংশবিশেষের পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয়। আমরা আরও বলতে পারি যে একটা মহাস্থবির জাতিকে 'কুম্ভকর্ণের নিদ্রা' থেকে জাগিয়ে রূঢ় বাস্তবের

সংগে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় বক্তব্যকে শ্রুতিমধুর না করে বরং দৃপ্ত কণ্ঠে সহজ-সরলকে ঘোষণা করাই বাঞ্ছনীয়। কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে কবি সুকান্তের একান্ত বস্তুনিষ্ঠ মন তাঁর কাব্যসৃষ্টির পথে বাদ' সাধেই নি উপরন্তু তাকে যুগোচিত সৌন্দর্যে ভূষিত করেছে।

এখানে বিশেষ করে স্মরণ রাখা দরকার যে বিরুদ্ধবাদীদের মতবাদ খণ্ডন করে কবির *কাব্যধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করাই প্রবন্ধের মূল বিষয় নয়। কবি সুকান্তের কাব্যানুভূতির যথার্থ* ব্যাখ্যা দেওয়াই সবচেয়ে বেশী দরকার; কবি সুকান্তকে 'বিদ্রোহী কবি' এই আখ্যায় সজ্জিত করবার জন্যে অনেকেই ব্যস্ত এবং তাঁদের এই ব্যস্ততা অমূলক নয়। বিদ্রোহীদের ভাব, কর্ম ও চিন্তাধারার একটা সাধারণ সূত্র আমাদের সকলেরই সুপরিচিত। বিদ্রোহীদের সাধনাই হচ্ছে যা কিছু ক্লীবতা, দীনতা বা মলিনতা সমাজজীবনে জঞ্জাল হিসেবে জমে উঠেছে তাদের পুড়িয়ে ফেলে, যা কিছু দুষ্ট ব্যাধি বা ক্ষত সমাজদেহকে জরাজীর্ণ পঙ্গু করে তুলছে তাদের সম্পূর্ণ বিনাশ করে, যে সব রীতিনীতি মানবের সামগ্রিক কল্যাণের পরিপন্থী তাদের মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে ধ্বংস করে নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। এদিক থেকে সুকান্ত নিশ্চয়ই বিদ্রোহী কবি ছিলেন। অন্যায়ের পুরাণো জীর্ণ কাঠামো ভেঙ্গে ফেলে, আজকের নতুন কঠিন ইমারতের শুভ গৃহপ্রবেশ দেখতে পাই তাঁর কবিতাগুচ্ছের মধ্যে। প্রলয়ের মহাশঙ্খ হাতে নিয়ে তাই তাঁকে ফুৎকার দিতে দেখি:

"......বিপন্ন পৃথ্বীর আজ শুনি মুহুর্মুহু ডাক
আমাদের দৃপ্ত মুষ্টি আজ তার উত্তর পাঠাক।
ফিরুক দুয়ার থেকে সন্ধানী মৃত্যুর পরোয়ানা,
ব্যর্থ হোক কুচক্রান্ত অবিরাম বিপক্ষের হানা॥" (বিবৃতি)

সুকান্তের কবি প্রতিভার এদিকটার আলোচনা প্রসঙ্গে ওয়াল্ট হুইটম্যানের "The great poet enlisted in a people's cause can make every word he speaks draw blood" উক্তিটির সারমর্ম যে কতদূর সত্য তা উপলব্ধি করলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। কিন্তু তবু প্রশ্ন জেগে থাকে কার রক্ত তিনি ঝরান? কবি সুকান্ত এ জটিল প্রশ্নের সরল জবাব দিতে গিয়ে সাম্রাজ্যলোভী শাসক ও শোষক সম্প্রদায়ের প্রতি কটাক্ষ করে বলেছেন—

"......আমরা বার বার জ্বলি, নিতান্ত অবহেলায়—
তা তোমরা জানোই!
কিন্তু তোমরা ত জানো না:
কবে আমরা জ্বলে উঠব—
সবাই—শেষ বারের মতো!" (দেশলাই কাঠি)

বা "......স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবোই।

শোন্ রে মজুতদার
ফসল ফলানো মাটীর রোপণ
করবো তোকে এবার···· ." (বোধন)

উৎপীড়িত জনগণের প্রতিভূ হিসেবে বিদ্রোহী কবির 'গরাদভাঙ্গার গান' এই ভাবেই শুরু হয়েছিল; কিন্তু শুরুতেই কি এর শেষ? এর পরিণতি কোথায়?

কবি-চিন্তামানসের এই পরিণতির পথানুসন্ধান করতে হ'লে আমাদের জানা দরকার কবি আপনার ব্যক্তিগত অনুভূতি অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করতে কতদূর পেরেছিলেন আর জনসাধারণ, যাদের মানবত্বের মহিমায় মহিমান্বিত করা হচ্ছে কবির এক চরম লক্ষ্য, সেই জনগণ তাঁর ভাবধারার কতখানি সাহচর্য লাভ করেছিল? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে নিহিত আছে সৃজনীপ্রতিভার মূল্যনিরূপণের বোধ হয় শেষ ও চরম মাপকাঠি। আধুনিক জগতের বিখ্যাত কবি পাব্‌লো নেরুদার উদ্দেশ্যে লিখিত জনৈক ইংরাজ সমালোচকের উক্তিটীর উদ্ধৃতি এখানে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কারণ নেরুদার সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যটী কবিসুকান্তের বিশ্বজনীনতা ও সর্বজনপ্রিয়তার ব্যাখ্যা হিসেবে সমভাবে প্রযোজ্য। তিনি বলেছেন—

"For whoever touches his poetry, touches a man—a man of vast human sympathy, a heroic figure who has been able to encompass the deepest striving of millions.···There is the heart of his poetry. There is the heart of our time."

কিশোর কবি সুকান্ত কি করে বিশ্বের ও বর্তমান যুগের ভাবাদর্শের জীবন্ত প্রতিভূ হলেন—কি করে তিনি তাঁর কবিতার মাধ্যমে পৃথিবীর "চিরপদানত"দের ব্যথায় সমভাবে ব্যথিত হলেন? এ প্রশ্ন অনেকের মনেই বিস্ময়ের সঞ্চার করে থাকে। কিন্তু বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন কোনও রসগ্রাহী পাঠক যখন তাঁর—

"···আর উত্তাপ দিও
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।" (প্রার্থী)—

এই সামান্য অথচ 'করুণা বা অনুকম্পা' শূন্য 'জ্বলন্ত বিশ্বাসের অগ্নিগর্ভ বাণী'টি শোনে তখন সে তাঁকে আত্মার আত্মীয় হিসেবে গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। তাঁকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে সে যেন প্রচার করতে চায়—

"By your example we will grow.
We shall be a multitude upon the earth.
Our energy will be an ocean's infinity.
To-day's prisons will be to-morrow's victory."(Pablo Neruda)

ইতিহাসকে

শ্রীঅসিত ভট্টাচার্য্য—৬ষ্ঠ বর্ষ, আর্ট্‌স্

এবার আবর্ত্ত নয়, ইতিহাস, ফেল শেষ দান।
মহান মীমাংসা চাই, বহুকাল লুব্ধ ভীরু প্রাণ
অন্ধকারে খুঁজেছিল সংকুচিত আরাম-আশ্রয় ;
এবার চূড়ান্ত চাওয়া, আবিল আবর্ত্ত আর নয়।
এখন শতাব্দীশীর্ষে জন্মমৃত্যু বসে মুখোমুখি
খেলিছে কঠিন পাঞ্জা, স্তব্ধ চোখে আমি চেয়ে দেখি,
মৃত্যুরে করি না ভয়, জন্মেরে কামনা করি শুধু ;—
সে কামনা চেতনার খরশাণ ফলকে শাণিত,
সে কামনা জীবনের গূঢ়লোকে স্বতঃই প্রাণিত
মহাকাল বাহুর পরশে।
অনেক মৃত্যুর মাঝে আজও তাই অবিচল বসে,
বহু রক্তে সিক্ত পথ, তবুও করি না আমি ভয়,
শুধু বলি উচ্চকণ্ঠে,—ইতিহাস, মুগ্ধ ইতিহাস,
সনাতন পঙ্গুতার অচল আবর্ত্ত আর নয়॥

ঘাস

শ্রীসুস্নাত গংগোপাধ্যায়—চতুর্থ বর্ষ, বিজ্ঞান

পৃথিবীতে আজো নাকি সবুজ ঘাসেরা বেঁচে আছে,
হয়তো এখনো রসশূন্য এই মাটির ভিতরে,
ঘুমের ছায়ায় ঘন অন্ধকারে নির্ঝরিণী ক্ষরে,
হয়তো সে প্রাণরস শুষে নিয়ে ঘাসেরাও বাঁচে!

তবুও ঘাসেরা আজ শুষ্ক, শীর্ণ, নীরস, পাণ্ডুর,
পরভোজী মহীরুহ ঘাসেদের খাদ্য চুরি করে'
লালসার তাড়নায় আপন ভোগের ভাণ্ড ভরে,
ঘাসের জীবন-রস শুষে নেয় শোষক নিষ্ঠুর।

তবু জানি একদিন জয়োন্মদ বৈশাখীর ঝড়ে,
বায়ুর প্রহারে, বজ্রে, বিদ্যুতের অসহ্য কশায়
দম্ভদৃপ্ত মহীরুহ ধ্বংস হয়ে লুটাবে ধূলায়,
সবুজ ঘাসেরা মাথা তুলে রবে মাটির উপরে।

মৃত্যুর আভাস মুছে তারপর সূর্যদীপ্ত ঘাস
সেইদিন এনে দেবে জীবনের সবুজ আশ্বাস!

ইতিহাস থেকে

শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার ঘোষ—৬ষ্ঠ বর্ষ, আর্ট্‌স্

(১৭৮৯)

হাজার মৃত্যু উপেক্ষা করেছি তো,
দাসত্ববাদে হেনেছি মৃত্যু-শেল,
প্রভুত্ব, তারও করেছি তো শির নত,
দেখেছি হাজার তুষার সাগর ঝঞ্ঝায় উদ্বেল।
তবু শিকলের কাল তো হ'ল না শেষ
নয়া-প্রভুত্ব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে,
নামে হতাশার দুঃসহ মেঘাবেশ
প্রান্তর বুকে বিষণ্ণ শত শীতের কুয়াসা লোটে॥

(১৮৪৮)

আবার আকাশে নামে সূচনার আলো
বন্যাবেগের প্রাণপ্রাচুর্য্য জাগে,
খনির গর্ভে যুগসঞ্চিত অন্ধকার সে কালো
ফেটে ফেটে যায় সূর্য্যের অনুরাগে,
রক্তঝরানো বজ্রশপথে উদাত্ত ঘোষণায়
ইতিহাসে যত মৃত্যুমুখর অধ্যায় মুছে যায়॥

(১৯১৭)

দুর্য্যোগ নয়, এলো বিজয়ের দিন
দিগন্তে জাগে প্রতিরোধ সঙ্গীন
নতুন আশার বসন্ত এলো হাজার শীতাবসানে
মরুপ্রান্তর সজীব, সবুজ শস্যের গানে গানে ॥

(১৯৫১)

এখন বারুদগন্ধী হাওয়ার কাল
আকাশে ঝড়ের প্রচণ্ড আকুলতা,
হাজার প্রাণের নদীতে নদীতে প্রাণাবেগ উত্তাল,
মূক অতীতের স্তব্ধ বক্ষে অসহ্য মুখরতা
ফেটে পড়ে আজ বেসুরো সুরের ঘায়।
মৃত্যু-নীলিম নীল সমুদ্র মুখরিত কামনায়।
ফসিল-বিলাসী চেতনায় তাই বিদ্যুতবহ ঝড়
লিখে রেখে যায় নির্ভীক ঘোষণাকে,
শোনায় নতুন শপথ-শাণিত স্বর—
জাগ্রত জনসাগরের বাঁকে বাঁকে ॥

সাগরের ডাক

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ—তৃতীয় বর্ষ, আর্ট্‌স্

[John Masefield-এর "Sea-fever" কবিতার অনুবাদ]

আবার যাবো আমি সাগর-ঢেউ-'পরে একেলা মেঘ-ঢাকা আকাশ-তলে,
রজনী প্রকাশিলে একটি তারকারে চালক ক'রে নেব অথৈ জলে!
জাহাজে ঢেউ লেগে দারুণ বেগে চাকা জলেতে পথ কেটে চলিবে ধেয়ে,
পবন-গীতি-মাঝে ধবল-পাল-খানি উড়িয়ে হরষেতে চলিব বেয়ে!
রজনী শেষাশেষি কুহেলি-ঘন-জালে সমুখ-পথখানি পড়িবে ঢাকা,—
সহসা পূব-দিকে আঁধার-বুক চিরে জাগিবে দিবালোক আবির-মাখা!

আবার যাবো আমি সাগর-ঢেউ-মাঝে জোয়ারী-জলরাশি ডাকিছে মোরে,
দরদী মন দিয়ে ডাকে যে প্রিয়-জনে সাড়া না দেব তারে কেমন ক'রে !
সাগর-জল-মাঝে জোয়ার-ঢেউরাশি বিপুল-তেজ-ভরে উঠিবে কাঁপি',—
কাজল-কালো-রঙে গগনে মেঘদল ঢালিবে বারি-ধারা দুকূল ছাপি' !
পাগ্‌লা-বায়ু-'পরে ধবল-পাখা-মেলি' শংখ-চিল-গুলি বেড়াবে ভেসে,
রুদ্র-দেবতারে আপন ক'রে নেব, বাজাব ভেরীখানি পাগল-বেশে !

আবার যাবো আমি সাগর-জল-'পরে অধীর-যাযাবর-জীবন নিয়ে,—
সলিল-রাশি-মাঝে আবাসখানি মোর লাগিবে খুব-ই ভালো হরিষ হিয়ে !
যেখানে তিমিগুলি ফোয়ারা-ধারা তুলি' আপন খুশিমতো সাঁতার কাটে,
যেখানে বারি-ধারা তীরের মতো ধার,—শরীর কাটে যেথা জলের ছাঁটে,—
সেখানে যাবো আমি বিপদ হাতে ক'রে বিপদ-ভয়-হীন দস্যু-মতো,—
লভিব ক্ষণ-তরে স্বপন-সুখ সেথা, ভুলিয়া আর সব দুঃখ যতো !

একটি করুণ কাহিনী

শ্রীবিনয় ভট্টাচার্য্য—ষষ্ঠ বর্ষ, আর্ট্‌স্

একি, ইস্‌পাতী বাজ !
আজ তোমার মাথার করোটি
পড়ে আছে এক নাম-না-জানা গ্রামে,
একটা পরিত্যক্ত জলা জমিতে !

বিস্মিত হয়ে যাই আমি,
নিদারুণ বিস্ময়—
যখন মনে পড়ে তোমার পূর্ব-ইতিহাস !

হিংস্র গম্ভীর গর্জনে
আকাশ পথে তুমি চল্‌তে ছুটে
দুরন্ত উদ্দাম গতিতে ;
বিদীর্ণ হয়ে যেতো অসীম শান্ত আকাশ,
উড়ন্ত পাখিরা ছিট্‌কে পড়্‌তো দূরে,

পৃথিবীর বুকে কেঁপে উঠ্‌তো সমস্ত জীবজগৎ,
কেঁপে উঠ্‌তো মানুষ।
দুর্দম আনন্দে তুমি মেতে উঠ্‌তে,
ঝাঁকে ঝাঁকে নিক্ষেপ করতে ইস্‌পাতী ফল,
জমাট মরণ-ভরা ফল—মৃত্যুগর্ভ ;
তোমার সেই রুদ্র বদান্যতায়
মুছে গেছে পৃথিবীর কতো রূপলিপি,
কতো জনপদ-গ্রাম-জীবজন্তু
কতো নিঃসহায় নিরপরাধ মানুষ।
তারপর তুমি চলে যেতে বিজয় গর্বে ;
তোমার জয়নিনাদ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই
মৃত্যু-ফলের বিষাক্ত ধোঁয়ায় কালো আকাশ
ভরে যেতো করুণ বিলাপধ্বনিতে,
ক্রন্দন—প্রকৃতির, মানুষের, প্রাণি-জগতের !
কখনো বা হোতো অন্যরকম—
কান্নার অবকাশ কই ?
কাঁদবে কে ?
আকাশ আর পৃথিবী জুড়ে কালো বিষের ধোঁয়া,
আর মৃত্যুর অগাধ স্তব্ধতা !

তোমার মহিমায় অপরূপ ছিলে তুমি,
অপরূপ ! অপরূপ !

কিন্তু আজ
একি দেখি ইস্‌পাতী বাজ !
এক অজানা জলা জমিতে তোমার মাথার করোটি,
তার ওপরে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে চলমান
ক্ষুদ্র জলজ কীটেরা !
আকাশ আবার নীল,
আবার ফিরেছে পৃথিবীর রূপরেখা,

নতুন হয়ে গড়ে উঠেছে জনপদ-গ্রাম-বনানী,
বেঁচে উঠেছে জীবজন্তু,
বেঁচে উঠেছে মানুষ।
বুঝিবা প্রাণের বিনাশ নেই,
মহাজীবনের গতিতে নেই যতি।
কিন্তু হায় ইস্‌পাতী বাজ!
কোথায় তোমার রূপালী ডানা?
কোথায় গম্ভীর বিজয়-গর্জন?
কোথায় মৃত্যুফল?
মহাকালের অমোঘ নিয়ম। নয়?
আফশোষ্‌ !!!

শিল্পী

শ্রীশুকদেব সিংহ—চতুর্থ বর্ষ, আর্ট্‌স্‌

শিল্পী চাই। শিল্পী। সুদক্ষ ভাস্কর।

শিল্প-দেবতা মঞ্জুশ্রীর মন্দিরে দেবদাসী স্বর্ণোৎপলার প্রস্তর প্রতিকৃতি রচনার জন্যে একজন প্রতিভাবান ভাস্করের প্রয়োজন। কাঞ্চীরাজ প্রভাকরের অসঙ্কোচ ঘোষণা, ভাস্করকে শ্রমণ হ'তে হবে। কিন্তু কেন, সে-কথা স্পষ্ট ক'রে বলা হয়নি কোথাও। তবু অনেকেই বোঝে, জানে। তাই দেবদাসীর সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত ক'রেই তারা থেমে যায়। ঘোষণা ছড়ায় অপ্রতিহত গতিতে।

সকলেই শোনে। শোনেনা শুধু একজন। সে পদ্মনাভ। শোনার অবকাশ পায় না। সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকারে যখন কাঞ্চীরাজ্যের হর্ম্য-প্রাসাদগুলো অস্পষ্ট হ'য়ে আস্‌ছে,দিগন্ত-পারের উন্মুক্ত আকাশ মিশে যাচ্ছে পুর-পরিখার সঙ্গে, তখন গোধূলির সেই মহালগ্নেও শ্রমণ পদ্মনাভ আপন হাতে প্রস্তর মূর্তি রচনা ক'রে চলেছে। পাথরের বুকে ফুটিয়ে চলেছে নিথর প্রাণের অভিব্যক্তি। আজো সাধনায় তার সিদ্ধিলাভ ঘটেনি। তাই অতুল উৎসাহ আর অনাহত একাগ্রতায় কাজ ক'রছে পদ্মনাভ। কোন দিকে তার খেয়ালমাত্র নেই। পাখীর কূজন, তথাগতের আরাধনা সবকিছু তার কাছ হ'তে বিদায় নিয়েছে। সেক্ষেত্রে রাজার ঘোষণা যে তার কানে প্রবেশ ক'রতে পারেনি তাতে আর আশ্চর্য কি! পারতোও না, যদি না গুরু অগ্নিমিত্র তার সম্মুখে এসে দাঁড়াতেন। সন্ধ্যার কিছু পরেই এলেন অগ্নিমিত্র। পদ্মনাভের

খেয়াল ছিল না। পিঠে কোমল করস্পর্শ পেয়ে সম্বিৎ ফিরে এলো তার। মুহূর্তমধ্যে অতি-সচেতন হ'য়ে প্রণাম করলো সে গুরুর পদতলে। আশীর্বাণী নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

গুরুদেব অস্ফুট স্বরে ডাকলেন—পদ্মনাভ।

—বলুন গুরুদেব।

—ভগবান তথাগতের কৃপায় তোমার সাধনা সিদ্ধ হ'য়েছে।

অর্জিত গৌরবের মৃদু বিচলতায় পদ্মনাভের গণ্ডস্থল কেঁপে উঠ্‌লো।

শান্ত-সহাস অগ্নিমিত্র ব'লে চ'ল্‌লেন—তাই তোমাকে একটা কাজের ভার দিতে এসেছি আমি।

—কী গুরুদেব?—কৌতূহলী হ'য়ে পড়লো পদ্মনাভ।

—কাঞ্চীরাজের ঘোষণা শুনেছো?

—না।—পদ্মনাভ অস্বীকৃতি জানায়।

স্মিত হাসেন অগ্নিমিত্র। বলেন—তিনি ঘোষণা ক'রেছেন, মঞ্জুশ্রী-মন্দিরে দেবদাসী স্বর্ণোৎপলার প্রস্তরমূর্তি তৈরী করাবেন।

—প্রয়োজন?

—রাজাই ব'ল্‌তে পারেন। তবে শুনেছি, প্রতিকৃতি নির্মাণের পর তিনি নাকি নির্বাসিত ক'রবেন দেবদাসী স্বর্ণোৎপলাকে।

—তার অপরাধ?

—অতিশয় গুরুতর। দুর্বলতা নাকি তাকে স্পর্শ করেছে, দেবতার কাজে সে দেখিয়েছে অবহেলা।

—তবে তার প্রস্তরমূর্তি রচনা ক'রে রাখারই বা প্রয়োজন কী?

—অনুমান, সুন্দরী গেলেও সুন্দরীর রূপ-সুষমাকে রাজা ধ'রে রাখ্‌তে চান। তা' ছাড়া, মঞ্জুশ্রীর মন্দিরে আর কোন দেবদাসী রাখ্‌বেন না ব'লেই তিনি মনস্থ ক'রেছেন। তাই দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখ্‌তেও এক পাষাণ দেবদাসীর প্রয়োজন।

—ও!···সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝে নিতে চায় পদ্মনাভ।

অগ্নিমিত্র সে-অবসর না দিয়েই আদেশ করেন—আমার ইচ্ছা, তুমি সে-মূর্তি—

পদ্মনাভ বাধা দিয়ে ওঠে—আবার কেন কঠিন পরীক্ষায় ফেল্‌ছেন গুরুদেব? আমার পরীক্ষার কি শেষ হয়নি?

—হ'য়েছে। তবু আর একবার যাচাই ক'রে নিতে চাই। সকলের কাছে প্রকাশ ক'র্‌তে চাই তোমার কৃতিত্ব।

—যথা আজ্ঞা গুরুদেব।—পদ্মনাভ অপ্রতিবাদে প্রণাম করে।

অগ্নিমিত্র বলেন—আমি জানি এ-কাজ তুমি ছাড়া আর কেউ পার্‌বে না। তবু সাবধান ক'রে দেই—

আর ব'ল্‌তে হ'লো না। নিমেষে পদ্মনাভের চোখে-মুখে আশঙ্কার সুস্পষ্ট ছাপ প'ড়লো।

অগ্নিমিত্র তা' লক্ষ্য ক'রেই ব'লে উঠ্‌লেন—না, না, কোন ভয় নেই। আমি ব'ল্‌ছি, তুমি পারবে। আগামী প্রত্যূষেই রওনা হ'য়ে যাও। বুঝ্‌লে ?

—আচ্ছা গুরুদেব। সম্মতি জানালো পদ্মনাভ।

সৌম্যমূর্তি অগ্নিমিত্র বিদায় নিলেন।

পদ্মনাভের সমস্ত রাত্রিটা অনিদ্রাতেই কেটে গেল। কঠিন শিলাতলে শুয়ে আত্মপ্রস্তুতির মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হলো রাত্রির চতুর্যাম। অস্ফুট আলোয় পদ্মনাভ স্নান ক'রে এলো। সংগৃহীত পুষ্পে অর্ঘ্য দিলো ভগবান তথাগতের পায়। তারপর খোদন-যন্ত্রাদি সঙ্গে নিয়ে এসে দাঁড়ালো অগ্নিমিত্রের চরণ-উপান্তে।

—শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ—গুরুকণ্ঠে ধ্বনিত হলো অনাবিল আশীর্বাণী।

ভূমি স্পর্শ ক'রে প্রণাম জানিয়ে আশান্বিত পদ্মনাভ তার যাত্রা সুরু ক'রলো। চ'ল্‌লো কাঞ্চী-দরবার অভিমুখে। পথ-প্রান্তর মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌লো তার কণ্ঠোদ্‌গীত বৌদ্ধ স্তুতিতে। নির্বাক্ বিস্ময়ে সকলেই শুনলো একটা চলমান শব্দ, সঞ্চরণশীল গাথা—বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি··· ধম্মং সরণং গচ্ছামি···সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি···

শুন্‌লেন—কিছু দূর হ'তে—কাঞ্চীরাজ প্রভাকরও। আশায় তাঁর বুকটা দুলে উঠ্‌লো। ভাবলেন, যথার্থই তাঁর অভীপ্সিত ভাস্কর। ইন্দ্রিয়জয়ী বৌদ্ধ শ্রমণ। তাই তিনি আর থাক্‌তে পারলেন না। পাত্রমিত্র পাঠালেন শ্রমণকে অভ্যর্থিত ক'রে নিয়ে আসার জন্যে। এলো পদ্মনাভ কাঞ্চীরাজের সভামধ্যে। আগমনের উদ্দেশ্য জানালো। তৎক্ষণাৎ কাঞ্চীরাজ সম্মত হয়ে গেলেন। যথোচিত ব্যবস্থা ক'রলেন মূর্তিরচনার। তিনি আদেশ দিলেন, মন্দিরমধ্যে শিল্পী যখন খোদন-কার্যে ব্যস্ত থাক্‌বে, তখন কেউ প্রবেশ ক'রতে পারবে না সেখানে। শিল্পীকে বিরক্ত ক'র্‌তে পারবে না। শিল্পীর সম্মুখে থাক্‌বে কেবল দেবতা আর দেবদাসী, হাতের অস্ত্র আর মূর্তির পাথর। সম্ভবপর সময় স্থির হলো তাই দ্বিপ্রহর।

দুপুরের অর্চনা শেষ ক'রে পূজারী যখন বিদায় নিলেন, তখনই মন্দির-অভ্যন্তরে এসে দাঁড়ালো ভাস্কর পদ্মনাভ। চোখে তার প্রতিজ্ঞার স্পর্শ, বুকে সংযমের শিখা। সে-শিখাও দু-একবার দুলে উঠ্‌লো দেবদাসী স্বর্ণোৎপলা যখন তার দেবতালাঞ্ছন সৌন্দর্য নিয়ে এসে দাঁড়ালো সম্মুখে।

না, না, এ তার ক্ষণিক দুর্বলতা, সাময়িক বিভ্রান্তি। একে কাটিয়ে উঠ্‌বে পদ্মনাভ। ভগবান তথাগত, ভগবান মঞ্জুশ্রী, শান্তি দাও, শক্তি দাও।···এইতো···এইতো দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠ্‌ছে···কাটিয়ে উঠ্‌লো সে।

শক্ত ক'রে চেপে ধ'রলো ভারী হাতুড়িটা। বাঁ-হাতে ছেনি পাথরের ওপর রেখে জোরে ঘা মারলো। শব্দ ফেটে পড়লো সারা মন্দিরে। লাস্যময়ী স্বর্ণোৎপলা চম্‌কে

গেলো। হাসি তার মিলিয়ে গেলো অধর-প্রান্তে নিতান্ত অসহায় ভাবেই। স্থিতধী পদ্মনাভ কিন্তু তা' লক্ষ্য ক'রলো না। এবার সে জেগে উঠেছে। সংযত দৃষ্টিতে দেখে নিয়েছে স্বর্ণোৎপলাকে। তারপর পাথরের ওপর ছেনির স্থান ঠিক ক'রে নিয়ে অবিরাম ঘা দিয়ে চলেছে—ঠুক্-ঠুক্ ঠুন্-ঠান্—ঠুক্-ঠুক্—

মূর্তি সে তৈরী ক'রবেই। গুরুর আদেশ, রাজার ইচ্ছা। মূর্তি তাকে তৈরী ক'রতেই হবে। অক্লান্তকর্মী পদ্মনাভ সমস্ত দিন খেটে যায়। সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকে নীরব নিষ্কম্প স্বর্ণোৎপলা। তারও অব্যাহতি নেই, নেই এতটুকু বিশ্রামের অবকাশ। তাকে দেখেই শিল্পী অনুকৃতি রচনা করে। দাঁড়িয়ে থাক্‌তে তাই সে বাধ্য। কখনো যদি শ্রান্তিতে তার দেহ অবশ হ'য়ে আসে, অসহ্য যন্ত্রণায় কেঁপে ওঠে সর্বাঙ্গ, নির্মম শিল্পী অমনি চীৎকার দেয়—দেবদাসী সাবধান! সাবধান দেবদাসী আবার সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়। স্থির থাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

এম্‌নিভাবে চলে দিনের পর দিন। বেশ কয়েক মাস।

শিল্পীর কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে আসে। তার চোখের সাম্‌নে একে-একে ফুটে ওঠে স্বর্ণোৎপলার যোগ্য প্রতিমূর্তি। তাই দ্বিগুণ উৎসাহে সে পাথর কেটে যায়। হাতের যন্ত্র তার নেচে চলে দানবীয় গতিতে। বীভৎস শব্দ আর নির্মম নৃত্য! তা হোক্, ওতো তার জয়ভেরী। আনন্দের উৎসব। সে সফল হ'তে চ'লেছে, লাভ ক'র্‌তে চ'লেছে সিদ্ধি। এখন কি তাকে থাম্‌লে চ'ল্‌বে?

না, না, দেবদাসী, আরেক্‌টু। আরেক্‌টু দাঁড়াও। আমার কাজ শেষ ক'রে নেই। অনুরোধের সঙ্গে সঙ্গে খেটে চলে অস্থির অস্ত্র।

কাজ শেষ হয়। স্বর্ণোৎপলা ব'সে পড়ে। পদ্মনাভ ছুটে চলে রাজার কাছে। সংবাদ দেওয়ার দেরীটুকুও তার অসহ্য।

রাজা মূর্তি দেখ্‌তে আসেন। আসে ক'জন সৌন্দর্য-বিচারক। সকলেই বিস্মিত হ'য়ে যায়। একি! মূর্তি তো ঠিক্ হয়নি। কখনোই হয়নি, শিল্পী। স্বর্ণোৎপলার চোখের সেই বিদ্যুৎ-বিভা কই! কই সে-মনোমুগ্ধকর সজীবতা, প্রেমাঞ্জন! নেই, নেই।

সত্যই নেই। তাকিয়ে দেখে পদ্মনাভ। অসাফল্যের লজ্জায় তার মাথা নুয়ে পড়ে। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। গুরুর উদ্দেশে পা বাড়ায়।

কেন, কেন আমি বিফল হলাম গুরুদেব? আমার কি কোন দোষ ছিল?

—নিশ্চয়ই। অগ্নিমিত্রের কণ্ঠে অসন্তোষের আভাস।

পদ্মনাভ চ'ম্‌কে চায়। বলে—নির্দেশ করুন গুরুদেব।

—তুমিই বোঝ্‌বার চেষ্টা কর। শিল্পীর যে কটা গুণের প্রয়োজন, আমি সেগুলোর উল্লেখ ক'রছি। মিলিয়ে দেখো কোন্‌টা তোমার ছিল না।

—বলুন।

অগ্নিমিত্র সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ করেন—নিষ্ঠা?

—ছিলো গুরুদেব।

—স্থৈর্য ?

—তাও ছিলো।

—একাগ্র দৃষ্টি ?

—অভাব হয়নি।

—হাতের অস্ত্র, দেহের বল ?

—সমস্তই ছিলো।

—তবে ? তবে কেন বিফল হ'লে ?

—তা কি ক'রে ব'ল্‌বো গুরুদেব !

—হুঁ। অগ্নিমিত্র কিছুক্ষণ কি চিন্তা করেন। তারপর প্রশ্ন করে ওঠেন আবার,—সহানুভূতি ? সহানুভূতি ছিলো ?

গুরুকণ্ঠের এ-প্রশ্ন পদ্মনাভের মাথায় যেন বজ্রাঘাত ক'রলো। অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইলো সে। স্বীকৃতি জানাতে পারলো না। পারবে কোথা থেকে ? সত্যই সে স্বর্ণোৎপলাকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেনি, স্বর্ণোৎপলার জন্যে এতটুকু দরদও বোধ করেনি। প্রয়োজন-মাফিক নির্মম দৃষ্টিতেই দেখেছে তাকে। তার বেশী যে কিছু প্রয়োজন ছিলো ভাবতেই পারেনি।

অথচ—

অনুশোচনায় পদ্মনাভের মন ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে। অগ্নিমিত্রের দৃষ্টি হয় স্নেহ-মেদুর। তিনি শিষ্যের মাথায় হাত রেখে বলেন—হতাশ হওয়ার কিছু নেই পদ্মনাভ। তুমি যাওয়ার পরেই আমি আশঙ্কা করেছিলাম এবার তুমি বিফল হবে।

পদ্মনাভ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চায় গুরুর দিকে।

—হ্যাঁ, আশঙ্কা ক'রেছিলাম, কারণ ভগবান তথাগতের পায় তুমি যে পদ্ম-কলিটি উপহার দিয়ে গিয়েছিলে সে তো সূর্যোদয়েও ফোটেনি পদ্মনাভ।

পদ্মনাভ মাথা নীচু করে।

গুরুদেব বলেন—যাক্। ওর জন্যে দুঃখ ক'রে কোন লাভ নেই। আবার যাও পদ্মনাভ। এবার সফল হওয়া চাই।

পদ্মনাভ অগ্নিমিত্রের পায়ে প্রণাম ক'রে মঞ্জুশ্রী-মন্দিরেই ফিরে যায়। যাওয়ার পথে তথাগতের চরণে না-ফোটা ফুলের অর্ঘ দিতেও ভোলে না সে।

রাজার আদেশ নিয়ে পদ্মনাভ যখন প্রস্তরমূর্তির সম্মুখীন হয়, তখন যথারীতি আবার দাঁড়ায় এসে স্বর্ণোৎপলা। কিন্তু তার সৌন্দর্য যেন কিছু ম্লান, গায়ের রঙ্ ঈষৎ পাণ্ডুর। দেখে করুণা হয় পদ্মনাভের। ছেনি হাতুড়ি নীচে নামিয়ে সে প্রশ্ন করে—দেবদাসী কি অসুস্থা ?

—না। তোমার কাজ ক'রে যাও ভাস্কর।—নির্বিকার চিত্তে বলে স্বর্ণোৎপলা।

বাঁশীর চেয়েও মিষ্ট স্বর। পদ্মনাভ কিছুকালের জন্যে অভিভূত হ'য়ে পড়ে।

স্বর্ণোৎপলা ঝঙ্কার দেয়—সাবধান শিল্পী।

শিল্পী পদ্মনাভ সম্বিৎ ফিরে পায়। খোদন-যন্ত্র তার হাতে সক্রিয় হ'য়ে ওঠে। সমস্তকিছু ভেঙ্গেচুরে নতুন ক'রে গ'ড়তে চায় সে। তাই কাজ চলে দিনরাত। দাঁড়িয়ে থাকে স্বর্ণোৎপলা চিত্রার্পিতের মতো।

পদ্মনাভ আর ভুল করে না। শিল্পিমনের সহজ অনুরাগেই দেখে স্বর্ণোৎপলাকে। তার দেহে কণামাত্র শ্রান্তির চিহ্ন ফুট্‌লেই হাতুড়ি নামিয়ে মিষ্টি গলায় বলে পদ্মনাভ —আচ্ছা, বিশ্রাম করো। তোমার কি খুব কষ্ট হ'চ্ছে পলা?

স্বর্ণোৎপলা প্রথম-প্রথম বুঝতে পারে না এর অর্থ। শিল্পীর ব্যবহার তার কাছে সম্পূর্ণ বিসদৃশ ঠেকে। সে আপাত-গাম্ভীর্যেই অস্বীকার ক'রে যায়। পালন করে অসহযোগ।

শিল্পী তবু দমে না। আপন কর্তব্য পালন করে। পাথরের বুকে দেবদাসীর মুখ তৈরী তার শেষ হয়। বাকি থাকে শুধু দু'টি হাত। কাজের ফাঁকে বিশ্রাম নেয় পদ্মনাভ। স্বর্ণোৎপলার দিকে আবেশের দৃষ্টিতে তাকায় সে। পরক্ষণেই আপন হাতের ওপর অনুভব করে গরম স্পর্শ। তাকিয়ে দেখে সালঙ্কার সুডৌল দু'খানা হাত। ভালো ক'রে লক্ষ্য করে একবার। ছেড়ে দেয়। বলে—আমি বুঝেছি। অপেক্ষা করো পলা।

তারপর বেরিয়ে যায় মন্দির হ'তে। আর ফেরে না।

রাজা শিল্পীর কীর্তি দেখতে এসে স্তম্ভিত হ'য়ে যান। নির্বাক্ হ'য়ে পড়েন অগ্নিমিত্র ফোটাফুলের সংবাদ এনে। উন্মাদিনী স্বর্ণোৎপলা শুধু কেঁদে কেঁদে সকলকে বলে—শিল্পী আস্‌বে, শিল্পী আস্‌বে। মনে মনে তবু ভাবে, শিল্পী কি তার হাতের অর্থ ভুল বুঝলো?

কিছুতেই সে ঠিক ক'রতে পারে না, ভালোবেসেও কি ছাড়া যায়!

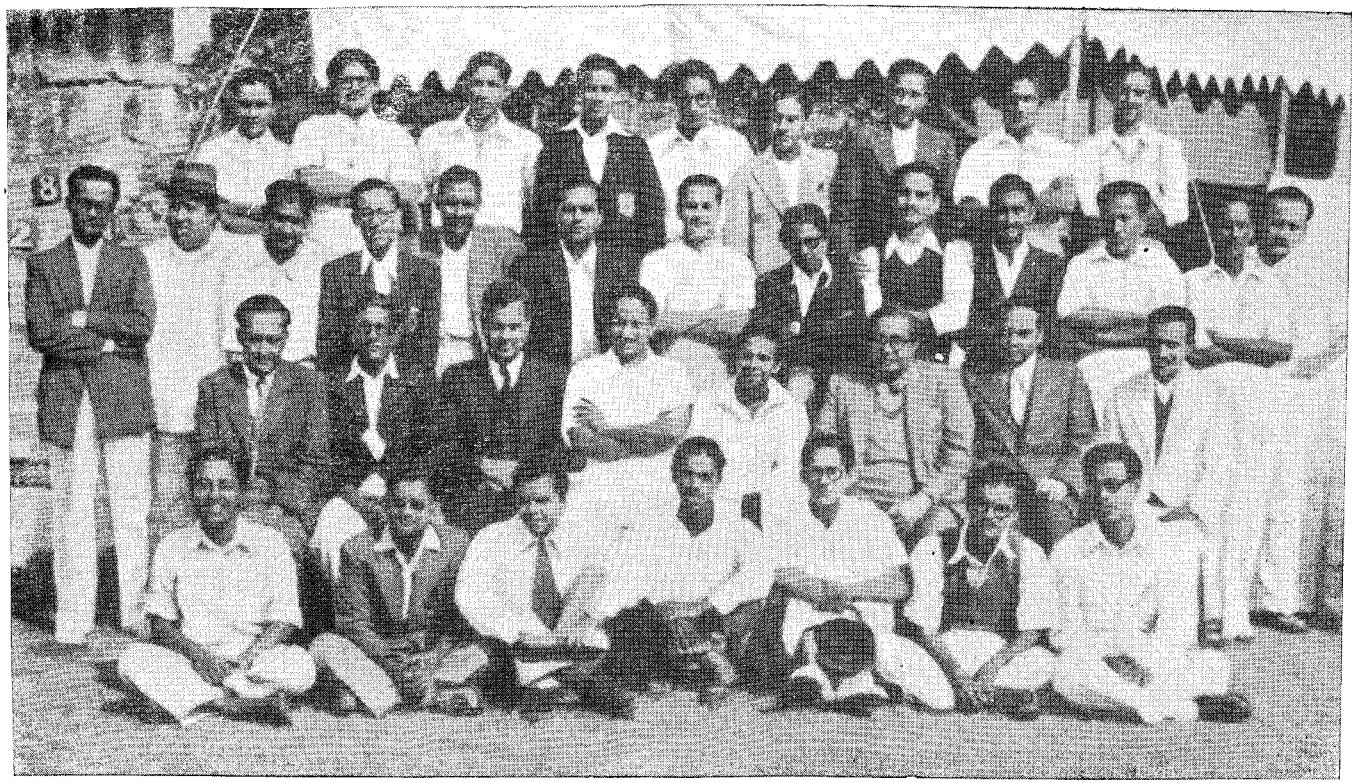

From Left to Right :
Front Row :—D. Ghosh, P. Sen, A. Roy Chowdhury, S. Chatterjee, A. Mukherjee, B. Dutta, G. Chakravarty.
2nd Row :—Prof. S. Sarker, Prof. N. K. Sen, Dr. D. M. Sen (Secy. Edn. Dept.), Sri B. Das (Capt. past team), J. Mitter (Capt., Present team), Sri A. K. Chanda, Principal J. C. Sengupta, Sri N. N. Chatterjee.
3rd Row :—A. Roy Chowdhury, P. Mitter, D. Das, N. Chatterjee, P. Sen, G. Roy, G. Danda, B. Bhattacharya, R. Mukherjee, A. Roy, Narsing (Bearer), A. Roy.
Back Row :—D. Banerjee, B. Burman, K. Dutta Gupta, S. Basu, N. Bysack, T. Bose, D. Dutta, N. Mukherjee, Aroon Roy.

NATIONAL CADET CORPS

PRESIDENCY COLLEGE SECTION

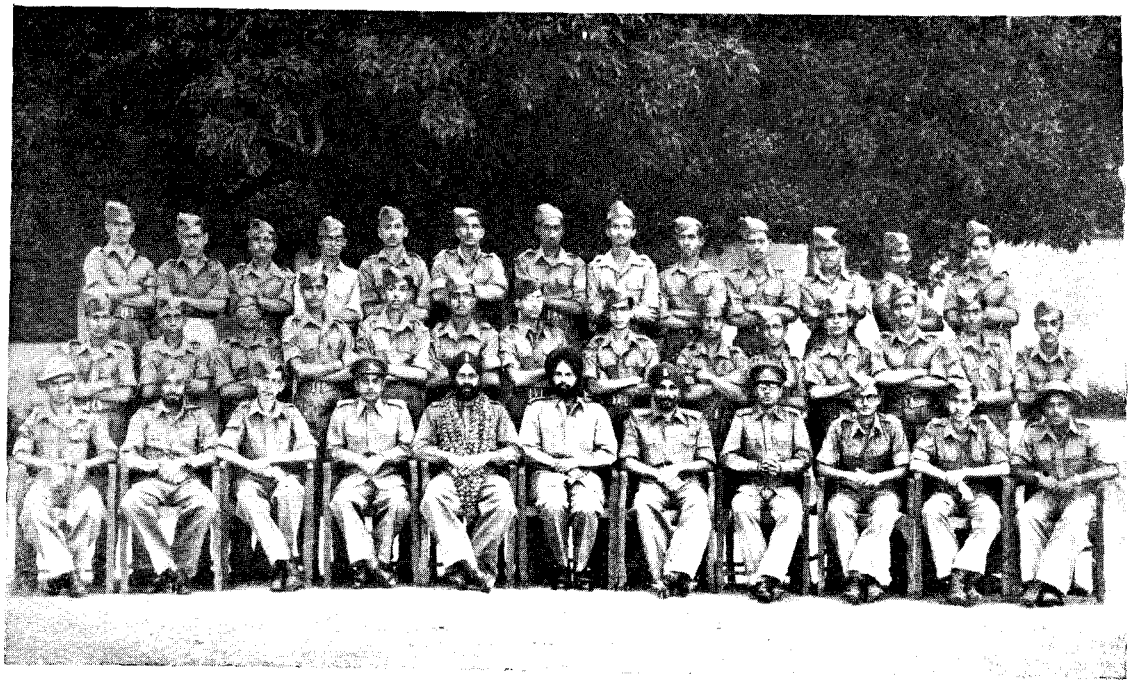

আমাদের কথা

ছাত্রপরিষদের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী ঃ

রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হওয়া এবং নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে সমালোচনা করা সম্পূর্ণ আলাদা! সহানুভূতি-সম্পন্ন, বলিষ্ঠ এবং সর্বোপরি গঠনমূলক সমালোচকদের প্রকৃত মর্যাদা দানে সমালোচনার সাধু উদ্দেশ্যকে ব্যাপক-ভাবে চরিতার্থ করার প্রতিশ্রুতি আমি দিচ্ছি।

আর একটা কথা না বললে আমার প্রাথমিক বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেটা হচ্ছে আমাদের ছাত্রপরিষদের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ। পরিষদের সহকর্মীদের এবং বিদ্যায়তনের প্রত্যেক সাধারণ ছাত্র ছাত্রীর সক্রিয় সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহজবোধ্যতার আহ্বান জানাচ্ছি।

সময়াভাবে "প্রতিষ্ঠাতৃ সপ্তাহ" উৎসবটিকে গতানুগতিকতার ছাঁচে ঢেলে দেওয়া ছাড়া উপায়ান্তর ছিলনা; বিগত পরিষদের সর্বাধিনায়ক কার্যভার ছেড়েছিলেন আমাদের হাতে বেশ কিছু পরে। সে যা হোক বিজ্ঞান ও কলা বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত প্রদর্শনীর শিক্ষণীয় এবং দ্রষ্টব্য বস্তু কোলকাতার ছাত্রমহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। একটি সান্ধ্য সংগীতানুষ্ঠান মহাবিদ্যালয়ের পরিবেশকে সজীব ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছিল। নতুন-পুরাতনের মাঝে "প্রদর্শনী বিতর্ক" উপভোগ্য হয়েছিল বেশ! 'চিত্রা' সিনেমায় সবাক ছায়াচিত্রের আয়োজন, প্রাক্তন ছাত্র-প্রীতি সম্মেলন ইত্যাদির একটানা সপ্তাহ-ব্যাপী গতি আনন্দের সাড়া জাগিয়েছিল মনে পড়ছে।

এই সপ্তাহকাল নিরবচ্ছিন্ন কর্মব্যস্ততার মাঝে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত যারা এগিয়ে এসেছিলেন আন্তরিক, অকুণ্ঠিত ও নীরব সাহায্য এবং সহযোগিতা নিয়ে তাদের নাম আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করছি—শ্রীসূর্য্যকুমার চ্যাটার্জ্জী, শ্রীঅরুণকুমার রায়, শ্রীশান্তনু মুখার্জ্জী, শ্রীদীপংকর ঘোষ, শ্রীকল্যাণকুমার দত্তগুপ্ত, শ্রীমানস মুকুটমণি, শ্রীমলয়েন্দ্রনাথ রায়, শ্রীসুনীলকুমার চক্রবর্তী, শ্রীদিলীপ ব্যানার্জ্জী, শ্রীকমলা বোস, শ্রীনলিনী জানা ও শ্রীকৃষ্ণা রুদ্র।

অধ্যক্ষ যতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অন্যান্য অধ্যাপক মহাশয়দের মূল্যবান উপদেশ ও শুভেচ্ছার জন্য ছাত্র পরিষদের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশনা বিভাগ এবার দুইটি পত্রিকা বার করার ঝুঁকি নিয়ে আমাদের প্রয়োজনের দাবী মেটাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমাদের পূর্ববর্তীদেরও বহুকালের আকাংক্ষা ও প্রচেষ্টাকে বাস্তবে রূপায়িত করে প্রশংসা অর্জন করেছে।

রবীন্দ্র পরিষদের পক্ষ হতে সুষ্ঠুভাবেই বসন্তোৎসবের আয়োজন পরিষদের ঐতিহ্য রক্ষার প্রতিশ্রুতি আমাদের দিয়েছিল। কিন্তু দুঃখের সহিত পরিষদ-সম্পাদক শ্রীদীপককুমার রায়ের পদত্যাগের কথা জানাচ্ছি। তাঁর স্থান পূরণ করেছেন নির্ভরযোগ্য কর্মী শ্রীইন্দ্রজিৎ চ্যাটার্জ্জী।

বিতর্ক বিভাগ বর্তমান জগতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও দৈনন্দিন সমস্যাগুলোর উপর প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একটি করে সভার ব্যবস্থা করে। বিভাগীয় সম্পাদক শ্রীশান্তনু মুখোপাধ্যায় কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

বিরাম পীঠিকা বিভাগ এবার সাংবাৎসরিক জল বিহারের সুস্থ পরিচালনায় কলেজে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। নানাপ্রকার আভ্যন্তরিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতার সুব্যবস্থার জন্যও উক্ত বিভাগের প্রশংসা করতে হয়।

সমাজসেবা বিভাগের ভার সর্ব-জন-প্রিয় শ্রীসূর্যকুমার চ্যাটার্জ্জীর উপর। কুষ্ঠ-বিরোধী সপ্তাহ পালন ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন জনহিতকর কার্য এ পর্যন্ত করেনি এই বিভাগ। তবুও বিভাগীয় অধিনায়কের ব্যক্তিগত যোগ্যতায় আমাদের বিশ্বাস আছে।

নাট্যপরিষদ বৎসরের যে সময়টায় কর্মমুখর হয়ে উঠে ঠিক সেই সময়েই পরিষদ কর্মকর্তা শ্রীতারকনাথ

গাংগুলী পদত্যাগের আবেদন পেশ করেন, তাঁর আবেদনপত্র বিবেচনাধীন আছে। গ্রীষ্মাবকাশের অব্যবহিত পূর্বে আর একটি সবাক ছায়াচিত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছিল 'ইন্দিরা' সিনেমায়।

এবার আগষ্টের শেষার্দ্ধের প্রথম দিকে মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা "রংমহলে" এক বিচিত্রানুষ্ঠান মঞ্চস্থ করার অনুমতি পান ছাত্র পরিষদ হ'তে। অনুষ্ঠানের কার্যপরিচালনা দ্বারা নিজেদের সংগঠন ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন ছাত্রীরা। এই ধরণের অনুষ্ঠান এবারই প্রথম।

আমাদের অভাব-অভিযোগের কথার চিরাচরিত নিয়মে চর্বিতচর্বণ আমি এবার আর করলামনা।

বৎসরের বাকী অংশে বিভিন্ন বিভাগ নিজ নিজ কর্মতৎপরতা ও কর্মকুশলতা উত্তরোত্তর বাড়িয়ে সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বাসের অধিকারী হয়ে কলেজ-ছাত্র-পরিষদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের রচনা করবে ব'লে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

রমণীমোহন ঘোষ—সাধারণ সম্পাদক

প্রকাশনা বিভাগ ঃ

সময়মত কলেজ পত্রিকা প্রকাশ ক'রতে পেরে আমার যথেষ্ট আনন্দ হচ্ছে। কিছু লেখার প্রথমেই কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই পত্রিকার নির্দ্ধারিত অর্থ সাহায্যের হার বাড়িয়ে দেবার জন্য। পত্রিকা বিভাগের অর্থসঙ্কট কিছুদিন থেকেই তীব্র হ'য়ে উঠেছিল, এবং সমাধানেরও কোন আশু পথ খোলা ছিল না কলেজ পরিষদের পক্ষে। সময়মত এই সাহায্যের জন্য এখন আমাদের দুটো পত্রিকা, প্রত্যেকটি একটু লঘু আকারে, প্রকাশ করা সম্ভবপর হ'য়েছে, শুধু দুটো নয়, সম্ভব হ'লে তার থেকেও বেশী পত্রিকার প্রয়োজন আমাদের কলেজে আছে। অসময়ে একটা পত্রিকা কোন রকমে প্রকাশ করার ফলে, ছাত্রছাত্রীরা ক্রমশঃ আমাদের কলেজে পত্রিকার অস্তিত্ব আছে কিনা এ বিষয় সচেতন থাকেন না। ম্যাগাজিনে লেখা পাঠানর এবং সময়মত পত্রিকা গ্রহণের উৎসাহের অভাবে এটা প্রকাশ পায়।

পত্রিকা প্রকাশ ছাড়া 'দেয়ালী' ও 'প্রকাশনী'র ভার আমাদের উপর পড়েছে। 'দেয়ালী' প্রকাশে দেরী হ'য়ে গেল ইউনিয়নের গাফিলতির জন্য। নিয়মিত 'দেয়ালী' প্রকাশ ক'রে সম্পাদক শ্রীরণজিত দত্ত নিজের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার সার্থক পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীকল্যাণ দত্তগুপ্তের সম্পাদনায় "প্রকাশনী" ঠিক পুজোর পরেই প্রকাশিত হবে। "প্রকাশনী"তে ইউনিয়নের কার্যাবলীর সমালোচনা স্থান পাবে।

সর্বশেষে, আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বিভাগীয় কাজে সাহায্য করার জন্য শ্রীমলয় রায়, শ্রীপূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত, শ্রীমনোজ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদেবব্রত রায় প্রভৃতিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মানস মুকুটমণি—কর্মসচিব,

আয়-ব্যয় ঃ

১৯৫০-৫১ সালের কলেজ ইউনিয়নের বাজেট ৯ই ফেব্রুয়ারী ছাত্র-ইউনিয়ন পরিষদের সভায় উপস্থিত করা হয়। বিস্তৃত আলোচনার পর নিম্নলিখিত বাজেটটি পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়। এতদপ্রসঙ্গে জানানো হইতেছে যে—প্রয়োজনবোধে ইউনিয়ন পরিষদে একটি অতিরিক্ত বাজেট ঘোষণা করা হইবে।

১৯৫০-৫১ সালের ইউনিয়নের বাজেটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আয় :—

আমাদের কলেজের প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীই বার্ষিক ৯৲ (নয় টাকা) Sessional fee দিয়ে থাকেন। এর মধ্যে ৪৲ Athletic fund-এর জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। বাকি ৫৲ টাকার মধ্যে ১৷৷০ (দেড় টাকা) কলেজ

ম্যাগাজিনের জন্য ৩।০ (চারি আনা) National Cadet Corps-এর জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। এ বৎসর কলেজের ছাত্রসংখ্যা মোট ১১৭১ জন। সুতরাং আমাদের আয়ঃ—

১১৭১ × ৩।০	... ...	৩৮০৫৸০ (তিন হাজার আট শত পাঁচ টাকা বার আনা)
১১৭১ × (১॥০) (কলেজ পত্রিকা)		১৭৫৬।০ (সতেরো শ' ছাপান্ন টাকা আট আনা)
১১৭১ × ।০ (ক্যাডেট কোর)		২৯২৸০ (দু'শ বিরানব্বই টাকা বার আনা)।

ব্যয়ঃ—

কলেজের বিভিন্ন বিভাগগুলিতে নিম্নলিখিতভাবে অর্থবণ্টন করা হইয়াছে—

বিতর্ক—	৩০০৲
সমাজ-সেবা—	১৫০৲
রবীন্দ্র-পরিষদ—	৬০০৲
নাট্য-পরিষদ—	৭৫০৲
বিরাম-পীঠিকা—	৭৫০৲
প্রকাশনী-বিভাগ—(প্রাচীর-পত্র ইত্যাদি)	২০০৲
মোট—	২৭৫০৲ (দুই হাজার সাত শত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)

ইহা ছাড়া Reserve-Fund-এ গচ্ছিত (৩৮০৫৸০-২৭৫০৲) মোট ১০৫৫৸০ (এক হাজার পঞ্চান্ন টাকা বার আনা) হইতে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত ব্যয় ধার্য হইয়াছে—

প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠান—	৫৯০৲
স্বেচ্ছাসেবক	৩০৲
সাধারণ নোটিশ বোর্ড	৫০৲
মোট	৬৭০৲

প্রতিষ্ঠাদিবসে ছায়া ছবি প্রদর্শন উপলক্ষে—সাধারণ ছাত্রদের নিকট টিকিট বিক্রয় বাবদ ১৩৩৸০ (একশত তেত্রিশ টাকা বার আনা) Reserve-Fund-এ জমা হইয়াছে।

এতদপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ছাত্রীবিভাগের উদ্যোগে একটি অনুষ্ঠানের নিমিত্ত সাধারণ বিভাগ হইতে ৫০৲ (পঞ্চাশ টাকা) ও সমাজ-সেবা বিভাগ হইতে ৫০৲ (পঞ্চাশ টাকা) ধার্য্য করা হইয়াছে।

পরিশেষে আমি ইউনিয়নের পক্ষ হইতে কাউন্সিলের Senior Treasurer শ্রীগুরুদাস ভড়, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীরমেশচন্দ্র নন্দী ও বিভিন্ন বিভাগের সম্পাদকগণের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅজিতকুমার দে—জুনিয়ার ট্রেজারার
প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাত্র-পরিষদ

রবীন্দ্র পরিষদঃ

বিশেষ কারণে রবীন্দ্র পরিষদের কার্যভার গ্রহণ করতে বিলম্ব হওয়ায় পরিষদের কর্মপঞ্জীর পাতা প্রায় শূন্য রয়েছে। এ বিভাগের কার্যকলাপে যাঁরা উৎসুক তাঁদের এই আশ্বাস দিতে পারি যে গঠনমূলক কার্যের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়নি।

এ বছর এ বিভাগের পক্ষ থেকে প্রথম অনুষ্ঠান হিসেবে গত ৩১শে মার্চ "বসন্ত" উৎসব সম্পন্ন হয় কলেজের আর্টস লাইব্রেরী হলে। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থেকে উৎসবের সাফল্য ও আনন্দের পরিপূর্তিতে অপূর্ব সহযোগিতার জন্য আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন শ্রীঅন্নদাশংকর রায়। উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল "বসন্ত" গীতিবিচিত্রা। কবিগুরু রচিত ঋতুসংগীতের সুরমাধুর্য, সংলাপের রসোৎকর্ষ, আর্টস লাইব্রেরী হলের গম্ভীর, অভিজাত পরিবেষ্টনী ও সর্বোপরি প্রধান অতিথির কালোপযোগী ভাষণ রসগ্রাহী শ্রোতৃবর্গের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও সন্তুষ্টি লাভে সমর্থ হয়েছিলো, উৎসব প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিলো। সংগীতাংশে শ্রীশিশির সেন, শ্রীদীপক মুখোপাধ্যায়, ও শ্রীঅরূপ রায়, ও আবৃত্তি বিভাগে শ্রীইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদীপ্তেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীতারক গাঙ্গুলী প্রশংসা অর্জন ক'রেছেন। আবহ সংগীতে একই সাথে বৈচিত্র্য ও মাধুর্য পরিবেশনের কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন "আওয়ার অর্কেষ্ট্রা" দলের সভ্যবৃন্দ ও আমাদের কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র শ্রীসলিল মিত্র। উৎসবের পরিকল্পনায় ও কার্যনির্বাহে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন অধ্যাপক শ্রীসরোজকুমার দাস ও অধ্যাপক শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে উৎসবের সকল বিভাগে কলেজের ছাত্রীবৃন্দের পরিপূর্ণ অসহযোগিতায় উৎসবের সাফল্য কোন অংশেই ব্যাহত হয়নি। তবে আশা করি ভবিষ্যতে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে একান্ত সহযোগিতা লাভ ক'রব।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র পরিষদ সম্বন্ধে দু' একটী কথা বলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ক'রতে পারছি। পরিষদের লাইব্রেরী ও পাঠগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সকলেই অবহিত আছেন। সম্পাদক হবার আগে পাঠগোষ্ঠীর দু' একটী অধিবেশনে যোগদান করবার সৌভাগ্য হয়েছিলো—ও সে সাথে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি সেটা মোটেই মধুর নয়। পাঠগোষ্ঠীর অধিবেশনে শ্রোতৃবর্গের উপস্থিতির স্বল্পতা বেদনাদায়ক। অধিবেশনে যে সব আলোচনার (যার প্রায় সবই ছিল প্রাণহীন ও নীরস) অবতারণা করা হোত সেগুলোর দুর্বোধ্যতাই বোধ হয় ছাত্রদের অপরিসীম ঔদাসীন্যের অন্যতম কারণ ছিল। তবে এ বিষয়ে পরিষদের পক্ষ থেকেও বলার মত যুক্তি আছে। সাংস্কৃতিক কার্যাবলীতে কলেজের ছাত্ররা যেটুকু সাহায্য বা সহযোগিতা করতেন সেটুকু মোটেই সম্পূর্ণ নয়। তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবেই অধিবেশনগুলো প্রাণহীন হয়ে পড়ত। অদূর ভবিষ্যতে ছাত্রদের পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ সহযোগিতা পাব তার কোন লক্ষণই দেখ্‌তে পাচ্ছি না—বরং দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে ক্রমবর্দ্ধমান ঔদাসীন্যেরই পরিচয় পাচ্ছি। সেজন্য ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রাণহীন ও দুর্বোধ্য আলোচনার অবতারণা করে ছাত্রদের অপ্রীতি লাভ করবার অভিলাষ নেই। পরিষদ পাঠগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর মূল্যের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত থেকে এ কথা জানাতে হচ্ছে। তবে বাসনা আছে যে মাঝে মাঝে খ্যাতনামা রসজ্ঞ ব্যক্তিবৃন্দের সহযোগিতায় জনপ্রিয় আলোচনার ব্যবস্থা ক'রব।

ইউনিয়ন সোসাইটীর বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ হ্রাসের সাথে ব্যয়সঙ্কোচের প্রশ্ন ও ক্রমে প্রকট হয়ে উঠছে। ব্যয়সঙ্কোচনের গুরুভার যদি কেবল রবীন্দ্র পরিষদ্ প্রমুখ দু' একটী বিভাগকেই বহন করতে হয় তবে কালক্রমে এবিভাগের কার্যকলাপকে বৈচিত্র্যবহুল ও সর্বজনপ্রিয় করে তোলা অসম্ভব হবে বলে আশঙ্কা হয়।

দীপককুমার রায়—সম্পাদক

বিতর্ক-পরিষদ ঃ

প্রেসিডেন্সি কলেজের বিতর্ক পরিষদ এক গৌরবময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। এই কলেজের Physics Theatre-এ দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কত বিতর্কের আয়োজন করা হয়েছে! এবারের বিতর্ক পরিষদ সম্বন্ধে কিছু লিখতে বসে প্রথমেই মনে হয় যে এই গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারাকে বাঁচিয়ে রাখবার সাধ আছে; জানিনা সাধ্য আছে কতটুকু! বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে যে কয়টি বিতর্কের আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে

প্রত্যেকটিতেই ছাত্রদের সাড়া ও অধ্যাপকবর্গের সহানুভূতি পাওয়া গেছে। হয়ত চলার পথে ভুলচুক হয়েছে অনেক ; সহৃদয় বন্ধুগণ ও শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকমণ্ডলী সেই ভুল দেখিয়ে দিলে আনন্দিত হব।

সাধারণত রাজনীতি বিষয়ে ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ সাড়া পড়ে যায়। দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এই মনোভাব নিশ্চয়ই খুব ভাল ; তবে আমাদের কলেজের ছাত্রদের কাছ থেকে চৌখস দৃষ্টিভঙ্গী আশা করা খুব অন্যায় হবে না। অত্যন্ত দুঃখের কথা, কলেজের ছাত্রীরা এ বছর বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেনি। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে তাঁরা যোগদান করবে।

বহরমপুরে কৃষ্ণনাথ কলেজে অনুষ্ঠিত আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় আমাদের কলেজ দলগতভাবে প্রথম স্থান অধিকার করে। কলেজের প্রতিনিধি ছিলেন স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্র শ্রীসনৎ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীঅশোকমোহন রায়। শ্রীসনৎ ভট্টাচার্য্য ব্যক্তিগত বক্তা হিসেবে প্রথম স্থান দখল করেন। আমরা তাঁদের সাফল্যে সত্যিই আনন্দিত ; তাঁদের অশেষ ধন্যবাদ জানাই। আমাদের কলেজে বিতর্ক পরিষদের উদ্যোগে আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। কলেজের প্রতিনিধি থাকবেন উপরোক্ত দু'জন ছাত্র।

সর্ব্বপ্রথমে কলেজের প্রতিষ্ঠাতৃ-দিবস উপলক্ষে প্রদর্শনী বিতর্কের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে এই বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেছিলেন অধ্যক্ষ ক্ষেত্রপালদাস ঘোষ, অধ্যাপক হীরেন মুখার্জ্জী, অধ্যাপক অম্লান দত্ত, শ্রীশিবেন্দু ঘোষ ও শ্রীতরুণ সরকার। বর্ত্তমান ছাত্রদের মধ্যে শুধু শ্রীসনৎ ভট্টাচার্য্য যোগদান করেছিলেন। বিতর্কের বিষয় ছিল "India should form a new bloc in order to maintain the balance of power." বিতর্কটি খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন রায়বাহাদুর বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায়। তারপর কলেজের ছাত্রদের সহযোগিতায় তিনটি সাধারণ বিতর্কের আয়োজন করা হ'ল। বিষয় ছিল যথাক্রমে :—"The recent amendment of the Indian Constitution is a violation of fundamental rights" ; "Religion is detrimental to social progress" ; এবং "The foreign policy of the USSR is injurious to world peace". প্রত্যেকটি বিতর্কে ছাত্র ও অধ্যাপকদের সক্রিয় সহানুভূতি ছিল।

প্রতিবারের মতন এবারেও বিতর্ক পরিষদের আর্থিক বরাদ্দ যথেষ্ট নয়। তবে কলেজ ইউনিয়ন সাধারণ বিতর্কের পরে যে জলযোগের আয়োজন করা হ'ত তা বন্ধ করে দিয়েছে। তবু, একমাত্র আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতায়ই যখন দু'শ টাকা দরকার, তখন তিনশ' টাকার budget কি যথেষ্ট ?

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাঁদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। অধ্যাপক অমিয় মজুমদার ও অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের সহানুভূতি ছাড়া হয়ত বিতর্ক পরিষদের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হ'ত না। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

শান্তনু মুখোপাধ্যায়—সম্পাদক

জুনিয়র কমন-রুম ঃ

এবারকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হল বার্ষিক স্টীমার পার্টি। আমাদের কলেজের সবচেয়ে আনন্দোচ্ছল উৎসব এই স্টীমার পার্টি। গতবার দেশের নানা দুর্দ্দৈবের ফলে এই অনুষ্ঠান বন্ধ থাকে, কাজেই এ বৎসর আমরা এর জন্য উন্মুখ হয়েছিলাম। গত ১৮ই মার্চ চাঁদপাল ঘাট থেকে আমাদের স্টীমার যাত্রা করল প্রায় দু'শ ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে। আমাদের সাথে ছিল মাইক্রোফোন, গ্রামোফোন, তাস, দাবা প্রভৃতি অজস্র আমোদের উপকরণ, আর মনে ছিল প্রচুর উৎসাহ এবং আনন্দ। মধ্যাহ্ন ভোজন এবং বৈকালিক চায়ের ব্যবস্থা

বেশ গুরুতরই হয়েছিল বলতে হবে। এবারকার 'জলযাত্রা' কর্ম্মীদের একনিষ্ঠ সাহচর্য্যে ও আন্তরিকতায় সাফল্য-মণ্ডিত হয়ে ওঠে। ডায়মণ্ডহারবারের দিকে অনেকদূর এগিয়ে চলার পর আমাদের স্টীমার ফেরানো হল—ফিরবার পথে বটানিক্যাল গার্ডেন্স্-এ বিরতি ও বিশ্রাম। যখন আবার আমাদের স্টীমার কলকাতার জেটিতে বাঁধল তখন চারিদিকে সন্ধ্যার আঁধার নেমেছে।

স্টীমার পার্টির সাফল্যের জন্য প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহাশয়কে, সপরিবারে উপস্থিত থেকে তিনি আমাদের খুঁটিনাটি সব কাজে উৎসাহিত করেছেন। এর পরেই নাম করব প্রাক্তন ছাত্র শ্রীকল্যাণ চৌধুরীর, ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রীরমনীমোহন ঘোষের, ক্রীড়াবিভাগের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসূর্য চ্যাটার্জ্জীর, ও বিতর্ক সম্পাদক শ্রীশান্তনু মুখার্জ্জীর। শ্রীপ্রদীপ দাস, শ্রীতুষার ঘোষ, শ্রীসুজিত ঘোষ, শ্রীঅলোক ব্যানার্জ্জী, শ্রীধীরেন নিয়োগী, শ্রীসলিল পাঞ্জা, শ্রীমৃণাল ভট্টাচার্য্য, শ্রীগৌতম সরকার, শ্রীঅনাদি ব্যানার্জ্জী—এঁদের প্রত্যেকে আমাকে যে-ভাবে সাহায্য করেছেন তা ভুলবার নয়।

কমনরুমে এবারকার নতুন আকর্ষণ হ'ল টেব্‌ল-টেনিস টীম চ্যাম্পিয়ানশিপ টুর্ণামেণ্ট। তাছাড়া আন্তঃবার্ষিক টেবলটেনিস, ক্যারম ও চেস্ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও হচ্ছে। আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় আমরা যোগ দেব। টেব্‌লটেনিস বিভাগে এবার অনেকগুলি নতুন ব্যাট ইত্যাদি কেনা হয়েছে। ছাত্রদেরও যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যাচ্ছে এই দিকে। ক্যারম ও চেসের সংস্কার করা হয়েছে, আর নতুন সম্পত্তির মধ্যে আমাদের বেড়েছে মনোপলি, ব্যাগাটেল ইত্যাদি—ছাত্রেরা অত্যন্ত আগ্রহের সাথেই সেগুলিকে গ্রহণ করেছেন।

আমাদের পত্রিকা বিভাগে দেশবিদেশের কতগুলি বিশিষ্ট পত্রিকা আসে, কিন্তু প্রথমতঃ সেগুলি যায় অধ্যাপক মহাশয়দের কমনরুমে, সেইখান থেকে সেগুলি ফিরে আসে প্রায় ২।৩ মাস পরে এবং ছাত্রদের সেগুলি পড়বার আর কোন আগ্রহ থাকে না। এ ব্যবস্থার একটা প্রতীকার হওয়া প্রয়োজন।

আমাদের চিরন্তন অভিযোগ পেশ করে আমার বক্তব্য শেষ করি। প্রত্যেক বছরই কর্তৃপক্ষকে জানানো হয় যে কি ছেলেদের, কি মেয়েদের কমনরুমগুলি আমাদের ছাত্রছাত্রীসংখ্যার তুলনায় অস্বাভাবিক রকম ছোট—কিন্তু তাঁরা কর্ণপাত করেন বলে মনে হয় না। লালফিতের মতিগতি বোঝা ভার—তবু আমাদের দিক দিয়েও তো একটা কর্ত্তব্য রয়েছে—তাই অভিযোগটা নতুন করে জানিয়ে শেষ করি।

সুধীরকুমার বসু—সম্পাদক

সমাজ-সেবা বিভাগ ঃ

আর্থিক দুরবস্থার জন্য এবারে এখনও অন্যান্যবারের মতন কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। তবে Anti-Leprosy Week পালন করা হয়েছে প্রচুর উৎসাহের সঙ্গে এবং সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে যক্ষ্মা-হাসপাতাল-গুলির সাহায্যকল্পে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীজনার্দ্দন চক্রবর্ত্তীকে এবং সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকদের ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করি।

সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়—সম্পাদক

ছাত্রীসংবাদ ঃ

প্রেসিডেন্সি কলেজে এ বছর শুধু ছাত্রীদের উদ্যোগে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গত ১৯শে আগস্ট্ 'রঙমহলে' অনুষ্ঠানটি মঞ্চস্থ করা হয়েছিল।

অনুষ্ঠানটি যে অসাধারণ হয়েছিল তা বলছি না, তবে এর বিশেষত্ব হল যে, আমরা—প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রীরা—যতদূর সম্ভব অনুষ্ঠানটিকে কলেজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করেছিলাম। সাধারণতঃ দেখা যায় অনেক জায়গাতেই এ ধরণের অনুষ্ঠানে বাইরের শিক্ষক আনা হয়; কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ছিল

শুধু নিজেদের চেষ্টাতেই এই অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের ছাত্রীদের মধ্যে যন্ত্রসঙ্গীতে তেমন পারদর্শী কেউ না থাকায় 'আর্ট ডিস্‌প্লে'র সৌখীন সম্প্রদায়ের সাহায্য আমাদের নিতে হয়। তাঁদের এই সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানাই। শ্রীমুকুন্দ বসু মল্লিকের অনবদ্য আবৃত্তি সহযোগে কোন একটি বিশেষ নাচ অধিকতর উপভোগ্য হয়েছিল। তাঁকে এজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তবে সাধারণভাবে ধরতে গেলে, এ অনুষ্ঠানের সমস্ত উদ্যোগ ছাত্রীরাই করেছিলেন, আর পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন তাঁরাই। অনুষ্ঠানে ছিল সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তি সহযোগে 'বর্ষাপ্রশস্তি' ও পরশুরাম-রচিত নাটক 'রাতারাতি'।

আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন। 'কলেজ ইউনিয়ন' এবং বিশেষ করে সমাজসেবা-পরিষদ অর্থ ও সহযোগিতা দিয়ে আমাদের সাহায্য করেন। তাছাড়া কলেজের অনেক ছাত্রদের সাহায্য আমরা নানাভাবে পেয়েছি। সেজন্য তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বহু চেষ্টা ও পরিশ্রমের পর আমরা কলেজে এই নতুন জিনিষটি প্রচলন করতে সক্ষম হয়েছি; আশা করি আমরা যা প্রবর্ত্তন করলাম, তাকে রক্ষা করবেন আমাদের পরবর্ত্তিনীরা।

রেবা দেব—সম্পাদিকা, গার্লস্ কমনরুম।

ইডেন হিন্দু ছাত্রাবাস সংবাদ ঃ

ছাত্রাবাস জীবনের একটি গৌরবোজ্জ্বল বছর আমরা পার হয়ে এলাম। ছাত্রাবাস সমিতির সুসংহত চেষ্টায় ছাত্রাবাস জীবন নানাদিক দিয়ে উন্নত ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এ বছর আবাসিকের সংখ্যা ছিল আন্দাজ দুশো চোদ্দ।

আমাদের প্রাক্তন তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভূপেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বেচ্ছায় চলে গেছেন, তাঁর স্থলে এসেছেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী মহাশয়। আশা করি তাঁর সক্রিয় সহযোগিতায় ছাত্রাবাস দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে।

বর্ত্তমানে আমাদের পাঠাগারে প্রায় পাঁচ হাজার গ্রন্থ আছে। এবার অনেক নতুন বই আমরা কিনেছি। বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকাও আমরা রাখছি।

খেলাধূলা বিভাগ এবার অন্যান্যবারের চেয়ে খেলাধূলার বেশী আয়োজন করেছে। ব্যাড্‌মিণ্টন, টেনিকয়ট, ভলি, টেবিলটেনিস ইত্যাদি খেলা নিয়মিত হয়েছে। আভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বেশ সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। তদানীন্তন তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক শ্রীভূপেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন। প্রতিবারের ন্যায় এবারও আমাদের এই বিভাগ আন্তঃছাত্রাবাস ফুটবল প্রতিযোগিতা পরিচালনা করে। এবার দশটি ছাত্রাবাস এতে যোগ দেন। ওয়াই. এম. সি. এ ষ্টুডেণ্টস্ ব্রাঞ্চ এবং বিদ্যাসাগর হষ্টেলের মধ্যে চূড়ান্ত খেলা হয়। জনপ্রিয় খেলোয়াড় টি, আও ওয়াই. এম. সি. এ'র পক্ষে খেলেন। বলাবাহুল্য তিনি খুব উঁচুদরের খেলা দেখান। ওয়াই. এম. সি. এ দল বিজয়ী হন। খেলাটি বিপুল দর্শক সমাগম ও উত্তেজনার মধ্যে শেষ হয়। অধ্যক্ষ ডাঃ জে, সি, সেনগুপ্ত মহাশয় বিজয়ী দলকে ট্রফী প্রদান করেন।

আমাদের খাদ্যসমিতিকে এবার এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। খাদ্যের বরাদ্দ অস্বাভাবিক রকম হ্রাস হওয়ায় আমাদের রোজই একবেলা অপূর্ব স্বাদ ও গন্ধযুক্ত রুটি খেতে হয়েছে। মধ্যে আবার রাত্রে এবং দিনেও খিচুড়ী খেতে হয়। এ সব সত্ত্বেও খাদ্য সমিতি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে।

সংস্কৃতি বিভাগ আমাদের আনন্দদানের যথেষ্ট ব্যবস্থা করেছে। শারদোৎসবে একটি জলসার আয়োজন

হয়েছিল। তাতে কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। তিনি 'বাংলা প্রগতি সাহিত্য' সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। এছাড়াও আমরা ২৩শে জানুয়ারী, ২৬শে জানুয়ারী, ১৫ই আগষ্ট প্রভৃতি পালন করেছি।

ছাত্রকল্যাণ বিভাগ প্রত্যেক আবাসিকের সাধারণ স্বাস্থ্যের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে এবং সময়মত টিকা ও ইন্‌জেকসনের বন্দোবস্ত করেছে।

এবারকার সরস্বতীপূজা সত্যি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে। পূজা কমিটির আপ্রাণ চেষ্টায় প্রাক্তন ও বর্ত্তমান আবাসিকদের প্রীতি-সম্মেলন উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। এতে উপস্থিত ছিলেন শ্রীশম্ভুনাথ ব্যানার্জী, জে, এন. তালুকদার, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল, অধ্যক্ষ সেনগুপ্ত এবং আরও অনেকে।

আমরা বর্ত্তমান আবাসিকদের পক্ষ থেকে বিদায়ী ২য় ও ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর আবাসিকদের বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছি।

এবার আমাদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে দু-এক কথা বলব। আমরা এবার একটি স্থানীয় বেতার যন্ত্রের জন্য আবেদন করেছিলাম। কিন্তু শিক্ষাবিভাগের পরিচালক মহাশয় আমাদের আবেদনটি অগ্রাহ্য করেছেন। তাছাড়া আমাদের ছাত্রাবাসের শূন্য আসনগুলিতে আবার পূর্ব্বের মত স্নাতকোত্তর ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আমরা এ বিষয় ভাইস্‌চান্সেলর মহাশয়ের নিকট হতে আশ্বাস পেয়েছিলাম। কিন্তু অনেকদিন হয়ে গেল, এখনও কিছু হয় নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে আমাদের ফল মন্দ হয় নি। বি. এ. এবং বি. এস. সি-তে চারজন প্রথম শ্রেণীর সম্মান পেয়েছেন। প্রাক্তন আবাসিক শ্রীঅজিত বিশ্বাস উচ্চশিক্ষার্থে আমেরিকা যাত্রা করেছেন।

পরিশেষে ছাত্রাবাস সমিতির পক্ষ থেকে আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ও শুভানুধ্যায়ী সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গুরুপদ দত্ত—সহঃ সভাপতি

মিলনকুমার গুপ্ত—সাধারণ সম্পাদক
ইডেন হিন্দু ছাত্রাবাস সমিতি

খেলাধূলা-বিভাগ ঃ

৩০. ৯. ৫০ তারিখে নবনির্ব্বাচিত খেলাধূলা সমিতির প্রথম বৈঠকে বিভিন্ন বিভাগের সম্পাদক নির্ব্বাচন হয়, এবং ৪ঠা অক্টোবর আয়ব্যয় নির্দ্ধারণের জন্য একটি সভা হয়। এই বছরের কাজের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল :

ফুটবল : এই বিভাগের সম্পাদক ছিলেন শ্রীসলিল লাহিড়ী এবং অধিনায়ক ছিলেন শ্রীভারত ভট্টাচার্য্য। এবারে প্র্যাক্‌টিস্ খেলাতে অনেক ছাত্র নিয়মিত যোগ দিয়েছেন। আন্তঃবার্ষিক এবং আরও কয়েকটি প্রীতিমূলক খেলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃকলেজ লীগে আমরা আমাদের বিভাগে ৪র্থ স্থান অধিকার করি, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনাধীনে যে দু'টি নক্-আউট টুর্ণামেণ্ট হয় তাতে বিদ্যাসাগর ও সুরেন্দ্রনাথ কলেজের কাছে পরাজিত হই। আন্তঃবার্ষিক টুর্ণামেণ্টে (বি. এম. সেন চ্যালেঞ্জ কাপ) তীব্র প্রতিযোগিতার পর অবশেষে ৩য় বর্ষ ২য় বর্ষের কাছে পরাজয় বরণ করে।

ক্রিকেট : এই বিভাগের সম্পাদক এবং অধিনায়ক যথাক্রমে শ্রীঅরুণ রায় এবং শ্রীজগন্নাথ মিত্র। অনেক ছাত্র নিয়মিত নেট্ প্র্যাক্‌টিসে যোগ দেন, এবং ট্রায়াল খেলার মধ্যে দিয়ে কলেজ টীম নির্ব্বাচিত হয়। এবারে মাত্র ৪টি প্রীতিমূলক খেলা হয়েছে, কারণ আন্তঃকলেজ লীগের খেলা যখন পিছিয়ে দেওয়া হল, তখন স্থানীয় ক্লাবগুলির সঙ্গে খেলার ব্যবস্থা করার উপায় ছিল না। আন্তঃকলেজ নক্-আউট টুর্ণামেণ্টে আমরা

প্রথম রাউণ্ডে সিটি কলেজের কাছে অল্পের জন্য পরাজিত হই। প্রাক্তন ও বর্ত্তমান ছাত্রদের মধ্যে প্রদর্শনী খেলাতে এবারে প্রাক্তন ছাত্ররা জয়লাভ করেন। তাঁদের দলে কয়েকজন প্রাদেশিক খেলোয়াড় ছিলেন। ৩য় বর্ষকে পরাজিত করে ৪র্থ বর্ষ এবারে আন্তঃবার্ষিক ট্রফী (এ. কে. চন্দ চ্যালেঞ্জ কাপ) লাভ করার সম্মান অর্জ্জন করে।

টেনিস: শ্রীপ্রবীর বসুর পরিচালনায় এবং শ্রীমোহনলাল বর্ম্মণের নেতৃত্বে ১০ জন সদস্যকে নিয়ে এই বিভাগটি এবারে প্রকৃতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আন্তঃকলেজ খেলায় আমরা প্রথম রাউণ্ডে মেডিক্যাল কলেজের কাছে পরাজিত হই। প্রতিষ্ঠা সপ্তাহে প্রাক্তন ও বর্ত্তমান ছাত্রদের মধ্যে যে প্রদর্শনী খেলা হয় তাতে প্রাক্তন ছাত্রদের পক্ষে ছিলেন ভারতের প্রথম খেলোয়াড়, শ্রীদিলীপ বসু, শ্রী কে. বি. ম্যাডন প্রভৃতি। ছাত্রদের টুর্ণামেণ্টে সিঙ্গল্‌সে শ্রীমোহনলাল বর্ম্মণ এবং ডাবল্‌সে শ্রীমোহনলাল বর্ম্মণ ও শ্রীপ্রবীর বসু বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন।

হকি: এই বিভাগের সম্পাদক এবং অধিনায়ক ছিলেন যথাক্রমে শ্রীগুরুপদ দণ্ড এবং শ্রীদীপঙ্কর ঘোষ। এবারে আমাদের খেলা খুব ভাল হ'তে পারেনি। আন্তঃকলেজ লীগে আমরা ৫ম স্থান অধিকার করি এবং নক্-আউট খেলাতে দ্বিতীয় রাউণ্ডে ল' কলেজের কাছে পরাজিত হই। আশুতোষ চৌধুরী কাপ প্রতিযোগিতা এখনও আরম্ভ হয়নি। বিদায়ী এবং বর্ত্তমান ছাত্রদের মধ্যে এবারে একটি প্রদর্শনী খেলা হয়, হকি আম্পায়ার সমিতির সভাপতি ডক্টর কে. ডি. ঘোষ এবং সম্পাদক শ্রীসন্তোষ গাঙ্গুলী আম্পায়ারের ভূমিকায় আমাদের খেলায় যোগ দেন।

নৌ-পরিচালনা: সম্পাদক শ্রীপ্রবীর সেন, অধিনায়ক শ্রীপ্রিয়ব্রত সরকার এবং ১৪ জন সদস্যকে নিয়ে এই সমিতি গঠিত হয়। আন্তঃকলেজ রেগাটাতে আমরা Sculls এবং Fours প্রতিযোগিতায় পরাজিত হই।

Small Area Games: ভলিবল, ব্যাড্‌মিণ্টন ও বাস্কেট্‌বল—এই তিনটি বিভাগ নিয়ে গঠিত ছোটখাটো খেলাধূলা বিভাগের সম্পাদক ছিলেন শ্রীঅমল সেন। ভলিবলের অধিনায়ক শ্রীসন্তোষ কর্ম্মকার। ভলিবলে আমরা দ্বিতীয় রাউণ্ডে স্কটিশচার্চ্চ কলেজের কাছে পরাজিত হই। প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টর জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ প্রদত্ত ট্রফীর জন্য যে আন্তঃবার্ষিক প্রতিযোগিতা হয়, তাতে ৪র্থ বর্ষ ২য় বর্ষকে পরাজিত করে ট্রফী লাভ করে। এই বছর ছাত্রদের জন্য ব্যাড্‌মিণ্টনের ব্যবস্থা হয়, এতদিন এটি ছাত্রীদেরই একচেটিয়া ছিল। দশ বছর পরে এবারে আবার বাস্কেট্‌বল খেলা আরম্ভ হয়, কিছু ছাত্র এই ক্লাবে যোগ দিয়েছেন।

বাৎসরিক প্রতিযোগিতা: ২০. ১. ৫১ তারিখে বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীঅপূর্ব্বকুমার চন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীমতী জে. সি. সেনগুপ্ত পুরস্কার বিতরণ করেন। প্রতিযোগিতার প্রারম্ভে একটি March-Past অনুষ্ঠান হয়, প্রতিযোগী ছাত্রছাত্রীরা এতে যোগ দেন। শ্রীসন্তোষ কর্ম্মকার ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন, ছাত্রীদের মধ্যে শ্রীনন্দিনী জানা সর্ব্বাধিক পয়েণ্ট অর্জ্জন করেন। শ্রীবিলালরাজ হুসেন এবং শ্রীমলয় লাহিড়ী এবারে ফুটবল ব্লু অর্জ্জন করেছেন।

আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আমাদের কলেজের প্রতিনিধি শ্রীসন্তোষ কর্ম্মকার ২০০ মিটার রেসে প্রথম এবং ১০০ মিটার রেসে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

ব্যায়ামাগার: মোটামুটি ২০ জন ছাত্র নিয়মিত ব্যায়ামাভ্যাস করেন।

ছাত্রীবিভাগ: এই নবপ্রবর্ত্তিত বিভাগটির সম্পাদিকা ছিলেন শ্রীনন্দিনী জানা। এবারে অনেক ছাত্রী নিয়মিত ব্যাড্‌মিণ্টন খেলেন।

আমাদের অভাব ও দাবী : খেলাধূলার প্রয়োজনীয় সব জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধির দরুণ আমাদের খরচে কুলানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আমাদের অনুরোধ, সরকারী বরাদ্দ ১০০০৲ টাকা বাড়িয়ে ২০০০৲ টাকা করা হোক, এবং ছাত্রদের চাঁদা বাড়িয়ে জনপিছু ৫৲ টাকা করা হোক। আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয় কলেজ কর্তৃপক্ষের আগামী সভায় চাঁদা বাড়ানোর প্রস্তাব আনবেন।

পরিশেষে, আমাদের পরিদর্শক শ্রীযুক্ত চ্যাটার্জ্জিকে তাঁর অক্লান্ত সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানাই। বিভিন্ন বিভাগের সম্পাদক ও অধিনায়করা নিঃস্বার্থভাবে তাঁদের কাজ করে গিয়েছেন; সর্ব্বোপরি, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের অধ্যক্ষ, বার্সার এবং অন্যান্য অধ্যাপকদের।

কার্য্যকরী সমিতি, ১৯৫১—৫২

সাধারণ সম্পাদক : শ্রীকল্যাণ দত্তগুপ্ত
হকি : শ্রীসলিল পাঞ্জা
Rowing : শ্রীদীপঙ্কর ঘোষ
ছাত্রীবিভাগ : শ্রীচিত্রা সরকার
ক্রিকেট : শ্রীনারায়ণ গাঙ্গুলী
টেনিস : শ্রীবরুণ দে
Small Area Games : শ্রীসুজিৎ সরকার

সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়—সাধারণ সম্পাদক

ইতিহাস সেমিনার :

আমার পূর্বসূরী শ্রীশিবনাথ রায়-এর আমলেই ইতিহাস সেমিনারের পক্ষ থেকে এক বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ ডক্টর ভবতোষ দত্ত "বিশ্ব অর্থ নৈতিক সংগঠনে আমেরিকার ভূমিকা" সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

আমরা তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতেই কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা করতে পেরেছি। এক বিশেষ অধিবেশনে ডক্টর শশিভূষণ চৌধুরী "বিউরী ও টয়নবীর মতবাদ"-শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। অর্থনীতির ছাত্র শ্রীসুবীরচন্দ্র দাসগুপ্ত "এক নতুন দৃষ্টিকোণে ইতিহাস" বিষয়ে এক নিবন্ধ পাঠ করেছেন। ইতিমধ্যে শ্রীদীপেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅসীম দাসগুপ্ত যথাক্রমে "প্রাচীন ভারতে রাজবর্জ্জিত রাষ্ট্র" ও "ইতিহাসের ধারা" বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন। কিন্তু কলেজের বিতর্ক-সমিতির পক্ষ থেকে ঐ দিনগুলিতে বিতর্ক সভার আয়োজন হওয়ায়, এই অধিবেশনগুলি স্থগিত রাখতে হয়।

ডক্টর চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত ইতিমধ্যে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যাদুঘরের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ দেখিয়ে নিয়ে আসেন; অন্যান্য বারের মত এবারেও বিষ্ণুপুর না গিয়ে অন্য কোনও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানে যাবার জন্য আমরা সকলেই বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠি। কিন্তু এই শিক্ষামূলক যাত্রায় অর্থ নৈতিক সাহায্যের জন্য সরকারের কাছে পেশ-করা আবেদন-পত্রের চিরাচরিত ফলাফল জেনে সে আশা ত্যাগ করতে হয়।

গত মার্চ্চ মাসে সেমিনারের পক্ষ থেকে বিদায়ী ছাত্রছাত্রীদের এক প্রীতি-সম্মিলনীতে আপ্যায়িত করা হয়। অধ্যাপকমণ্ডলী, বিদায়ী ও বর্ত্তমান ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এক 'গ্রুপ ফটো' তোলা হয়।

সেমিনার লাইব্রেরীতে এখন পুস্তকসংখ্যা মোট একশো ছাব্বিশ; তা ছাড়া বিলেতের The Historical Association থেকে প্রকাশিত 'History'-নামক ষান্মাসিক পত্রিকা ও বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'ইতিহাস' নিয়মিত রাখা হচ্ছে।

নবাগত তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের কাছ থেকে এর মধ্যেই আমরা যথাযথ সাড়া পেয়েছি; আশা করি, তাদের সক্রিয় সহায়তায় সেমিনারের অধিবেশনের কার্য্য আরও সজীব ও প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠবে।

কলেজ পত্রিকার আগামী সংখ্যায় আমাদের পূর্ণতর বিবরণী পেশ করতে পারবো বলে আশা করি, এবং বিশ্বাস করি, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকমণ্ডলীর উৎসাহে আমাদের উজ্জ্বল ঐতিহ্য সগৌরবে বহন করতে পারব।

সুহৃদপ্রসন্ন মল্লিক—সম্পাদক

রাজনীতি সেমিনার :

এ বছরে রাজনীতি পাঠগোষ্ঠীর কাজ কেবলমাত্র কয়েকটী বইয়ের আদান-প্রদানের ভিতরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আমাদের কাজের ক্ষেত্রকে আমরা এবছর অনেক বেশী প্রসারিত করতে চেষ্টা করেছি।

আমাদের প্রাথমিক কার্য্যসূচী ছিল চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর অর্থনীতি বিভাগের বিদায়ী ছাত্রদের প্রতি পাঠগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন এবং এ অনুষ্ঠানে আমরা অর্থনীতি পাঠগোষ্ঠীর সঙ্গে একযোগে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। সভার সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ জে. সি. সেনগুপ্ত। সভান্তে কিঞ্চিৎ জলযোগের পর চতুর্থ ও তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ও অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপকদের নিয়ে একটা গ্রুপ ফটো তোলা হয়।

অধ্যাপক রমেশচন্দ্র ঘোষ পাঠগোষ্ঠীর একটি আলোচনা সভায় সম্মিলিত রাষ্ট্রপরিষদের নীতি ও কার্য্যাবলী নিয়ে এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন এবং তাঁর বিদগ্ধ মনের রেখাপাতে এই আলোচনা সভা অত্যন্ত উপভোগ্য হয়। পরবর্ত্তী কয়েকটী আলোচনা সভায় আমাদের ছাত্রবন্ধুদের কয়েকজন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্ব-লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন।

গ্রীষ্মের ছুটির ঠিক আগে আমাদের পাঠগোষ্ঠীর পরিচালনায় একটি 'মক পার্লামেণ্ট' অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয় সমস্ত আয়োজনের ভার একটি নবগঠিত বিভাগের হাতে দেওয়া হয়। অবশ্য এই অনুষ্ঠানে যোগদানকারীরা কেবলমাত্র অর্থনীতি বিভাগের ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার শ্রীঈশ্বরদাস জালান আমাদের এই 'মক পার্লামেণ্টের' স্পীকারের অংশ গ্রহণ করেন। এ অনুষ্ঠানটিকে সার্থক করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম এবং এ কাজে আমরা কতদূর সফল হয়েছি তা বিচার করবার তার সাধারণ ছাত্রদের উপর।

আমাদের অধ্যাপকদের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাঁদের সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা ও উৎসাহদানের জন্য। ছাত্রবন্ধুদের ভিতর অর্থনীতি পাঠগোষ্ঠীর সম্পাদক শ্রীসনৎকুমার ভাদুড়ী, শ্রীবিজন দত্ত, শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমোহিত ভট্টাচার্য্য ও শ্রীভারতেন্দু গুপ্তকে তাঁদের আন্তরিক সহযোগীতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রাজনীতির অধ্যাপক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়ের অকাল মৃত্যুতে আমরা আন্তরিক দুঃখিত। তাঁর লোকান্তরিত আত্মার শান্তি কামনা করি।

সুনীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—সম্পাদক

অর্থনীতি সেমিনার :

ম্যাগাজিনের তাড়নায় প্রতি বছর একবার করে সালতামামি হয়; আত্মঘোষণায় গৌরব মেলে গোছের সাফল্যের ফিরিস্তি পড়ে, কারণ, জবাবদিহির বালাই নেই। আত্মঘোষণা করে প্রতারণার দায়ে দায়ী হবার ইচ্ছে নেই আমাদের; তবু, পাঁচজনে আমাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন—এতে একটু গর্ব অনুভব করি বইকি।

অর্থনীতি পাঠগোষ্ঠী হাতে পেয়ে কর্তব্যের চাইতে কৃত কাজ কম হয়েছে বলতে লজ্জা নেই, কারণ আগেরটার শেষ নেই, শেষেরটার আছে।

চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে আমাদের বছরের কাজ সুরু হয়।

অনেকের উপস্থিতিতে এবং আলোচনা-প্রত্যালোচনার মধ্যে দিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ পড়া হয় :

১। Present phase and prospects of Indian indusries—সুধীর দাশগুপ্ত

২। Role of cottage industries in India—দীনেন্দ্র মারিক

৩। Abolition of Zamindari system—ভারত ভট্টাচার্য্য

৪। Self-Sufficiency in food—বিশ্বনাথ দত্ত

এ বছরের বড় আকর্ষণ Mock Parliament অনুষ্ঠানের উদ্যোগে আমরা 'নিমিত্তমাত্র' ছিলাম। কলেজের সকল শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সুন্দর হয়েছিল।

প্রতি পাঠগোষ্ঠীর বেঁচে থাকার মূলধন তার অল্প কয়েকটি বই। সঞ্চয়ের স্বল্পতা আর প্রাপ্তির ঔৎসুক্য—এ দু'টোর বৈরিতে লঙ্কাকাণ্ড হয়। সহযোগিতা এবং সহানুভূতির মাধ্যমে আমাদের বই দেওয়া-নেওয়া যে আংশিক সাফল্য লাভ করেছে সে-কথা স্বীকার করায় লজ্জা নেই; কারণ ওটা সবক্ষেত্রেই আংশিক। নতুন কয়েকখানি বই কিছুদিন হল সাধারণ পাঠাগার থেকে আমাদের হাতে এসেছে। সংখ্যার সঙ্গে গুরুত্ব বেড়েছে; এখন মন পাওয়া নিয়ে কথা।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন রায়ের আকস্মিক মৃত্যু আমাদের ব্যথিত করেছে। তাঁর লোকান্তরিত আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাই।

সবশেষে, আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ঘোষালকে। সকল প্রচেষ্টার উদ্ভাবন ও সাফল্যের মূলে তাঁর নির্দ্দেশ ও উপদেশ অনস্বীকার্য্য।

সনৎকুমার ভাদুড়ী—সম্পাদক

দর্শন সেমিনার :

দর্শন পরিষদের সম্পাদক পদ নিয়ে এবার একটু গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছিল—প্রথম নির্বাচনে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটু বিরোধের আভাষ দেখা দিয়েছিল—তাই হয়তো দ্বিতীয় নির্বাচনের প্রয়োজন হয়েছিল। যাই হোক এবারকার নির্বাচনের বিশেষত্ব হলো, প্রথাসিদ্ধ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে এবার ছাত্রীদেরও সুযোগ দেওয়া হয়েছে—অবশ্য এর মূলে ছিল শ্রদ্ধেয় শ্রীসরোজকুমার দাসের একান্ত আগ্রহ ও উৎসাহ।

দর্শন পাঠগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে, গত ফেব্রুয়ারীতে বিদায়ী ছাত্রছাত্রীদের এক প্রীতি সম্মিলনীতে আপ্যায়িত করা হয়। তাতে পৌরোহিত্য করেন ডক্টর সরোজকুমার দাস। শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার সভায় উপস্থিত থেকে তাঁর ভাষণে আমাদের প্রতি তাঁর অন্তর্নিহিত সহানুভূতির পরিচয় দিয়েছিলেন। সংগীতে, আবৃত্তিতে সেদিনকার ছোট্ট অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছিলো।

তারপর আবার আমরা সম্মিলিত হয়েছিলাম আগষ্টের এক সন্ধ্যায় ডক্টর সরোজকুমার দাসের বিদায় সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে। সভাপতিরূপে পেয়েছিলাম, সেদিন অধ্যক্ষ ডক্টর যতীশচন্দ্র সেনগুপ্তকে। অধ্যাপক জনার্দ্দন চক্রবর্তী, অধ্যাপক মনমোহন ঘোষ, অধ্যাপক অমিয়কুমার মজুমদার সভাস্থলে উপস্থিত থেকে আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। পরিশেষে সেদিনকার সান্ধ্যসম্মেলনটি সার্থক হয়ে ওঠে শ্রদ্ধেয় ডক্টর দাসের মনোজ্ঞ ভাষণে।

এবার পাঠগোষ্ঠীর কার্য্যবিবরণী সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করছি। এর মাঝে সভা হয়েছে ৬টি—আলোচনা হয়েছে দুটি বিষয় নিয়ে: "দর্শন ও বিজ্ঞান" এবং "বিজ্ঞান ও ধর্ম।" প্রথমটি হয়েছে ডক্টর সরোজকুমার দাস ও দ্বিতীয়টি হয়েছে অধ্যাপক গোপীনাথ ভট্টাচার্য্যের সভানেতৃত্বে। ছাত্র ছাত্রীদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ, উৎসাহ, উৎসুক উপস্থিতি ও আলোচনা, প্রত্যালোচনায় যোগদান সভাগুলিকে সুন্দর করে তুলেছিল। আশা করা যায় পূজোর ছুটির আগে আমরা আরো কয়েকটি সভায় মিলিত হতে পারবো।

আজ প্রায় দুমাস হতে চললো, শ্রীযুক্ত দাস এ কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আজ পর্য্যন্ত তাঁর শূন্য স্থান পূর্ণ করা হয়নি। কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য যেন ক্রমশঃ অসহনীয় হয়ে উঠছে। আশা করি আমাদের ক্ষতির পরিমাণ চিন্তা করেও অন্ততঃ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে একটু কর্মতৎপরতার পরিচয় দেবেন।

পাঠগোষ্ঠীতে পুস্তক সংখ্যা এখন প্রায় ১০০। এবছর পুস্তক সংখ্যা আর বৃদ্ধি করা হয়নি। পাঠগোষ্ঠীতে দর্শন সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকার অভাব বোধ করছি। সাধারণ গ্রন্থাগারে তা নিয়মিত রাখা হয়, কিন্তু আমাদের পক্ষে সুবিধা হয় যদি সেগুলি আমাদের পাঠগোষ্ঠীতে আনাবার ব্যবস্থা করা হয়। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

প্রসংগতঃ বলে রাখি, পাঠগোষ্ঠীর গ্রন্থাগারিক রূপে শ্রীপ্রদীপ সেনগুপ্ত যথেষ্ট কর্মকুশলতার পরিচয় দিচ্ছেন। উপসংহারে ধন্যবাদ জানাই যুগ্মসম্পাদক শ্রীরমণীমোহন ঘোষকে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতার জন্য।

পাঠগোষ্ঠীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

কমলা বোস—যুগ্ম সম্পাদিকা

বাংলা সেমিনার :

সাধ আর সাধ্যে বোধ হয় কোনদিনই সামঞ্জস্য ঘটেনা। আমাদের কল্পনা ছিল যা, তার অর্দ্ধেকও যদি কাজে পরিণত ক'রতে পারা যেত! স্থান-কাল-পাত্রের নানা প্রতিকূলতার জন্যেই তা সম্ভব হয়নি।

সেমিনারের প্রথম অনুষ্ঠান মাঙ্গলিক নয়, বেদনা-বিধুর। সরকারী শিক্ষা-বিভাগের কর্মকর্তাদের আকস্মিক নির্দেশমত বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্রকে বদলী হ'য়ে যেতে হয় হুগলী মহসীন কলেজে। মধ্য ফাল্গুনের এক স্মরণীয় অপরাহ্ণে কলেজের ৮নং ঘরে তাঁকে বিদায়-সম্বর্ধনা জানানো হয়। অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী সভাপতিত্ব করেন। ছাত্রদের অনুরোধ কবি-অধ্যাপক তাঁর 'পৌত্তলিক' থেকে, কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনান। অধ্যাপকমণ্ডলী ও ছাত্রদের পারস্পরিক সহযোগিতায় সেদিনের সভায় গ'ড়ে উঠেছিল এক ঘরোয়া পরিবেশ।

ঘরটি আল্‌পনা শোভিত করেন ছাত্রীরা। বাংলা সেমিনারের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ মিত্রকে শ্রদ্ধা-স্মৃতি-প্রীতির অভিজ্ঞান স্বরূপ দেওয়া হয় শিল্পী সুভো ঠাকুরের একটি এ্যালবাম।

'শুভম্' দিয়ে সূচনা আমাদের হয়নি। তাই দ্বিতীয় সভাও আহূত হয়েছিল চতুর্থ বার্ষিক ছাত্র ছাত্রীদের বিদায় অভ্যর্থনার জন্যে। পূর্বজদের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচ ভাববিনিময়ই ছিল সেদিনের সভার মৌন বৈশিষ্ট্য। বর্তমানের আমরা আর প্রায়-অতীতের বিদায়ী ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সংযোগের সেতু রচনা ক'রেছিলেন সভায় উপস্থিত অধ্যাপকবৃন্দ। অল্প জলযোগের মধ্যে দিয়েই সেদিন 'মধুরেন সমাপয়েৎ' করা হয়।

তৃতীয় সভা হয় প্রথম-জ্যৈষ্ঠের এক অপরাহ্ণে 'কবি প্রেমেন্দ্রমিত্র' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীনিখিলকুমার নন্দী। সভাপতি ছিলেন কবি-সমালোচক সঞ্জয় ভট্টাচার্য। আধুনিক বাঙালী 'কবি ও কবিতা' প্রবন্ধ-ক্রমিকার এটি উদ্বোধনী আলোচনা। আমাদের পরিকল্পনা আছে, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী থেকে সুরু ক'রে ইদানীংকাল পর্যন্ত আধুনিক বাংলা কবিতার ধারা ও প্রধান প্রধান কবিদের বিস্তৃত ও ধারাবাহিক আলোচনা ক'রবো।

৪র্থ সভা শ্রাবণের প্রথমদিকে, এক শুক্রবারে : 'আলোচনী' শীর্ষক সাহিত্য বৈঠকের প্রথম অধিবেশন। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'রবীন্দ্র-দর্শন' সমালোচনা প্রসঙ্গে অন্যান্য গ্রন্থের সাহায্যে বইখানির ইতি ও নেতির উপস্থাপনা করি আমি। এই বৈঠকের জন্য আরো আলোচনা প্রস্তুত হ'য়ে সুযোগের প্রতীক্ষায় আছে।

জনসভা 'নজরুল সংস্কৃতি অনুষ্ঠান'। হয় ২৫শে শ্রাবণ, কলেজ ফিজিক্স থিয়েটারে। দুঃস্থ ও অসুস্থ কবিকে রোগমুক্ত করা আমাদের, ছাত্র-ছাত্রীদেরই দায়িত্ব। বাংলা সেমিনারের উদ্যোগে কলেজে একটি 'নজরুল সাহায্য সপ্তাহ' পালন' পালন করা হয় কবিকে সাহায্য করার জন্যে। বলা দরকার, আমাদের অর্থ-সাহায্য করার সীমা সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট সচেতন। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, কবির জন্যে এককালীন শুধু কিছু অর্থ সাহায্য নয়, তাঁকে রোগমুক্ত করার জন্যে ছাত্র-সাহিত্যিক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে একটি স্থায়ী আন্দোলন গ'ড়ে তোলা। 'নজরুল জন্মোৎসব কমিটি' না হলেও ক্ষতি ছিলনা। যা বড়ো বেশি দরকার, তা হচ্ছে 'নজরুল রোগ মুক্তি কমিটি' সংগঠনের। তাঁকে যেন আমরা মনে মনে খরচের খাতায় ঠাঁই দিয়েছি, তাই ২৫শে বৈশাখের মত পালন করি ২রা জ্যৈষ্ঠ। এর চেয়ে বড়ো অন্যায় আর নেই। এই 'নজরুল সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে' সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত। কবির কাব্য ও জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী, শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীতারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' উদ্বোধন সংগীত গান করেন অরূপকুমার রায় ও গোষ্ঠী। শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনিখিলকুমার নন্দী যথাক্রমে 'সব্যসাচী' আবৃত্তি ও স্বরচিত কবিতাপাঠ করেন। শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব রায়ের নজরুলগীতি উপভোগ্য হয়েছিল।

দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, সেদিনের সভায় কেউ কেউ যে রুচিজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তা প্রেসিডেন্সি কলেজের পক্ষে মোটেই শ্লাঘনীয় নয়। সহযোগিতা চেয়ে বিভিন্ন কলেজ-ইউনিয়নকে আমরা চিঠি লিখি। একমাত্র বেথুন কলেজ ছাড়া অন্য কোন কলেজ থেকে সাড়া পাইনি। তাঁরা অল্প সময়ের মধ্যেই ৩০৲ সংগ্রহ ক'রে দেন। ছাত্রীপরিষদের সম্পাদিকা লক্ষ্মীসোণা রায়কে এজন্যে ধন্যবাদ জানাই। সবশুদ্ধ সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ১২০।/৫।

এবার অভিযোগ অনুযোগের পালা। প্রথমেই স্মরণ করতে হয় সেমিনার গ্রন্থাগারের দৈন্য। অনেক প্রয়োজনীয় Reference বই কেনা হয়নি। আরো বেশি টাকা মঞ্জুর করা উচিত। অথচ শোনা যাচ্ছে টাকা নাকি আরো কমানো হবে। তাহ'লে শুধু নামের খাতিরে আরেকটি গ্রন্থাগার রেখে লাভ কী, যদি তাকে সাধারণ গ্রন্থাগারের বই ধার ক'রেই অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়?

অন্য সেমিনারে জর্নাল' নেওয়া হয়। আমাদেরও 'বিশ্বভারতী' ত্রৈমাসিকী রাখা একান্ত দরকার সেমিনারে, অথচ তার জন্যে কোন ব্যবস্থাই নেই।

এ-ছাড়া আর যা কল্পনায় আছে তার দীর্ঘ ফিরিস্তিতে কোন লাভ নেই। আশা করি, নবাগত ৩য় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের সহযোগিতায় আরো পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব হবে।

সেমিনারের কাজে সর্বদাই সহপাঠী ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতা পেয়েছি। বিভাগীয় অধ্যাপকমণ্ডলীর সঙ্গে যে নিবিড় সম্পর্ক, এক ছত্রের কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনে তাকে ছোট ক'রতে চাইনে। তবু, বিশেষ ক'রে অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য এবং ছাত্রবন্ধুদের মধ্যে রবীন্দ্র-পরিষদের প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীদীপককুমার রায় ও শ্রীনিখিল কুমার নন্দীর নাম নানাকারণে আমার দায়িত্বপালনের অংশ হিসেবেই উল্লেখ ক'রতে হয়।

রবীন্দু গুপ্ত—সম্পাদক

ভূজ্ঞান পরিষদ

আমাদের কলেজের ভূজ্ঞান বিভাগ মাত্র এক বৎসর হইল খোলা হইয়াছে। নূতন হইলেও ভূজ্ঞান পরিষদের কার্য্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা হইতেছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে সাধারণ অধিবেশনের দ্বারা গভীর তত্ত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়—

(১) The Origin of the Earth

—সোহং ভট্টাচার্য্য

(২) Tea

—তড়িৎদেবরায়

(৩) Running Water

—নন্দিতা চৌধুরী

(৪) Cotton in India

—সত্যেন চক্রবর্তী

(৫) The interior of the Earth

—সবিতা সেন

(৬) Utilisation of Coal in India

—প্রণবকুমার গুপ্ত

প্রবন্ধ পাঠের শেষে প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় বহুসংখ্যক ছাত্র যোগদান করেন।

প্রথম প্রবন্ধটিতে লেখক পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদের নানাবিধ মতবাদ প্রকাশ করেন। পরিশেষে তিনি Jeans এবং Jeffry'র "Tidal hypothesis" গ্রহণ করেন।

Tea প্রবন্ধে লেখক চায়ের জন্মস্থান, ক্রমপ্রসার এবং আধুনিক জগতের ব্যবসাক্ষেত্রে চা রপ্তানীতে ভারতবর্ষের স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

শ্রীযুত চক্রবর্তী তাঁহার প্রবন্ধে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের তুলার অবস্থার তুলনা করিয়া দেখান—ভারত যদি আরও বেশী পরিমাণে তুলা শিল্প এবং তুলা চাষের দিকে মনোনিবেশ না করে তবে শীঘ্রই তাহাকে ঐ শিল্পে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে অনেক পিছাইয়া পড়িতে হইবে।

Running water প্রবন্ধে উহার গঠনমূলক এবং ধ্বংসমূলক দিক দেখান হয়। এই আবহমান জলকে মানুষ চাষাবাদ ও শিল্পোন্নতির জন্য কিরূপে বিভিন্ন উপায়ে কার্য্যকরী করিতে পারে লেখিকা সে পথ প্রদর্শন করেন।

পৃথিবীর অভ্যন্তরের অবস্থা বলিতে গিয়া লেখিকা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের মতবাদ আলোচনা করিয়া, সমাপ্তিতে বলেন—The problems connected with the earth's interior are fascinating but difficult and some of them are quite insoluble. এ বিষয়ে আরও জ্ঞানলাভের জন্য তিনি কয়েকটি বইএর কথা উল্লেখ করেন।

"Utilisation of coal in India" প্রবন্ধে লেখক ভারতের high grade coaking coalএর যে অত্যন্ত অপচয় হইতেছে সে বিষয়ে বিশেষ জোর দেন। এবং এরূপ অপচয়ে যে সমস্ত ভাল কয়লা অতিশীঘ্র নিঃশেষ হইয়া যাইবে সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরিশেষে তিনি maximum of proper utilisation of coalএর জন্য পথ নির্দেশ করেন।

এই সমস্ত অধিবেশনে ভূজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীনিশিথরঞ্জন কর মহাশয় সভাপতিত্ব করেন।

ভূজ্ঞান পরিষদ হইতে দুইটি excursionএর ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমটি শাহ্‌গঞ্জে Dunlop Rubber Companyতে। ভূজ্ঞানের প্রায় সমস্ত ছাত্রছাত্রী ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন। অধ্যাপক শ্রীশিবপ্রসাদ দাশগুপ্ত ছাত্রদের সঙ্গে গমন করেন। কোম্পানী কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের Rubber সম্বন্ধীয় সমস্ত জিনিষ বুঝাইয়া দিবার সুবন্দোবস্ত করেন এবং তাহাদের মধ্যাহ্ন ভোজনে আপ্যায়িত করেন। এখানে ছাত্ররা rubber সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞানলাভ করে। আমরা ভূজ্ঞান পরিষদের পক্ষ হইতে Dnnlop কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি! ইহার পর অক্‌টারলোনি মনুমেন্টে যাওয়া হয়। মনুমেন্টের উপর হইতে ছাত্র এবং শিক্ষকে মিলিয়া কলিকাতার urban geography পর্য্যবেক্ষণ করা হয়।

পরিষদের লাইব্রেরি আমাদের অমূল্য সম্পদ। বহু দেশী, বিদেশী এবং দুষ্প্রাপ্য ফরাসী পুস্তক দ্বারা ইহা সমৃদ্ধ। নিয়মিতভাবে ছাত্রদের এখানে বই দেওয়া হয়। লাইব্রেরির কাজ অত্যন্ত ভালভাবে চলিতেছে। ইহা পরিচালনার জন্য পরিষদ লাইব্রেরিয়ান শ্রীনন্দিতা চৌধুরী আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

ছায়াচিত্রের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা আমাদের পরিষদের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রথমে The Death Valley এবং TVA নামক দুইটি ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সমস্ত জিনিষ থাকা সত্ত্বেও নিয়মিতভাবে দেখান সম্ভব হইতেছে না, কেন না আমাদের বিভাগের বৈদ্যুতিক প্রবাহ এত দুর্বল যে উহাতে ছায়াচিত্র প্রদর্শন একেবারেই অসম্ভব। যতদিন না উহা ঠিক করা হয় ততদিন আমাদের এই সাধু উদ্দেশ্য সকল হইতেছে না। এই বিষয়ে আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

প্রণবকুমার গুপ্ত, সোহং ভট্টাচার্য্য, যুগ্ম সম্পাদক—ভূ-জ্ঞান পরিষদ

জিওলজিক্যাল ইন্‌ষ্টীট্যুট :

ভূবিদ্যার ছাত্রদের নিজস্ব এই প্রতিষ্ঠানটির পিছনে রয়েছে দীর্ঘকালের ঐতিহ্য।

আলোচনা সভা, বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের বক্তৃতা, শিক্ষামূলক চিত্র-প্রদর্শনী প্রভৃতি বিভিন্ন কার্য্যকলাপের মধ্য দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি ছাত্রদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে এবং তাদের উন্নত বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কাজে যথেষ্ট সহায়তা করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে বলে আশা করা যায়।

বর্তমান বৎসরে আমরা পাঁচটি অধিবেশন করতে পেরেছি—তার মধ্যে তিনটি বিশেষ ও দুটি সাধারণ অধিবেশন। একটি অধিবেশন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই অনুষ্ঠানটিতে আমরা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের ভূবিদ্‌দের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলাম। জার্ম্মানী, যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, বার্ম্মা ও আরও কয়েকটি দেশ থেকে বৈজ্ঞানিকরা এসেছিলেন জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার শতবার্ষিকী উপলক্ষে। সেই সময় তাঁরা ইন্‌ষ্টিট্যুটের পক্ষ থেকে নিমন্ত্রিত হন এবং তাঁদের সম্মানে একটি বিশেষ সভা আহ্বান করা হয়। এই অনুষ্ঠানটি ইন্‌ষ্টিট্যুটের ইতিহাসে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকবে।

আর একটী বিশেষ অধিবেশনে আমরা জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ ওয়েষ্টকে বিদায়-সম্বর্দ্ধনা জানাই। ডাঃ ওয়েষ্টের সাহায্য ও সহানুভূতি আমাদের ইন্‌ষ্টিট্যুট কোনও দিনই ভুলতে পারবে না।

ইন্‌ষ্টিট্যুটের একটী সাধারণ অধিবেশনে আমরা অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর "X-Ray Crystallography" সম্বন্ধে একটী মনোজ্ঞ আলোচনা শুনবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

অন্যান্য কার্য্যসূচীর মধ্যে আমাদের চিত্র-প্রদর্শনীর সংখ্যা এবার কিছু কম। আজ পর্য্যন্ত মাত্র তিনটী প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। আরো কয়েকটী হবে আশা করা যায়।

ইন্‌ষ্টিট্যুটের তরফ থেকে ছাত্রদের বেঙ্গল পটারী লিঃ এর কারখানা পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। শীঘ্রই আর একটী কারখানায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা আমরা করছি।

প্রকাশনা বিভাগ এ পর্য্যন্ত একটি বুলেটিন প্রকাশ করেছেন। সেটি সকলেরই প্রশংসা লাভ করতে পেরেছে। আরও একটী বুলেটিন যন্ত্রস্থ। আমারের পত্রিকা "ভূ-বিদ্যা" প্রকাশেরও আর দেরী নেই।

আজ পর্য্যন্ত আমরা যা করতে পেরেছি তার বিবরণী শেষ হলো। এ বৎসরের আরও কিছু কাজ বাকী আছে।

আমরা যা করব ভেবেছিলাম সব করতে পারিনি। আশা করি, ভবিষ্যতে ইন্‌ষ্টিট্যুটের কার্য্যসূচী আরও ব্যাপক হবে।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়—সম্পাদক

উদ্ভিদ-বিদ্যা-সমিতি

কয়েক বছরের বিরতির পর এ বছরে ডাঃ হীরালাল চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে উদ্ভিদ্-বিদ্যা-সমিতি পুনর্গঠিত হয়েছে। অধ্যাপক শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য্যের উৎসাহে সমিতি সাফল্যের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক আলোচনাদি চালিয়ে যাচ্ছে। সমিতি বাৎসরিক প্রদর্শনীর ও পরীক্ষার্থী চতুর্থ বার্ষিক ছাত্রদের সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করেছিল। উদ্ভিদ্-বিদ্যা সেমিনারের পক্ষ থেকে শ্রীপ্রদ্যোত ভঞ্জ সমিতির কার্য্যাবলীকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করেছিলেন। সমিতির বিভিন্ন অধিবেশনে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে আলোচনা হয়।

"Inheritance of acquired characters" —শ্রীযদুগোপাল ভাওয়াল

"Sex-determination"—শ্রীগোলোকনাথ ভট্টাচার্য্য

"New Genetics in U. S. S. R.—শ্রীদেবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

"Agronomical use of growth-regulating substances."—শ্রীঅমলকুমার মুখার্জ্জী

"Flora of Behala and Jadavpur"—শ্রীরবীন্দ্রকৃষ্ণ মুখার্জ্জী

দেবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, রবীন্দ্রকৃষ্ণ মুখার্জ্জী
যুগ্ম-সম্পাদক

ফিজিয়লজিক্যাল ইন্‌স্টিট্যুট

গত বছরে আমাদের প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়, মতামতের স্বাধীন বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে। নূতন গঠন-তন্ত্র অনুযায়ী শারীরবিজ্ঞানের সমস্ত ছাত্র, রিসার্চ্চ-ছাত্র এবং অধ্যাপকদের নিয়ে প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন হয়। গতবারে নির্ব্বাচিত সভাপতি ছিলেন ডক্টর সচ্চিদানন্দ বন্দোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি ডক্টর এন. সি. ঘোষ (রিসার্চ্চ ছাত্র), কোষাধ্যক্ষ ডক্টর ডি. পি. সাধু, সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুখময় লাহিড়ী এবং সহ-সম্পাদক শ্রীএইচ. দেবেন্দ্র সিং। সব ক্লাসের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে যে কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয় তাতে ছিলেন শ্রীশৈলেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৬ষ্ঠ বর্ষ) শ্রীবটকৃষ্ণ রায় (৫ম বর্ষ) শ্রীসুনীল পাইন (৪র্থ বর্ষ অনার্স) শ্রীদেবজ্যোতি দাস (৩য় বর্ষ অনার্স) শ্রীসুজয় গুপ্ত (৩য় বর্ষ পাশ) এবং শ্রীঅমিয় দত্ত (১ম বর্ষ)।

প্রবন্ধ পাঠ এবং আলোচনার জন্য কয়েকটি পাক্ষিক সভার আয়োজন করা হয়: (১) Use of Isotopes in Biochemical Investigation (শ্রীঅশোক দত্ত) (২) Immunity and Defence Mechanism of the Body (শ্রীচণ্ডীচরণ দেব) (৩) Our Bank of Energy (ডক্টর দুলাল সাধু) (৪) Parathyroid (শ্রীদেবজ্যোতি দাস) (৫) Physiology of Intelligence (শ্রীহরি চট্টোপাধ্যায়) (৬) Role of Vitamin C in Carbohydrate Metabolism (ডক্টর বন্দোপাধ্যায়)।

ইউ. এস. আই. এস. এবং বি. আই. এস.-এর সৌজন্যে নিম্নলিখিত ছায়াচিত্রগুলি দেখাবার ব্যবস্থা হয়: (১) The Human Body (২) Heart and Circulation (৩) Blood Tranfusion (৪) New Frontiers in Medicine (৫) Modern Surgery (৬) Prevention of Diseases (৭) Snowdonia (৮) The Gift of the Green (৯) Physiological Excursion at the Indian Veterenary Research Institute, Izzatnagar (১০) NCC Tour.

গত ফেব্রুয়ারি মাসে শারীরবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন ও বর্ত্তমান ছাত্ররা একটি পুনর্মিলন সভায় একত্র হন, প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসুর সভাপতিত্বে এবং অধ্যাপক এন, সি, ভট্টাচার্য্যকে প্রধান অতিথিরূপে নিয়ে। সভার শেষে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা।

লক্ষ্ণৌ-এর Central Drug Reaserch Instituteএর ডিরেক্টর পদপ্রাপ্তি উপলক্ষে খ্যাতনামা ফিজিয়লজিস্ট,

ডক্টর বি, মুখোপাধ্যায় ডি, এস, সি-কে একটি সভায় সম্বর্দ্ধনা জানাই আমরা। সেদিন ডক্টর বি, গুহ, ডি. এস্ সি., বিজ্ঞানের নবীন ছাত্রদের সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতায় আমাদের উৎসাহিত করেন।

সর্ব্বশেষে, বিদায়ী ৪র্থ বর্ষকে বিদায়-সম্ভাষণ জানানো হয় একটি সভাতে। বিচ্ছেদের সুরও সেদিনকার অনুষ্ঠানটিকে ম্লান করে দিতে পারেনি। সভার শেষে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল।

নানাবিধ কাজের পরিকল্পনা ছাড়াও, আমাদের প্রতিষ্ঠানটির এক বছরের জীবনেই পারস্পরিক সাহায্যের এমন সুন্দর আবহাওয়া গড়ে উঠেছে, যে, প্রতিষ্ঠানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশের কোন কারণ নেই। এবার থেকে আমরা একটি সাময়িক বুলেটিন প্রকাশ করতে পারব বলে আশা করি। ১৯৫১ সালের জন্য বাৎসরিক ভ্রমণের ব্যবস্থা শারদীয় অবকাশের প্রথম দিকে করা হবে।

এইচ. দেবেন্দ্র সিং—সহকারী সম্পাদক

THE PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

Notes and News

A little less than forty years ago, the Presidency College Magazine used to be a slender, if ambitious, volume, its green cover carrying what sympathetic eyes readily recognized as a sketch of the main College building—complete with clock and avenue of trees along the front. Since then the Magazine has gone through a long and interestering career, including a period of total breakdown, its silent tribute to the war. This session, for the first time in the post-war, there will be two numbers. For those who are to sponsor the change, the privilege carries some nervous strain along with the undoubted pleasure. It would be pointless to apologize profusely for our all-too obvious shortcomings ; they will not be overlooked in the kind but critical scrutiny we expect from all our friends. We would like only to stress the fact that the Magazine, essentially, is what our boys and girls make it. Its quality faithfully reflects the sharps and flats of their thought—and the degree of their response to editorial persecution.

For those in their final year, the famous 'Presidency College tradition' and way of life is becoming resolved into the hundred little things that made these years some of their happiest. It is pleasant to greet all the fresh students ; they bring one to a sense of the change and continuity that is, essentially, an institution like ours. One does not doubt that the little details of a daily life shared by so many, the hours of friendship, will live fresh and green in the memory when bigger events have faded.

* * * *

For years past, ex-students have felt the need of an association to link them with each other, and the College. The attempts made in the past all failed. We are glad to note that the Alumni Association founded in January 1950 promises to be more stable, because it is better organised ; and so, passing out of the College, we need not break with it for good.

* * * *

It is the fashion to mention our outstanding problems (regarding accommodation, Science classes, short library hours etc.) in every number

of the Magazine. If all the editors who have already cried themselves hoarse over these points could be brought together, the queue would stretch from here to Harrison Road. We prefer to join the frustrated company in silence.

* * * *

This year the 120th death anniversary of Henry Derozio was commemorated by some Calcutta organisations. The country must not forget this talented poet and educationist, rightly called the first Anglo-Indian patriot. Born in 1809, and educated only in a private school, Derozio became Assistant Master in the Hindu College. Here he found congenial work, discussing with his students beyond class hours and guiding them towards real independence of thought. At the same time he was the life and soul of the Academic Association which he founded. His fame as a poet was already established. Students of the Presidency College will be specially interested in his 'Sonnet to the Pupils of Hindu College', beginning :

"Expanding like the petals of young flowers
I watch the gentle opening of your minds
And the sweet loosening of the chain that binds
Your intellectual energies and powers . . . ."

In the end, his clash with the hidebound College management led to his resignation. He died of cholera in December 1831 and lies buried in the North Park Street Cemetery of Calcutta. Few seem to remember Derozio today, but the future will pay its tribute to this man of versatile talent who was a teacher in the real sense, whose stirring verse saluted the dormant might of India and who found "something dear" in Freedom's very name.

* * * *

The necessity of an overhaul of our University is too well realised by the public to need further comment. The recent University Act, the first of its kind in a half-century, takes a step in this direction. The text of the Act is regrettably vague, and so far very little seems to be known about the whole thing. This naturally arouses strong misgivings, especially in the light of previous history. Let us hope our fears will be falsified, for this opportunity of the long overdue reform is too great to be missed.

Recently there has been some talk of introducing Post-Graduate teaching in the Presidency College. This is a cause for which Principal James fought and undoubtedly if there is to be any constituent college, ours should have the privilege. This is specially true because it is part of the educational policy that the College staff should be kept at its present high level both numerically and qualitatively, so

that some of the Presidency College professors may act as honorary part-time lecturers in the University. Thus, automatically, our College has its share in turning out the post-graduates. What we miss and demand are M.A. classes—Science classes are already held here. It is no more than in the fitness of things that the institution which stands first in the province as regards Honours teaching should take up the work of preparing our students for the highest and most important degree examination. Would this change mean giving up Intermediate classes in our College? Although they are relatively less important, and our speciality lies really in our Honours teaching and results, it would be unfortunate if the Intermediate classes were to be excluded altogether from the Presidency College. Even as we express these hopes and doubts, however, we are overtaken by a sense of the extreme lack of clarity and enthusiasm in the circles concerned,—which makes one wonder if the whole scheme will ever descend to earth from the airy nothing where it is being hatched.

The new Secondary Education scheme aims at a planned education system based on the grouping of students into different batches at the upper or middle school stage. After their school finals, one of these groups will take up college studies, another vocational training and so on. The school finals curriculum includes compulsory subjects a knowledge of which is, on the whole, necessary—English, the Vernacular, Sanskrit, Mathematics, Science, History and Geography. The point however is that a school-boy's future is decided, by drafting him into one of these groups, when he is too young to decide his vocation in life for himself. The automatic decision may ensure an orderly system of education but seems rather hard on the poor individuals who do not have the option to alter their settled future. If some provision for this could be introduced, the system is likely to prove a success. It could be argued of course that many people would thus be deprived of the general liberal education we all acquire at present, but it would also mean a higher degree of technical and other training for those who have the aptitude—if only the scheme would base itself on individual aptitude and desire rather than arbitrary decision from above.

* * * *

As we get ready for the press, the country is preparing for the polls. It is a momentous thing, this first General Election of our Republic, scheduled to lead us out of the heaven knows how many 'long winters of our discontent'. The basic problems of constructing a free and happy life out of what has been for so long such a classic instance of a colonial society, will be difficult to solve within the limited framework of a parliamentary democracy which is, moreover, not an organic growth in our country, but a mere graft. Elections, however, are good things ; at the very least they dispel many doubts and illusions and sharpen the

edge of the major issues. The situation does not call for platitudes ; let us wait and watch.

* * * *

One of the most disquieting things about the Indian situation is the mounting Indo-Pakistan tension. For two states which are linked by such strong material and sentimental ties, and which must live as neighbours, it would be criminal folly to indulge in mutual suspicion and hostility. Friendly talks at Governmental level and cordial relations between the two peoples are imperative today as never before. As for Kashmir, the bone of contention, the obvious solution is to let the Kashmiris decide their own fate without any external interference. Neither over Kashmir nor anything else can our two States afford to brandish swords at each other.

* * * *

Kipling, when he wrote about the dawn coming up like thunder out of China, little anticipated the greatest sensation of our mid-century politics. The Chinese Peoples' Political Consultative Conference, which met in September 1949 and created the Peoples' Republic of China, did not merely disentangle at one blow the thirty-year old Chinese Puzzle of military and political manoeuvring. It introduced a major shift in the existing balance of world forces. Whether the dawn contains more light than thunderclaps is still a matter for controversy in some quarters. What nobody doubts is the significance of the *Common Programme* of the PPCC, and its implementation. The immediate tasks are described to be the 'abolition of feudalism' and the 'liquidation of the counter-revolution'. Land reform has been completed in the North and North-East and is to be extended to the rest of the country on the basis of the confiscation of feudal and public estates, not touching at the moment the smaller landlords and the rich peasantry. This has converted China's notorious seats of famine into surplus areas, incidentally benefiting India to the amount of 200,000 tons of rice. Great stress is laid on fast and efficient industrialisation, with the working class organizing itself into giant 'patriotic emulation drives'. The Sino-Soviet Treaty of Friendship, Alliance and Mutual Assistance (February 1950), acclaimed on its anniversary by the press in both countries, would seem to dispel all hopes or anxieties, as the case may be, of Titoism in the East. The Sino-Tibetan Agreement of May 1951 receives Tibet back into the "big family of the Motherland", and is drawn up on the lines of regional autonomy and common defence. Most significant—because actions speak louder than words—is the Chinese volunteer brigades' unflinching watch on the Yalu, with the slogan of 'Koreans to decide their own future'. Undoubtedly, the 'open door' is closed for good, and China's defection from the imperialist camp is world-shaking in all senses.

Does the flaming parallel blue-print a third world war? The course of the Korean war itself is encouraging in the sense that it indicates a reluctance on both sides to take any decisive step that might cause a general conflagration. Thus MacArthur is recalled, and negotiations opened at Kaesong. And if Ridgway goes out, and the talks break down, and PTI-Reuter reports Air Force HQ in Washington as despatching an 'electronic computer' to guide bombers to their target—even so, it is still a ding-dong struggle, and strictly localized. However, the basic hostilities that have shaped the situation are forcing up the war of nerves. The crisis has brought forth its own would-be destroyer—peace-mindedness. The North Atlantic group is busy with a project which, as it might claim, is to be Pacific in both senses, "strengthening the fabric of peace in the whole Pacific Ocean area" (President Truman on April 18). Besides the triple agreement between the U.S.A., Australia and New Zealand, there is the Japanese draft treaty. This excludes China despite Art. 18 by which states at war with or in a state of belligerency to Japan are to become signatories. Also, the Potsdam Declaration of 1943 is violated here in the sense that the demilitarisation of Japan is nowhere specifically mentioned and "the inherent right of individual or collective self-defence" is unduly stressed. If the *Nippon Keizai,* organ of Japan's businessmen, is correct in reporting the Dulles-Yoshida talks as having reached the principle that following the peace treaty, "Japan's economy would be turned into an anti-Communist arsenal in Asia", it is an evil portent for the possibility of the peaceful coexistence of the two orders. Meanwhile, it is hardly a contribution to world peace to encourage revanchism in Bonn by sanctioning a programme for remilitarising Western Germany.

The Eastern bloc chooses to emphasise the possibility of peaceful coexistence, taking its own peculiar approach to the problem—that of mass rallies, national and international, campaigns for a Pact of Peace (Berlin Resolution of the World Peace Council), legislation banning war propaganda in all the East-European countries, Peace prizes, flags and Festivals (strictly disapproved by the police in Belgium and France!)

Thus today, if Picasso's dove has one end of the olive branch firmly in its beak, the American eagle clings equally grimly to the other, so that the initiative does not lie wholly with one party. Whether the result is to be co-ordination, or a tug-of-war that will snap the branch in two, depends largely on the peoples of the world.

While Memory Serves

ASOK MITRA—*Ex-Student*

WHILE memory serves, long after other things are forgotten, surprises, excitements and wonders, the beauty of the land, the miracle of flowers, alpine meadows and the yawning chasms in the glacier seracs, I shall cherish, so I thought and still do as the thrill comes back again and again, the Sundays spent in Nishtatbag and Shalimar. A very discerning emperor had built these marvellous formal gardens for his pleasure, who hated the sun, the dust and parching of Delhi, to whom, as to his great-grand-father who had come from afar north and founded an empire, the monsoon was the only welcome season. Laid out in terraces, with banks of the most exquisite flowers, in the murmur of icecold water in the fountains and in the coolth of noble patrician chinars he had made them for himself where even the grand noble was shut out. But now in spite of three centuries on their back, the gardens, ageless in splendour, miraculously well preserved by a people who breathe and live in beauty give themselves up every Sunday, while the water is turned on in a cool warble and fountains play, not to a lone listless monarch but to a thousand suitors all at once, men, women and children, babes in arms, the humblest of the humble, artisans, peasants, tradesmen and soldiers turned out in their best to spend a weekly holiday.

We had arrived the day before,—the day having proved cloudless the plane had not turned back from Banihal, a pass which is but a saddle nine thousand feet high between two humps, fourteen thousand high and eight miles apart—our nerves aching with joy at our first experience of a valley clear and emerald green under thin sheets of water, crisscrossed with straight roads lined with chinar and willow, rice fields mottled with poppy and cornflower. Friends suggested a visit to the gardens and off we started in Shikaras at ten in the morning, the good boatmen having care to load the boat with hampers of food. Crossing Nagin, through the arch of the stone bridge, into the vast expanse of the Dal, there all around us, was laid out an armada of all shapes and sizes, the water thick with boats, sounds of music, pianola, bargain in counters of boat shops, gurgle of pipes, laughter of children.

Boats draped in carpets, Shikaras with American names, kitchen hulks, punters, cockleshells, canoes, full, chockful with men and women, in robes and rags, brocade and finery, pheron and sackcloth, and the dimpled children, applecheeked babes at their mothers' breasts, the

fathers, lazy and remote, puffing away at pipes, reclining on bolsters. School parties in ungainly boats, in charge of schoolmasters poorer than our own, looking both kindly, knowledgeable and poisonous, beat the air with howls and broke the stillness of the lake and the mountains in a thousand fragments. And rowing faster and faster as the gardens approached, suavely, dipping flags as it were in courtliness to give way at Nishat because the steps here are wide and the landing place enormous ; doggedly, meanly, nudging, hitting each other up the mile-long drain that leads to Shalimar, trying to reach out as near the gardens as possible because the way back can be darned exhausting if on foot and the sun shines hot, the boats unloaded and the gardens were filled up with picnickers, men in pherons, women in burkhas which were nowhere on their person but hung by a string, children with pattering feet, mindful of the grass which they kept off, wading through water which stung with its chill yet caressed slim ankles, instinctively appreciative of flowers and grateful for the shade which the mighty chinars yielded. Then were laid on the grass worn-out gubbas and precious ones, bodies in expensive clothes as well as those whose stench and filthiness are relieved by ventilating tears that poverty bestows, sumptuous meals and modest snacks. And all around were chased and bidri-work silver-and-zinc teapots—kettles, properly, because under the lid is always a pot of redhot charcoal that keeps the tea on the boil, makes it dark and thick as resin-like metal crocuses on the green grass. There was no milk or sugar of course with the tea, because sugar is too much of a luxury, salt serving just as well or better perhaps what with the exhaustion of the rowing, and the food was pepper-and-ginger bun, usually two for a portion.

This finished, the chief idea of fun was snoozling in the sun, while children's feet, pretty, restless, made circles on the grass and in the cherry trees. A day well spent topped off at five with another round of tea, bun and biscuit, and way home at a leisurely pace at seven with an hour of light in hand before turning in.

To one *arriving from Calcutta—to one* from Delhi, Amritsar or Lahore this will not strike as forcefully, so I am told—why, this was a proper Mid-summer Night's Dream.

'Khuda Kasm Saab, my land is stolen, it's gone, it was right here under your window last night if you will remember, Khuda Kasm'.

Drat the man, you don't like being rudely shaken up from sweet dreams by the slobberings of a forty-year old with a patriarchal beard on a face like a big ham. And what can the matter be? Surely he is crazy to wail after stolen land, and how can land be stolen? You shudder at the thought that Kashmiris think that Bengalis with their long and sharp tongues are quite effective with the Kashmir State police, are almost afraid of being pressed into service in quest of stolen land, and peer cautiously out. Yes, the land, firm and safe as houses the night

before if you please, is gone, leaving a sheet of serene and crystal clear water in its place. True enough.

From the first peep of dawn to well beyond darkfall one can see on the canals, the baghs and the Dal, even in the middle of the mighty Wular, which is fourteen miles across, long rude, wide, flatbottomed boats, each operating as it were in an understood, undemarcated Kingdom, with two persons on board, one a child at the helm with his pet shaggy mongrel, the other, huge, hirsute, with green seaweed clinging to his person, like one of Neptune's slaves, prodding a long puntpole into the water and churning the bed in slow wheeling circles. The water, a crystal pool, in which weeds grow and stand still, flower like anemones, in which you can see a book go down with its leaves fluttering in a flash of white light, turning into slate, and then deeper down into green, then bluish-grey, and finally settled in bottlegreen-black, is churned with a long pole and the bed yields streaks of water weed, creeper, leaf and mud slowly emerging round the lengthening pole, a mass of green, yellowish, mossy vegetation with many binding branches. Layer upon layer of the stuff is deposited on the punt, which smells of sea-weed, iodine and dung and is so loaded that it nearly sinks and this goes on throughout the day.

This salvage is next laid out on a strong bed of interwined branches of willow, tall wicker, grass and birch plastered up with mud and turf. It makes a patch of floating land and soon the rotting water-weed, having rotted, with the water underneath, yields excellent humus and small mounds of watermelons, each plant proudly settled on its raised mud fort, peer out, sprawl quickly along and conquer the plot. Tenacious roots of surviving water plants dart downwards again, strike the earth and firmly engage floating land. Currents wash in refuse little by little, should floating land be quite close to solid earth and fill in the water spaces, and in the course of time, look, you are richer, you have so much more land out of water ; you have extended your domain.

And if the other guy is cute enough he can, before the land sets, walk stealthily in the night and cut the earth from under your feet when you are resting them on a bed as you always seem to do in Kashmir—for to a man from Calcutta, you with your nimble and deft wizard's fingers and the Lord's eye for creating colour and harmony, you are almost a lazybones—and then in the morning air, wafting in the smell of snow, mountain and Primula, you find it mighty fun to wake me up with Khuda Kasm.

Lazybones, indeed, your foot, sir, never was calumny so wholly undeserved so wrongly fastened on people who toil thirty hours in twentyfour and are yet the world's master craftsmen.

They get up before it is dusk in the artisan quarters, in the Third and the Fourth Bridge, at Rajori Kadal where houses stand four storeys

high, windowless, cheek by jowl with hives of work groups humming all day, long and deep into the night. The womenfolk who weave the most charming silk, and lace, embroidered skirt and scarf that adorn the most expensive women and homes throughout the world, wear one long loose gown reaching down to their ankles and pyjamas. The most opulent wear a pashmina wrapper. For protection against the cold and winter they have the fire basket, like a swaying censer with a handle, an earthenware pot reinforced and laced in woven wicker, in which redhot charcoal glows. This tucked inside the cavernous gown or pheron, placed in the pit of the stomach, leaves a burnt black patch in the chests of men and women owing to continued contact. Before it gets light, the women take cover of the darkness, shed their clothes and bathe in the river, to get back into selfsame clothes, and the nymphs—peerless beauties in the world—are back to their kitchen, brewing early morning tea for their men, long long before the indefatigable American with his extremely powerful camera catches the minimum of light in its lenses to get at them, a daily early morning disappointment among those burly tourists whose wails you can hear on the lawn at tea at Nedoy's.

And thus the day begins, long before it is day, and craftsmen feel the grain of the wood they carve with their fingers before taking up the soft chisel. Breakfast in these homes is over by 5-30 and the men are at work, the women, having tended or nearly finished tending their innumerable young, are either at the spinning wheel, spinning out silk or gossamer wool or at the frame tracing out embroidery.

They toil far into the night, the men earning about eight annas a day and the women five annas for all the marvellous work they produce for the wonder of man.

This is how it works out.

Kasem who keeps a marvellous papier mache shop over the sluice at the Dal Gate sold me a biscuit box, a cylindrical thing, nine inches high and six across, lined inside with brass and made airtight. On the surface glowed magnificent chinars and oaks in gold and green, and bulbuls, parrots, kingfishers, woodpeckers, macaws hopped among glowing branches pecking at red ripe berries of paradise. It looked like most precious enamel work, satisfaction guaranteed, your money back, if it tarnished or lost its brightness so long as you lived. The price, I was aghast, was twelve rupees.

So I bought another, a smaller and much cheaper one—but its equivalent satisfaction guaranteed, money back this side of the grave and so on,—and took it home with the zeal of the Bengali when he wishes to prove that the other man is a fraud and set to work with knife, blade and awl. The awl wouldn't pierce the papier mache except when driven in with a hammer, the blade refused to scrape and bits of yellow foil

which the knife separated would not tarnish in lame water or diluted acid. It was gold. I felt cheated by a man whom I had tried to prove a cheat.

So I went back the next day much, much crestfallen, and begged of Kasim to tell me how he could manage such a good thing with material that couldn't have cost much, that couldn't obviously take more than a day's wage and labour to sell so cheap.

I nearly jumped out of my skin when Kasim turned round on me and with the pity that suffers ignorance said that my biscuit box had taken a fortnight to make, been through a dozen or more hands of skill, cost a good nine rupees in labour and material. Obviously, money was scarce.

And with the kindliness and pride that a man takes in showing one round his work-benches Kasim asked us to his house on a Wednesday when he would have all his craftsmen foregathered. For it is the rule of work in Kashmir that a thing is done in bits, stage by stage and is transported at each stage from one home to another to be finally deposited in the windows of the man who clips the profits.

On Wednesday, then, we went along, Amdoo the Shikara rower punting on at a very fast pace shouting in a singsong, very gentle voice a string of ejaculations he had picked up from revelling Americans "Whisky! Limbupani! Nei mangta! Cigarettes! Matches! Mangta! Bara baksheesh! Mangta! Chhotabaksheesh! Nei mangta! General Ko! Colonel Ko! Major Ko! Captain Ko! Hurra! Sabash!"

Arrived at Kasim's house, the field in front strewn with graves—there aren't three acres of city or village in this land without one acre being turned over to a cemetery—, past a few noble chinars, we spied a big American furiously clicking his cameras, a reflex, a miniature, a movie, all at once at every earthly object round him. He was afraid, so he said, to let anything slip past him, and trusted the safekeeping of experience more to his camera than to his eye. The mind he had no use for: Hearst and McCormick were looking after it all right.

In the big hall were ranged about thirty artisans. Kasim explained as we moved from one to the other. Rags and cloth of a certain texture and coarseness are bought, boiled and washed clean. They are put in a giant mortar and pounded for days till they turn into even pulp with all lumps pestled out. The pulp is boiled in water again, made into a thick glue. It is ready to be cast. The mould is then taken and very evenly wrapped round with small strips of gummed paper and the pulp spread evenly over to the thickness of three-fourths of an inch. Deft fingers tap away, the middle finger mounted on and tapping on the ring finger which taps on the pulp. When the surface is even it is put out in the sun to dry for two days, while boys with little matters tap away

at the pulp continually so that the thickness of three-fourths of an inch is compressed into an eighth. It is brought to the cutter who cuts the cast in two even halves and as he cuts, with weird and sure skill, he cuts the underside a little more deep, so that as the two halves fall apart, an inside rim is left in one to take on the lid of the other. The inside is scraped with shaving blade ; the outer surface is first rubbed with emery paper, then scraped with blade as carefully as one would shave an infant's head. Thin small strips of tissue paper are then gummed on the surface and scraped off again to remove all unevenness. Thin small strips of cloth are glued which is then treated with lime and glue that give it a white smooth surface. Then the outside receives a coat of a special kind of glue ; it smells badly and attracts flies but now is ready for the finer work.

The base colour is laid on and the piece goes to the master artist who on each article traces an original design in full detail which wells up from the caverns of his mind.

Mir Aziz Sahib, the master craftsman, is very fair, tall and portly with a chiselled Aryan face. He wears a big white turban and white robes, his arms and hands are long and move very widely and freely. His fingers, gnarled with grief and fortyeight years, are long and soft and the tips are soft as butter. Married at twentysix, he was blessed with a son at twentyseven. The son died at the age of eighteen, and Mir Sahib retired into mourning for two days and nights. He came back to work on the third day but his head swings sideways like a pendulum on his shoulders ever since. He seldom talks, and when he does he speaks under his breath. He is remote, drawn, into himself, but not scornful. He started work on the white surface.

In a few minutes' time the little box was full of the most delicate tracery, golden boughs, gnarled boles of chinar, leaves, a hundred birds happily pecking away at fruit, their warble almost audible. Then he put on the gold leaf.

Half an ounce of gold is beaten into sixtyfour or sixtyeight leaves and preserved in books of tissue paper. With his ring finger Mir Sahib picks up a gold leaf and tap, tap, taps away middle finger on ring finger, ring finger on papier mache and fixes the gold leaf on the outlines, drawing off the surplus. It takes him quite an hour to do the small box and at the end he approves and turns it over silently to the next man who hungrily sets to work with small pots of paint and a saucer. The paints are all made at home and reminds one of Jamini Roy's pots. He paints for full two hours with brushes of the hair of cat's tail and finally puts the box out to dry.

When it is thoroughly dried a thin transparent varnish of spirit and the merest resin is put on in three coats and, when dry, polished off with chamois leather.

Yes, indeed, Kasim was perfectly truthful about time, material and labour, but having gone thus far he was at a loss to figure out how he could sell his box at six rupees and yet pay his workers from two to six rupees a day.

He didn't. He paid a maximum of eight annas to men and five annas to women, while the master craftsman he kept neatly tied up in blandishments, tobacco and a tidy packet of debts and advances which he, the master, didn't know how to reckon and get out of.

This applies to people who make shawls. Wool is imported from Ladakh, from Kashgar, from Chinese Turkestan, Yarkand. Laden on mules, the uncarded, unwashed, unbleached wool travells hundreds of miles of difficult, precipitous, perilous track escorted by people tough as Tibetan mulatteers whom you can see in Kalimpong and arrives at a settlement beyond which these 'dangerous roughs' are not allowed into Kashmir. With them come portly merchants in heavy rustling silk robes and embroidered skull caps with the rosary of Allah or the Prayer Wheel of Buddha. They bargain hard but since it is ruinous to turn back, and there is little trade in forwards, the Kashmiri has the upper hand, for the man from the north and east must sell, and the Kashmiri is not so sure that he ought to oblige him by buying. Heaps of finished goods in warehouses, the market dull, another turmoil in sight. Some more of this twaddle and a general panic descends. Merchants sell in a hurry and merchants buy in leisure. All must live, seeing that a shawl which takes two years to make sells for only fifteen hundred rupees.

The wool brought home is carefully washed and carded. Washing and carding take many days. It is then made into small wads and given over to women who card it on combs of various grades of teeth from the very wide and coarse to a fraction of a millimeter. The staples of wool are then dyed and graded and put away, each for a particular use. Then comes the spinning wheel.

Wads of a particular staple are given to one woman who rocks her spinning wheel and produces thread of a uniform denier. The thread is turned over to the weaver who weaves it on a handloom. The work, from the buying of the wool to the weaving of the shawl, takes about six months, the coarser varieties taking less.

The master of the house examines each piece of woven material and he and the master craftsman decide upon the design and colour scheme of embroidery.

Embroiderers are set to work. Young children or adolescents make the best embroiderers; they are comparatively cheap, they have nimble, swift, skilful fingers, they have young, keen eyes and once the restlessness of their spirit is broken in, they continue happily for fifteen years. Then they are at liberty to go blind, bent double through sitting on their legs and haunches for fourteen hours in the day. They can be

discarded as broken fragments of human bodies to drag out their existence as beggars, loafers and cheats. Life and Art chew them up very small and finally spew them.

And so with the embroiderers on cloth, the delicate craftsmen who borrow from and then defy Paris and Mulhouse, with woodcarvers who hold their own against anybody in the world, the silversmiths with their famous filligree and chased silver work, the workers on precious stones, the carpet-makers. All, all of a piece, people who start work from well before sunrise and finish late into the night, who go blind before they are forty, bent double with sitting on their shins and haunches, bowed down with tuberculosis and syphilis,—a scourge left behind by rapacious foreigners who lust and hunt for beauty in darkness—undernourishment and lack of medical care, who earn eight annas a day while the going is good, but whose lust for life and beauty drive them to the Mughal gardens every Sunday to spend their week's savings on an afternoon's rest and boating.

The emblems of the land are touchingly simple ; the shikara which is the main transport, the heartshaped oar which is the propelling force, the tope or cap which six annas will buy, the pheron which is a toga of simple stitches, the kangri or fire basket which burns as it preserves.

Can Intelligent Students Today Afford to be Good Students ?

—Three Opinions

[The above was the topic of a debate held some time ago. The opinions given below tell us what present students think about the matter.—*Ed.*]

I

Education, in the very general sense, means only certain instructions directed mainly to the training of men and women for certain professions. But education is also the disinterested pursuit of learning, education of the soul. Students who may be termed bookworms are concerned only with books. But though we may spend our young days filling notebooks with definitions of Religion, Politics, Art, etc., yet, in the end, as Emerson points out, our tables are incomplete and our curve a parabola whose arcs will never meet.

The intelligent students take the second view of education : experience gained from contact with the world, its men and sights, is itself a great book. The intelligent student acquires his knowledge spontaneously and can grasp the totality instead of only a single aspect of the truth.

In this mechanical world we attach more importance to the minor than the major values of life. Our principle should be to adjust minor values, keeping the major values fixed. If books are read not from the utilitarian standpoint but for acquiring knowledge of the world, they will take us to "unaccountable and unforgettable moments which raise the soul of enjoyment to strangely higher powers of itself ; moments when the intervening darkness thins and we can see into the heart of life." Our so-called 'good' students, to be happy, must be intelligent too.

ASOKE RAY
Sixth Year Arts.

II

An intelligent definition of 'intelligence' is hard to get at. Everybody knows that he is nobody's fool. On the other hand most of us love to imagine ourselves as intellectuals. But intelligence is no mere absence of foolishness. And as to intellectuals, whenever the occasion permits,

we airily dismiss the recognised ones as mere fools. It happens. It is the reality. Intelligence, it seems, is an understanding of this reality, a quick power to grasp its causal connection. Nobody would admit that he is not intelligent. Few would care now-a-days to be called an idealist.

So we, intelligent people, all deal with reality. And what, now-a-days, is the reality as regards our system of education? You cram successfully and you are a professor or an administrator. You cram with less success and you are a mere clerk. A good student, that is, one who takes an interest in his studies, cannot escape either of these two. But being a good student, he spends his student life absorbed in his studies. So he gets no chance of getting at the realities of things. He grows up, may be an intellectual, may be a book worm. But never an intelligent man.

So we, of the intelligentsia, are never good students. Times are difficult. Try to keep in touch with things and you are out of touch with your studies. So that is the trouble with us, intelligent people; we are so busy being intelligent that we have not the time to be good students. For how, we may well ask, can one be both intelligent and a good student at the same time? Where is the time?

ASIHN DAS GUPTA
Fourth Year Arts.

III

We are living in the middle of the twentieth century at a time when the world is passing through a crisis. This crisis manifests itself in the form of World Wars, economic chaos, and various restrictions on the life of the individual—restrictions which were unthinkable even in the recent past. Before our own eyes we have seen the devastating effects of modern warfare, the monstrous exploitation of people, by alien rulers, the evil results of racial discrimination, and last, but not least, the abysmal gap between rich and poor.

In such a situation the intelligent and imaginative young man cannot but ask himself the question why this is so, and in raising these problems and trying to find out the answers to them he cannot help being deflected from the secluded life of a disinterested scholar—aloof and remote from all directions. But the conventional idea of a good student is that he should not concern himself with problems that are outside the syllabus prescribed by his tutors (a syllabus that is often antiquated and sometimes reactionary) and never ask embarrassing, impertinent questions that may threaten the basis of the status-quo. Politics, above everything, is marked taboo.

For the intelligent youth of today, therefore, this ideal of being a good student is not attractive. His life is intimately bound up with the changing world around him and neutrality in the face of the great ideological clashes of today cannot be imagined. He knows that

". . . . . only ghosts can live
Between two fires."*

PARTHASARATHI GUPTA
Third Year Arts.

The Future of Poetry

SANATKUMAR BHATTACHARYA—*Sixth Year English*

WE live in an age of transition. The civilisation of the last four centuries was the product of European Renaissance. The two world wars brought a tragic end to that renaissance civilisation. The age of renaissance is dead, we cannot return to it. Is this the beginning of another dark age or a greater renaissance? We don't know, we are standing, in Arnold's words, "between two worlds: one dead, the other powerless to be born."

At this time of juncture the future of poetry has become a grave concern to all poets and poetry-lovers. Poetry today is little read and less appreciated. The future is difficult to predict, it lies in the lap of the whimsical fates. We cannot however evade the issue by answering: "after me the deluge", nor can we assure ourselves by saying of poetry, what Croce said of liberty, that it is eternal. There must be some definite reasons why we believe that poetry forms a necessary part of human life; and yet in the present times life seems to be barren of all poetry. The situation of the poet has never been so paradoxical. On the credit side, vast possibilities. On the debit side, only this: poetry is dying.

Let us take stock of the situation in this year of grace 1951. Poetry today is characterised by its poverty. Since the Second World War there has been very little development in English poetry. Poets who seemed full of possibilities some ten or fifteen years ago have failed us: Auden, Spender. In Bengal some poets actually stopped writing poetry: Sudhindranath, Subhas. Why is this so? What has brought about this

* C. Day Lewis,

state of affairs? We have the right to ask such questions, and to answer them we will have to consider the environment in which the contemporary poet works. A young man who writes tolerably good poetry has to face generally two classes of people: the one, his admirers, who believe that the composition of poetry is a superhuman task; the other, who view the poet with contempt, consider poetry at best to be a supreme luxury. Both these classes do not realise the *social value* of the poet. The poet soon feels that nobody wants him, and this brings about the untimely end of his career at thirty-five, while at twenty-five he was considered a prodigy.

Nothing could be more tragic than this conflict between the poet and his readers. Saint-Exupéry once remarked in the course of a dangerous mission: "I am my own witness." The same for all poets; anguish and forlornness and the sweating of blood begin for a man when he can no longer have any other witness than himself. Sartre in *What is Literature*? goes so far as to suggest the use of 'mass media' like the newspaper, the radio and the cinema to incorporate some potential readers of literature into actual public. The poet of the present age has two alternative courses of action: he can write cheap exciting poetry to work upon the nerves in a similar manner as the radio or the cinema, or he may withdraw into a world of his own where the voices of the mechanical tempters cannot be heard.

The hope of fame in the future seldom appeals to a poet. The attitude is: "How do we know what posterity will be like? They may be awful people." There is no certainty that what is ignored in the present age will be appreciated in the distant future. All great writers including Shakespeare were to some extent 'topical'. Moreover, there is a tyranny of fashion in the realm of literature. The share market fluctuates every twenty years or so. Today Byron is the rage, twenty years later it may be Shelley. The poet cannot depend on the future.

The poet's conflict with the world has a reaction in his poetry; and reaction in itself is negative. It can only breed escapism, indignation, and despair, Eliot's wasteland and hollowmen . Technically this type of poetry reaches unprecedented competence; but it draws apart from the world of reality. It is a tendency to concentrate on the little at the expense of the great. Poetry moves away from concrete living by the development of its technique. It is as if poetry has been labelled "only for the experts". Such a tendency is to be regretted, because the world of poetry has in no sense any different reality from the rest of the world. The poet, besides being a poet, is also a man, fed with the same food, hurt with the same weapons as other men. Where there is hope in the air he will hear it; where there is agony about he will feel it.

The alternative path open to the contemporary poet is to become a propagandist. Regarding this, all one can say is that propaganda verse is to be condemned when the didactic is sought at the expense of the

poetic: poetry, whatever else it may or may not be, must be poetry—a sound, if not obvious, conclusion. The poet today is therefore standing between two fires.

This is the present condition. What would the future be like? The future is doomed unless there are certain revolutionary changes in the relation between the poet and the society of which he forms a part. Poetry must spring from the very foundations of life. In ages gone by poetry played quite an important rôle in society. Primitive man gave expression to all his deepest emotions in song, dance, and poetry. Their worship and their war gave birth to poetry. Bards roamed from place to place. Improvisation was as natural as talking—they lisped in numbers. This way of life is not desirable, but the poetry of tomorrow should be linked with life in the manner it was in primitive society.

For the poet a favourable social atmosphere is a necessity. Somerset Maugham has suggested somewhere that writing should be a whole-time job. This indicates the seriousness of a poet's task. Writing poetry is to be an occupation, not a hobby, for it is as difficult a work as running a government or expanding business. But at present no government in the world thinks of spending a fraction of its revenue to encourage arts including poetry. True, Great Britain has organised the British Council, but the exception proves the rule. The value of poetry will be realised in only a new and a completely different social order. In that social structure, writing poetry will be considered cent-per-cent productive. The poet will have the right to live decently because he writes poetry. The reader will consider poetry to be a necessity, he will demand good poetry.

It was never so necessary as now that we should know the proper value of arts including poetry and avoid inadequate answers. It will probably become increasingly more important in the future. To Professor Richards, "the arts are a storehouse of recorded values. They spring from and perpetuate hours in the lives of exceptional people when their control and command of experience is at its highest" (*Principles of Literary Criticism*). The arts record the most important judgments we possess as to the value of experience, and they supply the best data available for deciding what experiences are more valuable than others. Without the assistance of arts we could compare very few of our experiences and without such comparison we would not be able to agree as to which are to be preferred. Subtle and recondite experiences are for most men indescribable. The arts are the only form in which these experiences can be recorded.

There is however no guarantee that poetry is immortal. After all, poetry is not protected by immutable decrees of Providence ; it is what men make it ; they choose it in choosing themselves. If the world decides to do without poetry, too bad for poets. But it will also be too bad for society.

Maritime Activities in Ancient Bengal

KAMALESWAR BHATTACHARYA—*Sixth Year Arts*

THE facts relating to the maritime and colonial activities of the ancient Indians are too well-known today to require any introduction. As early as 1912 Dr. B. N. Seal wrote in his Foreword to "Indian Shipping" by Radha Kumud Mookerji: "One broad historical generalization stands out clearly and convincingly, of which all histories of world culture will do well to take note, namely the central position of India in the Orient World, for well-nigh two thousand years, not merely in a social, a moral, a spiritual, or an artistic reference, but also and equally in respect of colonizing and maritime activity, and of commercial and manufacturing interests." Bengal, with her close proximity to the sea and her extensive coast-line on the southern border studded with thriving ports and harbours, ever occupied in these respects a uique position in the sub-continent of India,—a fact which is prominently noticed in indigenous literature and inscriptions as well as in foreign records. Thus, in the Mahabharata (Sabha Parva), the people of Suhma (*i.e.* W. Bengal) find reference, in connexion with the exploits of Bhima, as sagara-vasinah, "dwellers on the sea-coast". Kalidasa, in his Raghuvamsa (Canto IV), tells us how the people of Vanga, situated "amidst the streams of the Ganges" (Gangasaroto'ntaresu), *i.e.* "the yet undeveloped territory on the sourthern coast of Bengal, corresponding to a considerable part of the extensive area now known as the Sundarbans", resisted, though unsuccessfully the forces of the digvijayi hero with their naval power (nausadhanodyatan). In a mid-sixth century inscription, discovered at a U. P. village called Haraha, the Maukhari King Isanavarman is said to have triumphed over the Gaudas, *i.e.* the inhabitants of the Gauda kingdom of Bengal which had risen on the ruins of the Gupta Empire, and they are represented here as samudrasrayan, "living on the sea-shore", or be it suggested, on maritime pursuits. Curious to mention, in a late-eighth century Javanese epigraphic record, *viz.* the Kelurak Inscription of 782 A.D., issued by a king of the Sailendra dynasty, Bengal is designated as an island, "the island of Gaudi" (Gaudi-dvipa), as if to illustrate how the maritime fame of the country had reached even that distant insular colony of the ancien Indians, undoubtedly in the wake of the colonial enterprises emanating from here.

The history of ancient Bengal's maritime activities was inseparably bound up with some trade-ports, the most celebrated of which was, of course, Tamralipti, modern Tamluk, then "a city close to the Eastern

sea" (purvambudher adurastham nagarim), as the Kathasaritsagara describes it, or "near an inlet of the sea", as the 7th-century Chinese pilgrim, Hiuen Tsang noted. The classical geographers also refer to another port called Gange, the location of which, however, is still far from certain, though, as some scholars hold, the two ports might be identical. There were other ports and harbours too, identified or unidentified, references to which are met with in the writings of the early foreign travellers and geographers. Through these ports, notably Tamralipti, Bengal maintained from remote antiquity her relationship with the overseas world in the South and the East. The Jataka stories relate to merchants voyaging from Tamralipti to Campa (modern Bhagalpur) to Suvarnabhumi and Suvarnadvipa, the land and the island of gold, the general designations for the lands and the islands in the Far East, corresponding to the "Chryse" peninsula and the "Chryse" island respectively of the Greek geographers, and as the names indicate, a sort of "El dorado" for the Indian sailors. In the 4th century B.C., Megasthenes, the Greek ambassador at the court of the first Maurya Emperor Chandragupta, observed the "ascent of vessels from the sea by the Ganges to Palibothra" (*i.e.* Pataliputra, modern Patna, the capital of the Magadhan Empire); and herein seems to be contained the earliest dated reference to ancient Bengal's maritime trade. If Ceylonese tradition is to be believed, it was through the port of Tamralipti that the great Magadhan Empire, in the time of Asoka (3rd century B.C.), carried on its communication with that island kingdom, then ruled over by king Devanampiya Tissa. The Kathasaritsagara of the Kashmirian author, Somadeva, refers to Tamraliptika as a home of rich merchants engaged in overseas trade with such distant countries as Lanka (Ceylon), Kataha (identical with Keddah in the Malaya Peninsula) and Suvarnadvipa (evidently referring to some island or islands of the Malay Archipelago). Another work, the Milinda-panho, Questions of Milinda (the Indo-Greek king Menander), composed about the 1st century A.D., mentions Vanga in a list of maritime countries "where ships do congregate", and speaks of its overseas trade with different parts of India and of the world, such as the Coromandel Coast, Surat (in Kathiawar), Sovara (the tract of land watered by the lower course of the Indus), Alexandria, Takkola (modern Taqua Pa in the Malay Peninsula), Suvarnabhumi and China. Somewhere in the same century was composed the "Periplus of the Erythraean Sea" by an unknown Greek navigator, and this work tells us how from the port of Gange were carried different commodities of trade in vessels called "Colandia" to Southern India and Ceylon. In the same century, again, another classical writer, Pliny, informs us of an active commerce flourishing between Ceylon and "the land of the Prasioi", *i.e.*, the Pracyas, the name by which the ancient Greek and Roman authors designate the people of the region corresponding to ancient Magadha, modern South Bihar, and probably also a portion of W. Bengal (the deltaic Bengal being

designated as the country of the Gangaridae). In the time of Ptolemy also (*i.e.*, about the middle of the 2nd century A.D.), Tamralipti (Tamalites) carried on a prosperous trade with the Far East across the Bay of Bengal, but through Paloura, a port near modern Chicacole, on the Orissan coast. Early in the 5th century A.D., however, we find the Chinese pilgrim, Fa-hien, sailing direct from Tamralipti to Ceylon, thence to Java and thence finally to his own country, China. When Dandin composed his Dasakumaracarita, about the 6th century A.D., Tramlipti, mentioned in this work as Damalipta, was a flourishing centre of trade and maritime activities (mukta ca nauh prativataprerita tameva Damaliptam pratyupatisthata). The great commercial prosperity of Tamralipti was likewise noticed by the Chinese pilgrim, Hiuen Tsang, who visited India towards the middle of the 7th century A.D. Later in the same century, another Chinese pilgrim, I-tsing, informs us of the existence of a direct maritime intercourse between Tamralipti and the Far Eastern World, and writes, over and above, "This is the place where we embark when returning to China". Finally, the importance of Tamralipti as a centre of trade and commerce is attested by an eighth-century epigraphic record, *viz.*, the Dudhpani (Hazaribagh) Rock Inscription, that gives an account of three merchant brothers with their names ending with 'Mana', *viz.*, Udayamana, Sridhautamana and Ajitamana, coming from Ayodhya to Tamralipti for the purpose of trade and returning to their native place with an immense fortune (Tamraliptim Ayodhyaya yayuh purvam-vanijyaya | Bhuyah pratinivrttaste svam-avasam yiyasavah). Nowhere after this, either in any indigenous record or in a foreign writing, does the great seaport town find mention, and, not unlikely, a change took place on the face of nature, as a result of which Tamralipti was deprived of its proximity to the sea—modern Tamluk is about 60 miles inland from the sea—and, in consequence, also of its enviable position in the history of maritime activities of Bengal, nay of Eastern India as a whole.

Yet, Tamralipti was not the only important seaport in ancient Bengal. An inscription from the Wellesley District of the Malay Peninsula, discovered more than a hundred years ago, and ascribed to the 4th or 5th century of the Christian Era, records the gift of a sailor Buddhagupta, an inhabitant of Raktamrittika (Mahanavika—Buddhaguptasya Raktamrittikavasa . . . .) which has been identified with Rangamati in Chittagong. Where was this Raktamrittika? There can possibly be no doubt that the name, meaning "red soil", is preserved in the present-day Rangamati, one in the Murshidabad District of Bengal, corresponding to Hiuen Tsang's Lo-to-mo-chih, another in the District of Chittagong. May we not suppose that it was from the latter district, rather than from the former, and for the matter of that, from some port in the same region, that the "great captain" (Mahanavika) sailed to the overseas country where his inscription has been found? This view would perhaps receive confirmation from the fact that a number of similar place-names

occur in the neighbouring regions, due evidently to the peculiar character of the soil, *viz.*, red laterite, such as the Lal-mati or Lalmai Hills, the Rohitagiri of the inscriptions of the Candra Kings ? near Comilla ? Rangamatta, Rangamatty, Rangamati, to the west, north and south of the upper course of the Brahmaputra river, mentioned in Rennel's map, and corresponding to the existing Rangiya, Rangapada, Rangagram etc.; and, it may be added, the name of the district of Rangpur itself.* This being so, we seem to find a definite evidence of the importance of Chittagong, in addition to Tamralipti, as a centre of trade and maritime activities in Eastern India in as early a period as the 4th or 5th century A.D. to which the inscription of Buddhagupta is supposed to belong. The prevalence of a brisk maritime intercourse between the Lower Gangetic delta and Indonesia in the middle of the 9th century A.D. (*i.e.* when Tamralipti seems no longer to have been a flourishing port) is attested by the Nalanda Copper-plate of Devapala. This inscription records the gift by the Pala monarch of five villages in response to a request from the Sailendra emperor Balaputradeva of Java for the upkeep of a monastery built by the latter at Nalanda. What is interesting to note in this connection is that this request is said to have been conveyed to the Pala King by the ruler of a 'mandala' called Vyaghratati, the "Tiger coast", and evidently corresponding to the Sundarban area. There thus prevailed at that time a direct maritime communication between that part of Bengal and the insular kingdom in the Far East. An ancient port in Eastern Bengal, whose location has puzzled the scholars, was Harikela, mentioned by the late 7th century Chinese pilgrim, I-Tsing, as 'the easternmost limit of India'. Early in the 11th century, however, as we learn from Tibetan and Nepalese sources, the Bengali monk Atisa Dipankara, an inhabitant of Vikramapura (Eastern Bengal), went on a voyage to Suvarnadvipa (either Sumatra or Java) and returned to Magadha, after twelve years, visiting Tamradvipa (*i.e.* Ceylon) on his way. In the 14th century, if the testimony of the Japanese text Nagarakritagama is to be believed, the people of Gauda (or Bengal) as also of Karnataka (*i.e.* the Kanarese districts of S. India), including traders and merchants as well as missionaries, still visited the capital of the Hindu Kingdom of Java, "unceasingly, in large numbers".

In the wake of trade and commerce there followed colonial enterprises and cultural missions. The Ceylonese tradition, preserved in the two celebrated Chronicles, the Dipavamsa and the Mahavamsa, associates the Indian colonization of that island in the 6th century B.C. (if the tradition is to be believed) with a prince named Vijaya of Sihapura in the territory of Lala. This Lala is sought to be identified by some with W. Bengal, the ancient Radha, corresponding to Ladha mentioned in the

* For this suggestion, I am indebted to Dr. Nihar Ranjan Ray's Bengali work, "Vangalir Itihasa",

Jaina Sutras. According to others, however, it represents Lata or ancient Gujarat, the Larike of the Greek geographer Ptolemy, and consequently, Vijaya was an inhabitant, not of Bengal, but of that country. The same uncertainty prevails regarding the association of Bengal with the foundation of the Annamese Kingdom of Van-lang, ascribed by tradition to the adventure of a prince called Lak-long, who, scholars like Gerini opine, went from Bengal in the 7th century B.C. and introduced there the ruing race of 'Vuang' (Vanga ?) that dominated over the kingdom till the 3rd century of the pre-Christian Era.*

As regards missionary and cultural activities, however, we are on far more definite grounds. It is now admitted on all hands that Bengal played no insignificant role in the foundation of the "Greater India", the expansion of the Indian culture and civilization outside the borders of the sub-continent. The pioneers in the field were undoubtedly the inhabitants of Southern India, the Coromandel Coast. But when the Bengalis appeared vigorously on the scene, they were able to supplant to a great extent, if not wholly, the peninsular influences and traditions by their own. In the middle of the 7th century A.D., as Lama Taranatha, the famous 17th century Tibetan historian of Indian Buddhism, tells us, Dharmapala, an inhabitant of Kanci (S. India), after teaching for 30 years at the celebrated Buddhist University of Nalanda, proceeded to Suvarnadvipa on a religious mission. In the last quarter of the next century, as the Kelurak inscription, to which a reference has already been made above, shows, another Bengali missionary, Kumaraghosa by name, went to Java to enjoy in that distant island the dignified status of the royal preceptor (Rajaguru) to whom the reigning monarch of the country, "an ornament of the Sailendra dynasty" (Sailendra-vamsa-tilaka), resigned his spiritual self, declaring that his head had been "purified with the dust of the lotus-feet of the guru from the island of Gaudi" (Gaudi-dvipa-guru-kramambuja-raja-putottamanga). It was undoubtedly as the result of such missionary activities that Mahayana or later Buddhism appeared from Bengal in Java and the neighbouring regions, until by the 11th century Suvarnadvipa became so famous a centre of the creed that persons like Dipankara-Srijnana, the future High Priest of the Vikramasila monastery and the prophet of Buddhism in Tibet, went there for the study of Buddhism from Bengal itself. Bengali influence is also manifest in the art of Java, Bali and Burma. A number of inscriptions, again, have been discovered in Java and Cambodia, belonging to the 8th and 9th centuries A.D. and onwards, which are written in what is known as the 'proto-Bengali" alphabet that must have, therefore, been borne to these countries by the colonists and the missionaries from Bengal. Bengali influence may occasionally be also discerned in the literature and traditions and folk-lore of various countries of the Far East.

* See Gerini, "Researches on Ptolemy", pp. 339-40.

It is, however, only late in the 8th century A.D. that we find the cultural influence of Bengal really triumphant in the Far East ; and this, on the one hand, has led to the contention, already indicated above, that "Bengal entered the arena of active colonial enterprise some time after Southern India", and, on the other, is indicative of the emergence of some new inspiring factor in the life of the country itself. In the middle of the 8th century, Bengal was relieved of a century-and-a-half old anarchy and confusion, known as "matsyanyaya", by the advent of a new royal dynasty, the Palas ; and this remarkable synchronisation points almost irresistibly to the conclusion that the restoration of political order and stability in the country, and moreover, the patronage offered by the new ruling family, which seems to have had (as noted below) a special association with the sea, gave a fresh and unprecedented impetus to ancient Bengal's maritime enterprise.

The brisk maritime activities also presuppose a great naval development in the country, and a flood of light is thrown on the same by a number of epigraphic records, extending over centuries and issued by different ruling dynasties. The important role of the navy in the military organization of Bengal under the Guptas is attested by an early-6th century inscription, *viz.* the Gunaighar Grant of Vainya Gupta, in which we find reference to the navy (mahanau), along with other elements of warfare, and to a "nau-yoga", probably a place where boats or ships used to congregate, *i.e.*, a sort of naval harbour. Even in the days of the disruption of the Gupta Empire, as the Faridpur copper-plates of the times of the Dharmaditya and Gopachandra go to show, Navyavakasika in Eastern Bengal was a flourishing centre of naval and commercial activities under a local regime, for references are found in these inscriptions to navatakseni, "shipbuilding harbour" and nau-dandaka, "ship's mast", to officials like Vyapara-karandaya, "customs-officer" and to pradhana-vyaparinah, "principal traders". A special association of the Palas with the sea appears to be implied in such late literary works as Sandhyakara Nandi's Ramapala-carita, composed in the 12th century A.D., in which king Dharmapala is described as Samudra-Kula-dipa, "the light of the family of the sea", in an old Bengali text, *viz.* Ghanarama's Dharma-mangala, and in Taranatha's History of Buddhism. The importance of the navy as a fighting material under them is testified to by the frequent references to "manifold fleets of boats" (nanavidha-nau-vataka) in their inscriptions. The Kamauli copper-plate of Vaidyadeva, minister of Kumarapala, actually contains a vivid description of a naval battle fought by the Pala monarch in the 12th century in Southern Bengal (Anuttara-Vanga). An 11th-century Central Indian inscription found at a place called Gurgi seems to indicate that, attacked by a Kalacuri king the Gauda-raja, probably Mahipala I of the Pala dynasty, took shelter in a subterranean fort (jala-nidhi-jala-durgam). The Senas, who succeeded the Palas as the next paramount sovereign power in Bengal, must have

also laid great emphasis on their naval power. In the Deopara prasasti of Vijayasena we find that Sena conqueror leading a naval expedition against his western neighbours across the Ganges (Pascatya-cakra-jaya-kelisu yasya yavad—Ganga-pravaham-anudhavati nau-vitane). That navigation still constituted an important pursuit of the Bengali people seems to be indicated by an 11th-century Sylhet inscription, *viz.*, the Bhatera copper-plate of Govindakesava, in which is found a reference to a sailor (navika) Dyojya.

A completely opposite picture appears to be presented, however, by a study of the contemporary economic and social conditions.

A definite index to a country's commercial progress, it goes without saying, is its economic prosperity, which again, can nowhere be better studied than in the contemporary currency. But in the case of Bengal the currency is so poor since the close of the Gupta rule throughout the whole pre-Mahomadan period, that, when taken along with the other data indicating the country's naval and commercial development in the period, it offers a striking contrast. The end of the Gupta dominion was followed by a period of anarchy and confusion in Bengal, not only in a political sense but in an economic sense as well. During this period of "monetary anarchy", metallic currency went completely out of use, and cowries came to establish themselves as the sole medium of exchange. The Palas, who in the middle of the 8th century A.D., succeeded in putting an end to the century-and-a-half old political 'matsyanyaya', do not seem to have attained any remarkable amount of success, if any, in the economic sphere. The extreme scarcity of their coins and, moreover, the generally debased character of the few copper and silver pieces attributed to them, both from the metallic and the artistic points of view, only express the vainness of their attempt to restore the metallic currency in their kingdom. In the Sena period, cowries, "kapardaka", again became the only exchange-medium, although an attempt was made at "linking up all exchange transactions ultimately to silver, just as at present the rupee, the silver coin, is linked up to a gold at a certain ratio", by equating certain number of cowries to a standard silver coin, "purana", as the expression "Kapardaka-purana" in the copper plate grants of the period seems to indicate. This was the economic situation of the country on the eve of the Muhammedan invasion that took place in the closing years of the 12th century, and, as the 13th century Muslim historian, Minhaj-ud-din writes in his Tabaqat-i-Nasiri, the Muhammedans, when they first came to Bengal, found the people using cowrie shells in economic transactions, silver currency being altogether absent in the country and even when the king made any monetary gift, "the least gift he used to confer was a lak of Kauris". Now, is it conceivable that Bengal, if she was really commercially developed during the period under review, especially under the Palas, had no currency worth the name? Has it, then, a reflection upon the economic condition of the country which

must presumably have been an extremely pitiable one, and as a natural concomitance, on the history of her commercial and maritime activities?

The conclusion suggested by the study of the economic conditions seems prima-facie to be confirmed by the social changes, the shifting of positions of orders in society likewise noticeable during the same period. The epigraphic records available prior to the 8th century A.D. show what an important position was occupied by the representatives of the trade and craft-guilds, *e.g.,* the Nagarasresthi (Guild-president), the Prathama-sarthavaha (Chief merchant) and the Prathama-Kulika (Chief artisan), in the social and political organizations of the country. But in the centuries following, we find these orders of society receding into the background, while, in their stead, the cultivators, the "Ksetrakaras" or "Karsakas", appear to have come to the forefront. Does it indicate that trade and industry no longer counted in the material life of the people, and that agriculture was henceforth their main, if not sole, economic pursuit? And, are we to detect in this phenomenon the operation of the hands of the Arab merchants who made their advent on the western coast of India as early as the 8th century A.D. and, by the 10th century, spread themselves over a considerable portion of the Eastern coast and as far as the Far East?* Another circumstance, it is noticeable, falls significantly within our period, *viz.,* the emergence of a great naval power, the Colas, in the Coromandel Coast, and the overseas exploits of that kingdom under Rajaraja the Great and his even more illustrious son, Rajendra I in the late 10th and early 11th centuries A.D. must have afforded a renewed impetus to the commercial enterprises emanating from that region. But, the fact remains that even if overseas trade and commerce declined, or even stopped, this did not necessarily mean a cessation of Bengali maritime activities altogether. If the primary economic urge had fallen into abeyance, there is hardly any ground for supposing that the cultural urge, too, met with the same fate. This was simply impossible in a lang where, and in a period when, flourished men like Dharmapala, Kumaraghosa and Dipankara-Srijnana.

The ships built in ancient Bengal seem to have been of considerable dimensions. Fa-hien, *e.g.,* sailed in a merchant vessel from Tamralipti that was capable of accommodating more than 200 passengers. But maritime navigation in those days, still in a crude state of development, was not altogether free from risks. The Kathasaritsagara, to which a reference has already been made above, gives stories of sailors, haunted by fears of natural perils, propitiating the sea with jewels and other valuable articles,—a custom which, it is curious to note, finds mention in medieval Bengali literature as well. The Mahakarma-vibhanga, a Buddhist canonical work, illustrates "calamities of foreign travel" (desantara-vipaka) by reference to merchants sailing from Tamralipti and

* See Dr. Tara Chand's "Influence of Islam on Indian Culture". pp. 38 ff.

Mahakosali ; and a 16th century "literary forgery" the Saka-subhodaya, professing to be a composition of Halayudha, the famous minister of Laksmanasena, actually describes a shipwreck suffered by a Bengali merchant named Prabhakara on the Bay of Bengal. We also know how the 5th century Chinese traveller, Fa-hien, had to experience a terrible storm in course of his voyage from Tamralipti to Ceylon, and, as he further informs us, to add to these natural contingencies was the fear of oppression at the hands of the sea-robbers spying the vessels from the distant shores. It is undoubtedly a remarkable testimony to the great energy and spirit of enterprise of the people of ancient Bengal that they carried on their maritime pursuits in defiance of these serious obstacles.*

The English Seminar

Many and large were our hopes and visions but too few have been our achievements. In our first meeting we accorded a hearty farewell to our predecessors. In the second meeting Miss Santa Das (4th yr. English) read a Paper entitled *Modern Trends in English Literature.*

Another Paper on T. S. Eliot's 'The Waste Land' written by Rabin Majumdar (4th yr. English) will come in for discussion in the next meeting of the Seminar.

The response and enthusiasm of our 3rd year friends are really encouraging. *The work of the Seminar Library is going on satisfactorily. We are trying to add* more books.

SANAT BHATTACHARYA,
RABIN MAJUMDAR,
Jt. Secys., (English Seminar).

* In writing this article I freely consulted such standard works and treatises as Dr. R. C. Majumdar's *Campa and Suvarnadvipa* (2 parts), *Dacca History of Bengal,* Vol. I edited by the same scholar, Dr. B. R. Chatterjee's *Indian Cultural Influence in Cambodia,* Dr. B. C. Sen's *Some Historical Aspects of the Inscriptions of Ben,* Dr. D. C. Sen's *Vrihat Vanga* (2 Vols.) and Dr. Nihar Ranjan Roy's *Vangalir Itihasa (Adi Parva).*

The "Mock-Parliament"—A Novel Experiment

The tame and routine business of our College life was shaken this year by a "Mock-Parliament" on April 28,—a novel experiment undertaken by the third year students. It aroused wide-spread interest and enthusiasm both among the members of the staff and the students, and the House was packed to capacity till the end of the function. This kind of show, though "Mock" in character, has real significance as it is the future Parliamentarians who will decide the fate of Democracy in India, and I have great pleasure in stating that the students of this College showed ample signs of being would-be Parliamentarians.

I must, first of all, express my heart-felt gratitude to the Hon'ble Sri I. D. Jalan, Speaker, West Bengal Legislative Assembly, for his able and wise guidance of the "Mock-Parliament" as the Speaker. I take this opportunity to thank our Principal, Dr. J. C. Sen Gupta, Prof. U. N. Ghosal, Prof. R. C. Ghosh, Prof. B. Dutt, late Prof. N. R. Roy and Prof. T. Majumdar but for whose advice and encouragement our idea would not have materialised.

The "Parliament" began with interpellations. The Ministers were assailed by a thousand and one questions—sometimes they were embarrassing, and sometimes they were humorous. Sri Subir Das Gupta of the opposition assumed the role of Mr. Kamath in the Indian Parliament, putting the greatest number of questions. Points of order were raised both from the Government and the Opposition benches and that created a proper Parliamentary atmosphere.

Then rose the Prime Minister, Sri Dinendra Marik, amid loud cheers, and by his clear exposition of the Government's policy, he drew the attention of the audience. All throughout he was able to maintain the gravity consistent with his position as the Prime Minister. Sri Biswanath Dutt as the Foreign Minister analysed the Kashmir Problem in an eloquent speech and explained clearly India's basic stand. Sri Sukomal Roy Chowdhury in the role of the Food Minister had to answer a lot of short notice questions and his statement assuring self-sufficiency in food faced severe criticism. His ready wit in defending the Government was really praiseworthy. Sri Dipak Roy's role as the Minister for Industry and Supplies was highly appreciated by the audience. Miss Tapati Bhattacharya as the Health Minister spoke admirably and Sri Mohit Bhattacharjee's part as the Minister for Education was no less admirable. The Home Minister Sri Sanat Kumar Bhaduri placed the Preventive Detention Act (Amendment) Bill before the House and he had to counter vehement opposition in having the Bill passed. A very tense atmosphere was created at the time of the division. Sri Rathin Chakravarti's part here as the Chief Whip of the Government Party gave a realistic touch to the situation.

The other Ministers were—Sri Arun Chakravarti (Finance), Sri Sujit Sirkar (Defence), Sri Suhrid Mullick (Law), Sri Surya Chatterji (Labour), Sri Santanu Mukherjee (Relief and Rehabilitation), Sri Ramani Ghosh (Railways and Communications) and Sri Sunil Bhattacharya (Works, Mines and Power). They all gave a very good account of themselves.

Among girl members Sri Sabita Sen and Sm. Nandita Chowdhury took part in the debate and impressed the audience with their forceful arguments.

The brilliant and at the same time belligerent role of the Opposition enhanced to a great extent the interest in the show. Sri Bharat Bhattacharya, the Leader, was loudly cheered for his oratory. Other members of the opposition who made an impression on the audience were Sri Amalendu Mukherji, Sri Ashin Das Gupta, Sri Dipten Banerjee and Sri Amitava Gupta.

Sri Kalyan Dutta Gupta acted as Clerk of the House.

The function ended with a speech from the Chair. Sri Jalan praised highly the endeavour of the students and even went so far as to remark that the debate was in no way inferior to those in our State Legislature—if not better.

Before concluding I offer my sincerest thanks to Sm. Sabita Sen, Sm. Nandita Chowdhury, Sm. Bithika Modak, Sri Amitava Gupta, Sri Suprokash Mukherji, Sri Bharatendu Gupta, Sri Bijon Dutt, Sri Govinda Chakravarti and all my other friends who co-operated with me, making a success of the function.

S. K. BHADURI,
Organizing Secretary.

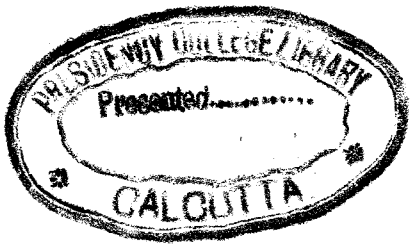
PRESIDENCY COLLEGE LIBRARY
Presented.....
CALCUTTA

STOP PRESS

We felicitate a distinguished ex-student, Dr. Harendra Coomar Mookerjee, on his appointment to the post of Governor of West Bengal. He was a student here from 1897-1898.

With the death of Abanindranath Tagore, Bengal has lost the last of a line of veterans far removed from the present-day life, but the true representatives of the old, aristocratic culture. Of this culture, concentrated in the Tagore family, Abanindranath was one of the finest flowers. His delightful reminiscences build up before our eyes their distant world, which yet has a charm and flavour all its own. He opened a new and broad avenue before our art, initiating and inspiring the Bengal School which broke with the tradition of cheap imitation of European naturalism, and turned to the exploration of the old Indian forms and content. His writings, shot through with whimsical humour, his fresh and vivid style, won him lasting repute as one of the great masters of Bengali prose. We shall not see the like of him again—with him passes his age, having woven such a rich strand into the texture of Bengali culture.

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

আষাঢ়, ১৩৫৯ ঃ ঃ ত্রয়োস্ত্রিংশ বর্ষ ঃ ঃ জুলাই, ১৯৫২

শ্রীশিপ্রা সরকার কর্ত্তৃক সম্পাদিত

বিষয়			পৃষ্ঠা
কলেজ-প্রসঙ্গ (জানুয়ারি—জুলাই, ১৯৫২)	...	..	১
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	...	৪
আধুনিক বাংলা কবিতা ও কয়েকজন কবি	...	...	৯
ইউরোপে মধ্যযুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং ধর্ম	...	...	১৬
অভীপ্সা [কবিতা]	...	...	২৯
নির্জন মুহূর্তে [কবিতা]	...	...	২৯
হৃদয়-সময়-স্বপ্ন [কবিতা]	...	...	৩০
একটি কবিতার ইতিহাস [কবিতা]	...	...	৩২
বর্ষার কবি	...	...	৩৩
কলেজের ষ্টীমার পার্টি	...	...	৩৯
গ্রন্থপরিচয়	...	...	৪২
আমাদের কথা	...	...	৪৬
Notes and News	...	...	1
Economists and Policy-makers	...	...	5
Satyagraha—The Gandhian Means to Resist Evil			12
In Praise of Shakespeare	...	...	15
Impact of Islam on India	...	...	26
Trends of Modern Literature	...	...	39
Liquid Fuel to the Rescue Again	...	...	41
Progressive Thought and the Presidency College	...	...	46
The Peace Festival	...	...	54

বিজ্ঞাপন

প্রতি সংখ্যার জন্য চাঁদার হার ঃ—

ভারতের মধ্যে (ডাকমাশুল নিয়ে)	২৷৷০ টাকা
প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য—	১৷৷০ „
ভারতের বাইরে	৪ শিলিং

প্রেসিডেন্সি কলেজের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র, অধ্যাপক বা কলেজ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে রচনা আহ্বান করা হচ্ছে সাদরে। সাধারণের কৌতূহলোদ্দীপক হৃদয়গ্রাহী রচনাবলী এবং এই কলেজ ও বিদ্যালয় সম্পর্কিত পত্রাদি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। উপযুক্ত ডাকটিকিট-যুক্ত শিরোনামা লিখিত লেফাফা সংগে না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

রচনা কাগজের একপিঠে লিখে "সম্পাদক, প্রে. ক. প"এর নামে পাঠাতে হবে। রচনার সংগে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা পাঠাতে হবে।

পত্রিকা-সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে প্রকাশনা বিভাগের সম্পাদকের সংগে পত্রালাপ চলবে।

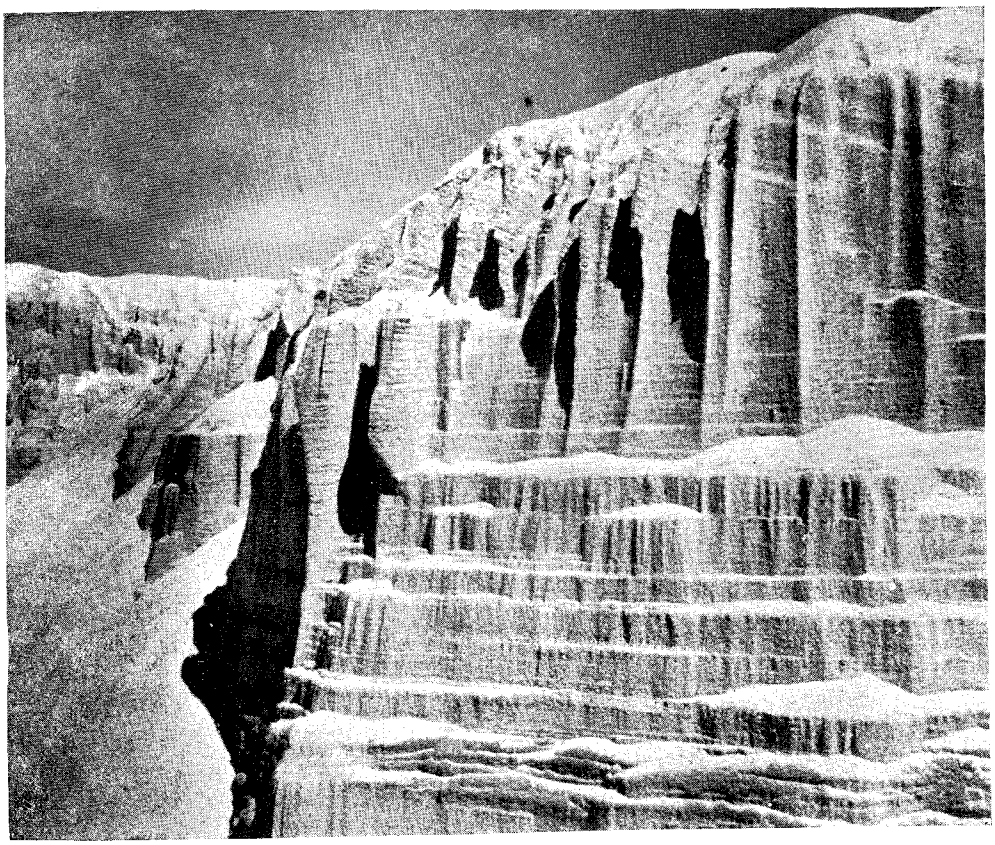

উশ্রী নদীর ধারে

আলোকচিত্র—শ্রীসুশীল সরকার

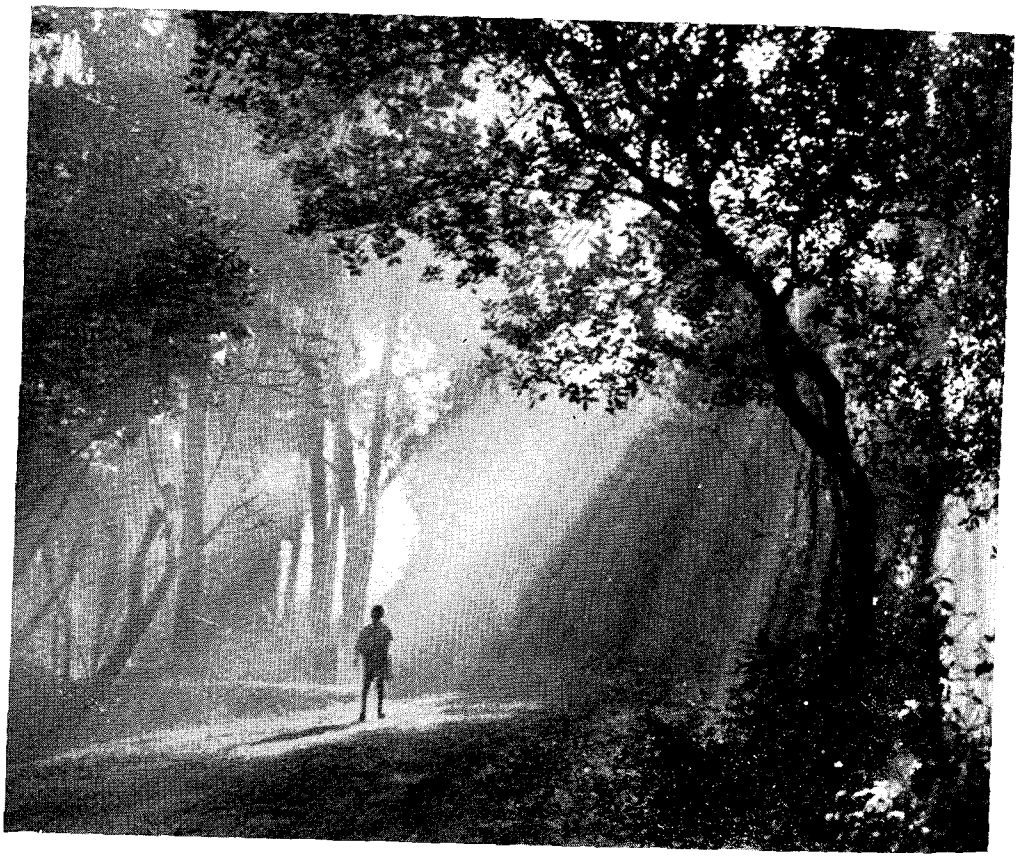

অন্বেষণ

আলোকচিত্র—শ্রীসুশীল সরকার

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

আষাঢ়, ১৩৫৯ ঃঃ ত্রয়োস্ত্রিংশ বর্ষ ঃঃ জুলাই, ১৯৫২

কলেজ প্রসঙ্গ

(জানুয়ারি—জুলাই, ১৯৫২)

আমাদের দ্বিতীয় সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করছে প্রথমটির ঠিক ছয়মাস পরেই, এবং বছরের মাঝে এমন সময়ে যখন কলেজের নূতন খবরাখবর কিছু থাকে না বললেই চলে। পরীক্ষার ফলাফল এখনও বার হয়নি, অধ্যাপকমণ্ডলীতে পরিবর্ত্তনও কম হয়েছে। এই অবস্থায় "কলেজ প্রসঙ্গ" লেখার প্রয়োজন হ'ত না, কিন্তু "কলেজ প্রসঙ্গ" এমন একটি বিভাগ যা প্রায় "আমাদের কথা"র মতনই কলেজ জীবনকে ধারাবাহিক রূপ দিয়ে আসছে কলেজ পত্রিকার মাধ্যমে,—অতএব একে বর্জ্জন করা সম্ভব নয়।

সম্প্রতি আমাদের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক শ্রীপরেশনাথ ভট্টাচার্য্য বিদায় নিয়েছেন, তাঁর জায়গায় এসেছেন শ্রীনিখিলচন্দ্র সেন। ইতিহাস বিভাগে নূতন যোগ দিয়েছেন শ্রীচণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, গণিত বিভাগে শ্রীমণীন্দ্রভূষণ রায়। রসায়ন বিভাগের শ্রীসরোজরঞ্জন ঘোষ অবসর গ্রহণ করার পরে তাঁর কার্য্যভার নিয়েছেন শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, এবং ভূবিদ্যা বিভাগে শ্রী ডি আর এস মেহতার জায়গায় এসেছেন শ্রী পি কে চ্যাটার্জ্জী। অন্যান্য বিভাগীয় পরিবর্ত্তনের মধ্যে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শ্রীসুশীল সরকার এবং শ্রীক্ষিতীশ নাথের জায়গায় এসেছেন যথাক্রমে শ্রীমুকুল মজুমদার ও শ্রীসুকুমার ঘোষ, ভূগোল বিভাগে যোগ দিয়েছেন শ্রীপ্রমথ হোড়, এবং শারীরবিজ্ঞান বিভাগের শ্রীপ্রকাশ চক্রবর্ত্তী বিদায় নিয়েছেন।

কার্য্যালয়ে যে-সব পরিবর্ত্তন এসেছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল আমাদের সুপরিচিত শ্রীসরলকুমার মিত্রের বিদায়গ্রহণ। আমাদের সব কাজেই প্রচুর সাহায্য এঁর কাছে আমরা বরাবর পেয়ে এসেছি। ক্যাশবিভাগের শ্রীরমেশচন্দ্র নন্দী আর একজন পুরানো কর্ম্মী,

ইনিও সম্প্রতি কলেজ ছেড়ে গেছেন। শ্রীজিতেন্দ্রনারায়ণ রায় বিদায় নিয়েছেন। শ্রীসতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত হেড ক্লার্কের কাজ করছেন, এবং শ্রীযুক্ত নন্দীর কার্য্যভার নিয়েছেন শ্রীযাদবচন্দ্র নাহা।

এখনও পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষার ফলাফল বেরোয়নি, তবে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় আমাদের কলেজের যে-সব ছাত্র প্রথম দশজনের মধ্যে স্থান পেয়েছেন তাঁদের নাম নীচে দেওয়া হল। আমাদের কৃতী ছাত্রদের আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আই এ :

শ্রীপ্রদীপকুমার দাস (৭ম)

শ্রীশঙ্কর সেন (১০ম)

আই এস সি :

শ্রীদেবীচরণ খান (১ম)

মহঃ আসগর আলী (২য়)

শ্রীদিলীপকুমার ভদ্র (৪র্থ)

শ্রীমৃণালকান্তি করগুপ্ত (৮ম)

শ্রীমোহনলাল আগরওয়ালা (৯ম)

কলেজের ফলাফল এবং পাশের হার বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা এখানে সম্ভব হ'ল না।

শোক সংবাদ

সুবিদিত মার্ক্সবাদী লেখক শ্রীরেবতী বর্ম্মণের মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন মননশীল লেখককে হারিয়েছে। ইনি আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র।

শ্রীকান্তিগোপাল ব্যানার্জ্জী একসময়ে আমাদের উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। নিজের কর্ম্মক্ষেত্রের বাইরেও তাঁর নাম ছিল একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে। শ্রীনিবারণ ভট্টাচার্য্য ২৫ বছর আমাদের শারীরবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি এই বিভাগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, এবং একসময়ে প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। হিন্দু হস্টেলের তত্ত্বাবধায়কের পদেও তিনি কিছুদিন ছিলেন। এই দু'জন প্রবীণ প্রাক্তন অধ্যাপকের মৃত্যুতে আমরা শোক প্রকাশ করছি।

প্রাক্তন ছাত্র সংবাদ

আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীফণীভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হওয়াতে আমরা আনন্দিত। কলেজের পক্ষ থেকে তাঁকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

নতুন শাসনবিধানে যে-সর্ব্বভারতীয় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থা সভাগুলি গঠিত হয়েছে, তার মধ্যে আমাদের কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র স্থান পেয়েছেন। তাঁদের আমরা অভিনন্দন

জানাচ্ছি। তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীমেঘনাদ সাহা, শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, শ্রীশিশিরকুমার ব্যানার্জ্জী, শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মুখার্জ্জী, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভারতের রাষ্ট্রপতিপদে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের পুনর্নির্ব্বাচন এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাসের যোগদান আমাদের বিশেষ আনন্দ ও গৌরবের কারণ। এঁরা দু'জনেই আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র।

পত্রিকাপ্রসঙ্গ

কলেজ পত্রিকার দু'টি সংখ্যা প্রকাশ করা অবশেষে সম্ভব হয়েছে। পত্রিকার বরাদ্দ টাকা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের অধ্যক্ষ ডক্টর সেনগুপ্তের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। একসময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা বছরে তিনবার বেরোত, আজকের চড়া দরের বাজারে তা আর সম্ভব না হলেও, অন্ততঃ দুটি সংখ্যা নিতান্তই আবশ্যক বলে মনে হয়। কাজেই আশা করছি যে ভবিষ্যতেও এই ব্যবস্থা চালু থাকবে, কারণ বছরে একবারের বেশী পত্রিকা না পেলে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ঝিমিয়ে আসে। দু'টি সংখ্যা বার করতে অতিরিক্ত সময় বা পরিশ্রম যেটুকু লাগে তা' বোধহয় সম্পাদকের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে, অন্ততঃ তা' নিয়ে আপত্তি ওঠার কথা নয়। অর্থসঙ্কট ছাড়া আর কোনও কারণে আবার সেই একমেবাদ্বিতীয়মের যুগে ফিরে যাওয়া উচিত হবে না। দরকার বোধ করলে রচনা, সাধারণ ছবি ইত্যাদির সংখ্যা (এবং খরচ) কমিয়ে কলেজের খবরাখবরকে প্রাধান্য দেওয়া যেতে পারে, এবং সাধারণভাবেও এই প্রাধান্যটুকু দেওয়া উচিত, কারণ কলেজ পত্রিকার অন্যতম প্রধান কাজ হ'ল আমাদের দৈনিক কাজকর্ম্মের বিশিষ্ট দিকগুলি আলোচনা করে' কলেজ জীবনকে আরও বেশী সুসংবদ্ধ হয়ে উঠতে সাহায্য করা।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীবিনয় চৌধুরী—তৃতীয় বর্ষ, আর্ট্‌স্

শিল্পীর মন সে যেন ভরা কলসী। একটু এদিক ওদিক নড়লেই জল ছলকে পড়ে। শিল্পীর মনে লাগল একটু দোলা, অমনি সৃষ্টির বেদনা উচ্ছল হয়ে উঠে। প্রাচীন গ্রীসে একরকমের বীণা ছিল, বাতাসের সামান্য আঘাতেই তা বেজে উঠত। শিল্পীর মনও যেন একটি তার-বাঁধা বীণা, অদৃশ্য অঙ্গুলীর স্পর্শে গমকমূর্চ্ছনার সুন্দর ছন্দ রূপ পেয়ে উঠে।

আত্মপ্রকাশের এই দুর্নিবার ব্যাকুলতা মানুষের সমস্ত শিল্প, স্থপত্য, ভাস্কর্য, সঙ্গীতকে চিহ্নিত করে রেখেছে। বিশ্বপ্রকৃতির প্রাণের উচ্ছল তরংগ ধারা শিল্পীর প্রাণের তটে লেগে শুভ্র ফেনায়িত হয়ে উঠে। বিশ্বপ্রকৃতির প্রাণছন্দ আর শিল্পীর আনন্দবোধ—এই নিয়ে শিল্প। প্রাচীন ভারতের ঋষিশিল্পীর মন্ত্রের মধ্যে এই আনন্দের রূপায়ণ।

"মধু বাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।"

এই শিল্প জীবন, শিল্প ও জীবনের মধ্যে সংগতির যে অপূর্ব সুষমা, তারই ব্যঞ্জনা শিল্পে সাহিত্যে। বাহিরের রূপলোক আর অন্তরের রসলোক এই দ্বৈত লীলা সাহিত্যে। জীবন এবং শিল্প গঙ্গা-যমুনার ধারার মত মিলে যায়—শিল্পের সংগে জীবনের ঘুচে গেল সব অসংগতি।

অবনীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টি এই জীবন-শিল্পেরই রূপায়ণ, শুধু শিল্পের আনন্দ-প্রাংগনে সব খেলা শেষ হয়নি, একটা ভাল-লাগার অনুভূতি, একটা সহমর্মিতার অনুভূতি তাঁর সব সৃষ্টিতে ছড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ বলতেন রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময় পৃথিবীর যে-অফুরন্ত ঐশ্বর্যের অকৃপণ দাক্ষিণ্য তাঁর জীবনের প্রতি শূন্যতা ভরিয়ে দিয়েছে তার বদলে কবির শুধু একটা উক্তি—আমি ভালোবাসি—শান্তিনিকেতনের লাল-শিরীষের লিখিত মর্মর দিনান্তের ধ্যানভংগ করে—আর রবীন্দ্রনাথ বলতেন—

তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া
আমার অংগ

তাই আর্টিস্ট্ অবনীন্দ্রনাথই শেষ কথা নয়। অনিন্দ্য গদ্যশিল্পীও একটা প্রধান দিক।

আর্টিস্ট্ অবনীন্দ্রনাথকে বিচার করবার আগে বিভিন্নদেশের শিল্পাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় শিল্পাদর্শের বিচার অপ্রাসংগিক হবে না।

গ্রীক আর্টে দুই বিভিন্ন রূপ-কল্পনার সমন্বয়—শুধু গ্রীক আর্ট নয়, গ্রীকসাহিত্যেও তার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। গ্রীক আর্টের মধ্যে একটা হল বিস্তৃতি, অন্যটা হল গভীরতা বা

প্রশান্তি। একটা দিক জীবনের বন্য উদ্দামতা, অন্যদিকে হিমালয়ের ধ্যান-মৌন মাধুরী, প্রথম রূপকল্পনার প্রতীক ডিওনিসাস, আর দ্বিতীয় ধারার প্রতীক এপোলো। গ্রীক জীবনের যে-বিষাদবাদ (Pessimism) তাকে যেন তারা জয় করেছে শিল্প দিয়ে। নীট্‌শে লিখেছেন "The sublime is the artistic subjugation of the awful." গ্রীক ট্রেজেডি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নীট্‌শে লিখেছেন "Tragedy itself is the proof of the fact that the Greeks were not pessimist." অপূর্ব জীবনের গতিবেগে এই বিষাদবাদ আর থাকেনি। তাই গ্রীক নাট্য সাহিত্যে ভয়ংকরের কল্পনা খুব স্বাভাবিক। এস্কাইলাসের 'Prometheus Bound'-এ হিংস্র শকুন পর্বতের উপর বন্দী Prometheusএর হৃদয় নখর দিয়ে ছিঁড়ে ফেলছে। Orestieaতে দেখা গেল Agamemnon দেশে ফিরে আসছেন। হঠাৎ বাতাসের বেগ থেমে গেল। ছুঁড়ে দিলেন নিজের কন্যাকে—তারপর কন্যাহত্যার প্রতিশোধ নেয় গর্ভধারিণী মা কন্যার পিতাকে হত্যা করে। আবার পুত্র মাকে হত্যা করে। সোফোক্লিসের মধ্যে দেখা গেল ইডিপাস পিতাকে হত্যা করল, মাকে বিয়ে করল—কিন্তু সে জানত না যে এরা তার পিতামাতা—নিজের উপর প্রতিশোধ নেওয়া হল চোখ উপড়ে ফেলে। এই যে ভয়ংকরের কল্পনা ভারতীয় সাহিত্যে তার কোন নিদর্শনই পাওয়া যাবেনা। গ্রীক আর্টের মধ্যেও এই ভয়ংকরের কল্পনার রূপায়ন কম নয়।

চীনশিল্প প্রধানতঃ ল্যাণ্ড্‌স্কেপের সাহায্যে আত্মিক অনুভূতিকে রূপ দিয়েছে। শিল্পের তিন প্রকার রকম দেখা যায় (ক) অনুকারক (খ) ব্যঞ্জক (গ) ছান্দসিক। চীনাশিল্প ব্যঞ্জনা-প্রধান। ভারতীয় নৃত্যশিল্পে যেমন মণিপুরী নৃত্য ব্যঞ্জনাপ্রধান আর দক্ষিণী নৃত্য মুদ্রাপ্রধান।

য়ুরোপে দেখা যায় অনুকারক ছবির প্রাধান্য। পোট্রেট যাকে বলা চলে। প্রকৃতির গভীর রহস্যকে জানবার মত সাধনা যেন য়ুরোপের নেই—বৈচিত্র্যের পেছনে একের নিঃশব্দ-বাহী ধারা—য়ুরোপ তা শুনতে পায়নি। প্রয়োজনের অংগনেই যেন য়ুরোপের প্রতিভা বেশী খেলে। ভাস্কর্যের চাইতে স্থাপত্যে য়ুরোপের প্রতিভার স্বচ্ছন্দ বিকাশ হয়েছে।

ভারতীয় শিল্পে ভাবানুভূতি প্রকাশের মাধ্যম নিসর্গচিত্র নয়, মানব বা মানবেতর প্রাণী। চীনাশিল্প নিজেকে স্বভাবের পরিপ্রেক্ষিতে রেখেছে—আর ভারতীয় শিল্পে স্বভাব ও শিল্পীসত্তা এক হয়ে মিশে গেছে। একটা সহজ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। বুদ্ধমূর্তি। বুদ্ধমূর্তি ঘনীভূত ধ্যানেরই মূর্তি, কোন বিশেষ ব্যক্তিবিশেষের মূর্তি নয়। বিশেষ এক প্রকার ভাব বা উপলব্ধি বিশেষ একপ্রকার বিগ্রহ বা টাইপ সৃষ্টি করতে চায়, সেটা সর্বাংগ সুন্দর হওয়ার পরে সে পথে আর অগ্রসর হওয়া যায় না। বুদ্ধমূর্তি এইরকম নিখুঁত সৃষ্টি। নটরাজের রূপকল্পনায় ভারতীয় শিল্পের একটি বিশেষ দিক ফুটেছে, নটরাজের নৃত্যের প্রাণবেদনায় সমগ্র বিশ্ব যেন চেতনায় জেগে উঠেছে, সমস্ত বিশ্বসংসার নিয়ে যে-ছন্দ বা যে-গতি এক শক্তির কেন্দ্র থেকে প্রসৃত হয়ে সেইখানে ফিরে ফিরে আসছে নটরাজ তারই বিগ্রহ।

উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় শিল্পে য়ুরোপীয় শিল্পের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। তখনকার আর্ট্‌স্কুলের কারিকুলামে 'useful art'এর উপর জোর দেওয়া হতো বেশী। কিন্তু য়ুরোপীয় শিল্পের প্রভাবের ফল দাঁড়াল টেকনিক্‌তুরস্ততায়, শিল্পের খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হল—আর ভারতীয় শিল্পের যা প্রধান বৈশিষ্ট্য, একটা অখণ্ডতা, তা দেখা গেলনা। হ্যাভেলের প্রচেষ্টায় 'Indian Society of Oriental Art' সৃষ্টি হল। তার প্রধান লক্ষ্য হল প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যকে নূতন পরিপ্রেক্ষিতে রূপ দেওয়া। এই নবজাগরণে অবনীন্দ্রনাথের দান সর্বাপেক্ষা বেশী।

অজন্তার যুগে ফিরে গেল ভারতীয় কল্পনার সন্ধানী আলো—মোগল, রাজপুত আমলের শিল্পাদির পুনরুদ্বোধন হল। পাশ্চাত্ত্য Representationalist-এর যে কয়েকটা বৈশিষ্ট্য যথা correct realisation of perspective, emphasis, verisimilitude বাদ দেওয়া হল। রামায়ণ মহাভারত, কালিদাস ও ওমর খৈয়ামের কাহিনী নির্বাচনে ঝোঁক চাপল বেশী। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে প্রত্যেকটি রেখার ভাব-ব্যঞ্জনা প্রকাশের যে-রীতি, তা আবার জিইয়ে তোলা হল। তৈলচিত্রের বদলে water colour ছবির প্রচলন হলো বেশী। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পে ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের সংগে সংগে চীনা, জাপানী ও পারস্য দেশের শিল্পের অপূর্ব সমন্বয় দেখা গেল।

এবার গদ্যশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় দেওয়া যাক।

অবনীন্দ্র যে আমাদের শুধু একটা নূতন গদ্যের style দিয়ে গেছেন তা নয়—সে গদ্যের সংগে সংগে স্মরণীয় হয়ে আছে বিশেষ এক ভাবাদর্শ।

কথা বলবার সময় মানুষ শুধু কথাই বলে। গান করবার সময় মানুষ গানই করে—কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ কথা বলার সংগে সংগে গান করেই চলেছেন। তাঁর গদ্য মুখের ভাষার অবিকল প্রতিকৃতি নয় বা গানের বিদেহী আত্মার একটা বিশেষ আদল নয়। ঝরণার জলের বেগের নীচে উপলখণ্ডের মত কথা যেন সুরের বেগে উপচিয়ে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথের লিপিকা ছাড়া এই রকম গদ্য রবীন্দ্রনাথেও আর নেই।

দ্বিতীয়ত, ব্যঞ্জনাটাই শুধু গীতিমুখর নয়—ধ্বনিটাও। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যকে অন্য কাঠামোতে ফেল্‌লে তার বিশেষ রূপটা নষ্ট হয়। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে কুমারসম্ভবের একটা শ্লোক তাঁর মনে অপূর্ব ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছিল কিন্তু শ্লোকটির অনুবাদের সংগে সংগে সে রস যেন কর্পূরের মত উবে গেল। একদিকে গীতিময়তা অন্যদিকে ধ্বনিময়তা অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের বৈশিষ্ট্য। উমার রূপকল্পনায় কালিদাস লিখছেন "সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব"—কিশোরী উমার হাঁটার মধ্যে নৃত্যসীর পদবিক্ষেপই যেন সূচিত হয়। অবনীন্দ্রনাথে গদ্যের মধ্যে এই artless grace-এরই মহিমা।

অন্যদিকে অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের ভাবাদর্শটা কি? অবনীন্দ্রনাথের সমগ্র মনটা যেন রূপকথার কেমিক্যাল লেবোরেটারী—বাহিরের ইতিহাসের সত্য তার জাঁকজমকের বাহার

রেখে রূপকথার শাশ্বত প্রাণময়তায় উত্তীর্ণ হয়েছে। বস্তুর ভার গেছে কেটে—সে যেন কবির আকাশচারী কল্পনা। রিয়্যালিজম যখন আমাদের জারকশক্তির রসে স্বমীকৃত হয়ে যায় তখনই তার মূল্য—না হলে রিয়্যালিজম আমাদের স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারকে খোঁচা দিতে থাকে। মানুষের সমগ্র সভ্যতার মূল সূত্রই হল যে যাকে intellect দিয়ে গ্রহণ করছি emotion দিয়ে তাকে নিজের করে নিচ্ছি। এই intellectual acceptance এবং emotional assimilation-এর দ্বিমুখী ধারা যেন সভ্যতার প্রাণপ্রবাহিনী গংগা। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যে এই সত্যের রূপকথার রূপই পাই, রূপকথাই শাশ্বত কেননা হালের রিয়্যালিজম্ তার মধ্যে সাহিত্য-সার্কাসের মল্লগিরি করতে আসেনা। এই যে কালোত্তীর্ণ সাহিত্যের রূপময়তা, যার মধ্যে অখণ্ড কালের রূপ বিধৃত হয়ে আছে, অবনীন্দ্রনাথের গদ্যে তারই পরিচয়। রূপকথার মধ্যে গতি, বিস্তৃতি না থাকতে পারে—কিন্তু তাতে লীলা আছে, গভীরতা আছে, একটা বিহ্বল স্বপ্নময়তার অদৃশ্য পদসঞ্চার অবনীন্দ্রনাথের গদ্যে একটা গভীর প্রশান্তির মীড় দিয়েছে। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যে সে-মীড়ের রেশ কান পেতে শুনতে হয়। বস্তুতপক্ষে ভারতীয় সাধনার এই যেন গোড়ার কথা।

ভারতীয় সাধনার মধ্যে একটা বৈরাগ্যের দিকে প্রবল ঝোঁক দেখা যায়, ভারতীয় সংগীতের মধ্যে এই রূপেরই প্রাধান্য। নবারুণের রঙের ইন্দ্রধনুচ্ছটার মধ্যে ভারতীয় গুণী পাশ্চাত্য জীবনের উদ্দামতা দেখেনি, এই প্রভাত বেলার রূপ প্রকাশ পেয়েছে ভৈরবীতে, যার গোড়াকার ব্যঞ্জনাই হল একটা নিষ্করুণ বৈরাগ্য, কর্মবিমুখ প্রশান্তি। দুপুরের নিশ্চেষ্ট অলসমনের যে স্বপ্ন-বুনুনি তাই যেন রূপ পেয়েছে আমাদের সারঙ রাগিণীতে, আর সন্ধ্যার মধ্যে যে-একটা সকরুণ বিষাদময়তা আছে তা রূপ পেয়েছে পূরবী, মূলতানীতে, আর রাত্রির যে-ধ্যানগম্ভীর প্রশান্তি তার সার্থক রূপায়ণ মালকোষে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের মূল সুরটাই যেন এই ছেড়ে যাওয়ার মধ্যে—রবীন্দ্রনাথ যতই বলুন 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়', আসলে রবীন্দ্রদর্শনই হল বৈরাগ্যের দর্শন। জীবনের ক্লান্ত অপরাহ্নে তাই রবীন্দ্রনাথের কাছে এতদিনের কাব্যসাধনা একেবারে অর্থহীন আবর্জনার মত পরিত্যাজ্য মনে হয়। "শেষ লেখার" একটা কবিতায় আছে—

বাণীর মূরতি গড়ি
একমনে……
বিস্মৃত স্বর্গের কোন
উর্বশীর ছবি
ধরণীর চিত্তপটে
বাঁধিতে চাহিয়াছিল
কবি
তোমার বাহন রূপে

ডেকেছিল
চিত্রশালে যত্নে রেখেছিল
কখন সে অন্যমনে গেছে ভুলি
আদিম আত্মীয় তব ধূলি
অসীম বৈরাগ্যে তার দিক্-বিহীন পথে
তুলি নিল বাণীহীন রথে।
এই ভালো বিশ্বব্যাপী ধূসর সম্মানে
আজ পংগু আবর্জনা
নিয়ত গঞ্জনা
কালের চরণক্ষেপে পদে পদে
বাধা দিতে জানে
পদাঘাতে পদাঘাতে জীর্ণ অপমানে
শান্তি পায় শেষে
আবার ধূলিতে যবে মেশে।

এই যে ধূলিতে মেশা—dust unto dust—ভারতীয় সাধনার এই যেন চরম পরিণতি।

শুনেছি অবনীন্দ্রনাথ নাকি ছবি আঁকা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন, ছোট ছোট পুতুল গড়েই সময় কাটাতেন, ক্ষান্তবর্ষণ শারদাকাশের মত একটা শুভ্র পূর্ণতা তাঁর জীবনটা গভীর অর্থময় করে তুলেছিল। সত্যের প্রকাশ নিরলংকৃত মহিমায়। উমা মহাদেবকে ভোলাতে গিয়েছিল রূপের ঐশ্বর্য নিয়ে কিন্তু পারেনি, দুরূহ তপশ্চর্যায় তার বাইরের রূপ সব খসে পড়ল, দৃষ্টি প্রদীপের আলোয় ঝলকিয়ে উঠে আত্মিক প্রশান্তির অনির্বাণ দীপ্তি তখনই সত্য। অবনীন্দ্রনাথ কি শেষ জীবনে গভীর সত্যের আহ্বানেই সাড়া দিচ্ছিলেন, যার জন্য এই পৃথিবীর দেনা পাওনা সব চুকিয়ে দিয়ে দিনের শেষের শেষ খেয়ায় পাড়ি জমাতে চেয়েছিলেন? রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমরা বলতে পারি

যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি
সে মুহূর্তে কিছু তব নাই
তাই তুমি পবিত্র সদাই।

জীবন-মৃত্যুর সীমান্তে বৈরাগ্যের শুভ্র পূর্ণতার গোধূলিলগ্ন নিঃশব্দ প্রহর গুণে কেটে গেল।

আধুনিক বাংলা কবিতা ও কয়েকজন কবি

শ্রীসুশীল ঘোষ—চতুর্থ বর্ষ, আর্ট্‌স্

আধুনিক কথাটা আপেক্ষিক না হলেও সহজবোধ্য নয়। এর সঠিক সংজ্ঞা নির্ণয়ে প্রমাদ ঘটবার সম্ভাবনা আছে। অধুনা যে কবিতা লেখা হচ্ছে তাকেই আধুনিক বলতে হবে,—একথার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না। প্রচলিত ঐতিহ্যের আওতা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন পথ প্রবর্ত্তনই আধুনিকতার লক্ষণ; এবং অধুনাকালে রচিত কবিতাতেও এই লক্ষণ না থাকলে তাকে আধুনিক বলে মেনে নেওয়া কোনরকমেই সম্ভব নয়। তবে আধুনিক কবিতাকে শুধু আধুনিক লক্ষণযুক্ত হলেই চলবে না, তাকে 'অধুনার'ও হতে হবে। কারণ আধুনিক কথাটা চিরন্তন নয়, একটা বিশেষ সময়ের (এই বিশেষ সময় ঐতিহ্যের পরমায়ুর উপর নির্ভর করে) মধ্যেই তা আবদ্ধ। তাই একসময় রবীন্দ্রনাথের যে সমস্ত কবিতাকে আধুনিক বলা হত, আজ তাদের সে-বিশেষণে বিশেষিত করা শক্ত। আর আধুনিকতার উপবীত জড়িয়ে আজকে যে-কাব্য কৌলীন্য দাবী করছে হয়তো বিশ বছর পরে তাকে কুলীন বলে অস্বীকার করা হবে। তখন আর একদল নতুন এসে তাদের জায়গা দখল করবে। ঐতিহাসিক বিচারে এটাই নিয়ম।

বাংলা কাব্যে এমন একটা সময় এসেছিল যখন সমস্ত দেশ রবীন্দ্রনাথের জয়গানে ছিল মুখর। তাঁর প্রভাব প্রতিটি তরুণের মজ্জায় মজ্জায়। প্রতিটি কবিতায় তাঁরই প্রতিধ্বনি। তাকে অস্বীকার করবার ক্ষমতা কারুরই ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তখন বাংলা সাহিত্যের সর্ব্বত্রই একচ্ছত্র সম্রাট। কিন্তু তবু ইতিহাসকে নিয়ম মেনেই চলতে হয়। তাই তাঁকেও অস্বীকার করবার সময় একদিন এলো। কোন এক শুভক্ষণে বেজে উঠলো বিপ্লবের শঙ্খ। এমনি সময় বাংলাদেশের কয়েকটি তরুণ মনে নতুন বীজ বপন করবার প্রেরণা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। এই প্রেরণার অঙ্কুরেই জন্ম নিল আধুনিক বাংলা কবিতা তথা আধুনিক বাংলা সাহিত্য। "আধুনিক বাংলা কবিতা ঠিক কোনখান থেকে আরম্ভ হয়েছে বলা শক্ত। প্রাচীন ও আধুনিকের মাঝখানে সবজায়গায় প্রাকৃতিক সীমানা খুঁজে পাওয়া যায় না। কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্ত্তী, এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী, কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি।"

কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর যুগ বাংলা সাহিত্যে—বিশেষ করে বাংলা কবিতায়—এক বিরাট সংশয় এবং সন্দেহের যুগ। তাই সাহিত্যের বাজারে আজকে বাংলা কবিতার দুঃসময়। অবশ্য খবর নিলে জানতে পারা যায় সমস্ত পৃথিবী জুড়েই কবিতার জীবনে এই সঙ্কট দেখা দিয়েছে। যে কারণেই হোক, নাটক এবং নভেলের দৌলতে সাধারণ পাঠকের মন সেদিকেই বেশী আকৃষ্ট। তাই কবিতা হয়েছে উপেক্ষিত। তার উপর আমাদের

ডেকেছিল
চিত্রশালে যত্নে রেখেছিল
কখন সে অন্যমনে গেছে ভুলি
আদিম আত্মীয় তব ধূলি
অসীম বৈরাগ্যে তার দিক্-বিহীন পথে
তুলি নিল বাণীহীন রথে।
এই ভালো বিশ্বব্যাপী ধূসর সম্মানে
আজ পংগু আবর্জনা
নিয়ত গঞ্জনা
কালের চরণক্ষেপে পদে পদে
বাধা দিতে জানে
পদাঘাতে পদাঘাতে জীর্ণ অপমানে
শান্তি পায় শেষে
আবার ধূলিতে যবে মেশে।

এই যে ধূলিতে মেশা—dust unto dust—ভারতীয় সাধনার এই যেন চরম পরিণতি।

শুনেছি অবনীন্দ্রনাথ নাকি ছবি আঁকা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন, ছোট ছোট পুতুল গড়েই সময় কাটাতেন, ক্ষান্তবর্ষণ শারদাকাশের মত একটা শুভ্র পূর্ণতা তাঁর জীবনটা গভীর অর্থময় করে তুলেছিল। সত্যের প্রকাশ নিরলংকৃত মহিমায়। উমা মহাদেবকে ভোলাতে গিয়েছিল রূপের ঐশ্বর্য নিয়ে কিন্তু পারেনি, দুরূহ তপশ্চর্যায় তার বাইরের রূপ সব খসে পড়ল, দৃষ্টি প্রদীপের আলোয় ঝলকিয়ে উঠে আত্মিক প্রশান্তির অনির্বাণ দীপ্তি তখনই সত্য। অবনীন্দ্রনাথ কি শেষ জীবনে গভীর সত্যের আহ্বানেই সাড়া দিচ্ছিলেন, যার জন্য এই পৃথিবীর দেনা পাওনা সব চুকিয়ে দিয়ে দিনের শেষের শেষ খেয়ায় পাড়ি জমাতে চেয়েছিলেন? রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমরা বলতে পারি

যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি
সে মুহূর্তে কিছু তব নাই
তাই তুমি পবিত্র সদাই।

জীবন-মৃত্যুর সীমান্তে বৈরাগ্যের শুভ্র পূর্ণতার গোধূলিলগ্ন নিঃশব্দ প্রহর গুণে কেটে গেল।

আধুনিক বাংলা কবিতা ও কয়েকজন কবি

শ্রীসুশীল ঘোষ—চতুর্থ বর্ষ, আর্ট্‌স্

আধুনিক কথাটা আপেক্ষিক না হলেও সহজবোধ্য নয়। এর সঠিক সংজ্ঞা নির্ণয়ে প্রমাদ ঘটবার সম্ভাবনা আছে। অধুনা যে কবিতা লেখা হচ্ছে তাকেই আধুনিক বলতে হবে,—একথার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না। প্রচলিত ঐতিহ্যের আওতা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন পথ প্রবর্ত্তনই আধুনিকতার লক্ষণ; এবং অধুনাকালে রচিত কবিতাতেও এই লক্ষণ না থাকলে তাকে আধুনিক বলে মেনে নেওয়া কোনরকমেই সম্ভব নয়। তবে আধুনিক কবিতাকে শুধু আধুনিক লক্ষণযুক্ত হলেই চলবে না, তাকে 'অধুনার'ও হতে হবে। কারণ আধুনিক কথাটা চিরন্তন নয়, একটা বিশেষ সময়ের (এই বিশেষ সময় ঐতিহ্যের পরমায়ুর উপর নির্ভর করে) মধ্যেই তা আবদ্ধ। তাই একসময় রবীন্দ্রনাথের যে সমস্ত কবিতাকে আধুনিক বলা হত, আজ তাদের সে-বিশেষণে বিশেষিত করা শক্ত। আর আধুনিকতার উপবীত জড়িয়ে আজকে যে-কাব্য কৌলীন্য দাবী করছে হয়তো বিশ বছর পরে তাকে কুলীন বলে অস্বীকার করা হবে। তখন আর একদল নতুন এসে তাদের জায়গা দখল করবে। ঐতিহাসিক বিচারে এটাই নিয়ম।

বাংলা কাব্যে এমন একটা সময় এসেছিল যখন সমস্ত দেশ রবীন্দ্রনাথের জয়গানে ছিল মুখর। তাঁর প্রভাব প্রতিটি তরুণের মজ্জায় মজ্জায়। প্রতিটি কবিতায় তাঁরই প্রতিধ্বনি। তাকে অস্বীকার করবার ক্ষমতা কারুরই ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তখন বাংলা সাহিত্যের সর্ব্বত্রই একচ্ছত্র সম্রাট। কিন্তু তবু ইতিহাসকে নিয়ম মেনেই চলতে হয়। তাই তাঁকেও অস্বীকার করবার সময় একদিন এলো। কোন এক শুভক্ষণে বেজে উঠলো বিপ্লবের শঙ্খ। এমনি সময় বাংলাদেশের কয়েকটি তরুণ মনে নতুন বীজ বপন করবার প্রেরণা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। এই প্রেরণার অঙ্কুরেই জন্ম নিল আধুনিক বাংলা কবিতা তথা আধুনিক বাংলা সাহিত্য। "আধুনিক বাংলা কবিতা ঠিক কোনখান থেকে আরম্ভ হয়েছে বলা শক্ত। প্রাচীন ও আধুনিকের মাঝখানে সবজায়গায় প্রাকৃতিক সীমানা খুঁজে পাওয়া যায় না। কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্ত্তী, এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী, কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি।"

কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর যুগ বাংলা সাহিত্যে—বিশেষ করে বাংলা কবিতায়—এক বিরাট সংশয় এবং সন্দেহের যুগ। তাই সাহিত্যের বাজারে আজকে বাংলা কবিতার দুঃসময়। অবশ্য খবর নিলে জানতে পারা যায় সমস্ত পৃথিবী জুড়েই কবিতার জীবনে এই সঙ্কট দেখা দিয়েছে। যে কারণেই হোক, নাটক এবং নভেলের দৌলতে সাধারণ পাঠকের মন সেদিকেই বেশী আকৃষ্ট। তাই কবিতা হয়েছে উপেক্ষিত। তার উপর আমাদের

দেশে বাংলা কবিতাকে যখন নতুন আভরণে সাজানো হলো, স্বভাবতঃই তখন সঙ্কট প্রকট হয়ে দেখা দিল।

আধুনিক বাংলা কবিতা আজ পর্য্যন্ত অনেকের মনে স্বীকৃতি পায়নি। তাঁরা এটাকে 'বেয়াড়া মনের বেয়াদবি' মনে করে থাকেন। নতুন কাব্যপ্রচেষ্টার উপর অপবাদের এই বোঝা চাপানোর রীতিটা নতুন নয়। এর কারণ, চিরাচরিত প্রথার অন্ধকূপ থেকে মুক্ত হয়ে সীমার শাসনকে লঙ্ঘন করে মানুষ যখনই কোন নতুন পথে ঝাঁক নেয়, সেই বাঁক নেওয়াটা সাধারণের মনে স্বীকৃতি পাওয়া তো দূরের কথা, তর্কের তুমুল ঝড় তোলে। অনুসন্ধান করলে ইতিহাসের ঝোলায় এর ভুরিভুরি প্রমাণ মিলবে। বহুদিন থেকে চলে-আসা পয়ারের শাসনকে অমান্য করে মধুসূদন বাংলা কাব্যে ছন্দের নতুন ধারা এনেছিলেন। এর অনিবার্য্য ফলস্বরূপ তাঁকে উপহার দেওয়া হলো "ছুছুন্দরীবধ কাব্য"। রবীন্দ্রনাথেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। আশ্চর্য্য নয় যে একসময় তাঁর রচনা শুধুমাত্র অর্থহীন হেঁয়ালী বলেই প্রতিপন্ন হয়েছিল। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে পুরোনোকে ভেঙ্গে ফেলে নতুন পথে চলার যে-বৈপ্লবিক প্রয়াস তার সুবিচারের একমাত্র উপায় হচ্ছে সময়। আজকের দিনে যে-কাব্য উপেক্ষিত, কালকের পাঠকমনের বিচারেই হয়তো তা খ্যাতির শিখরে পৌঁছে যাচ্ছে। মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথই আমাদের দেশে এর প্রমাণ রেখে গেছেন। তাই ঐতিহ্যের এই নজিরকে সম্বল ক'রে বিশ্বাস জাগে যে আধুনিক কবিতার প্রতি রক্ষণশীল মনের এই উন্নাসিকতা হয়তো একদিন প্রশস্তির রূপ নিয়ে দেখা দেবে।

রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্তি কথাটায় তর্ক উঠতে পারে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, রবীন্দ্রনাথ পড়ো না, রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করো। কাব্যে পুরোনো ঐতিহ্য ভেঙ্গে দিয়ে নতুন পথ তৈরী করাই সুস্থতার লক্ষণ। সমস্ত দেশের কবিতাতেই এই প্রচেষ্টা বিদ্যমান। তাই রবীন্দ্রনাথের 'সর্বজয়ী প্রতিভার একচ্ছত্র সাম্রাজ্যে' বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন নতুন কবি। কারণ 'সোনার তরী', 'গীতাঞ্জলি', 'বলাকা' প্রভৃতি কাব্যে রবীন্দ্রনাথের যে-একটা বিশেষ ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, অবস্থার তাড়নায় সে-ঐতিহ্যকে আর বেশীদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া চলে না। রবীন্দ্রনাথের লীলাসঙ্গিনীর কঙ্কণঝঙ্কার থেকে সরে এসে আধুনিক কবি পথ খুঁজে পেলেন অস্থির, অশান্ত, জিজ্ঞাসু জীবনে; প্রকৃতির বর্ণচ্ছটা থেকে রক্তমাংসের মানুষের নাড়ীর মধ্যে। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজের পূর্ব্ব ঐতিহ্য ত্যাগ করে সুর মেলালেন নতুনদের সঙ্গে। "গদ্যরীতির প্রচলন করে, কাব্যের বিশিষ্ট ভাষা বর্জন করে, কবিকুলপরিত্যক্ত 'অসুন্দর' প্রাকৃতিক ও মানবিক পরিবেশকে গ্রহণ করে, তিনি নিজের ঐতিহ্য নিজেই ভেঙ্গেছেন।" রবীন্দ্রনাথ শুধু শ্রেষ্ঠ কবি নন, তিনি শ্রেষ্ঠ আধুনিক। কবিতার এই নতুন সম্ভাবনাকে আশীর্ব্বাদ করে তিনি লিখেছিলেন—"নতুন যুগের মন নতুন রীতিতে লিখতে চাইবেই। সার্থকতা বিচার করবার সময় এখনও আসেনি এবং আমার পক্ষে এ কাজ অসম্ভব।.....অঙ্কুরকে দলিত করা অসম্ভব নয় যা কালে বনস্পতি হয়ে উঠতে পারে।"

আধুনিক বাংলা কবিতার মোটামুটি সংজ্ঞা নির্দ্দেশের পরও একটা কথা থেকে যায়। সেটা হচ্ছে রোমান্টিসিজ্‌ম্‌ বনাম বাস্তববাদ। আগেই বলেছি যে সময়ের দিক থেকে আধুনিক কবিতা মহাযুদ্ধপরবর্ত্তী। কাজেই মহাযুদ্ধের বিভীষিকায় মানুষের দুর্দ্দশা ও দুর্গতি অধিকাংশ কবির মনে গভীর রেখাপাত করে, যার ফলে তাঁদের কবি-সত্তা সামাজিক চেতনাবোধে সাম্যবাদী হয়ে উঠে। তাই তাঁরা কল্পনার গজদন্ত মিনার থেকে নেমে এসে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের কঠোর বাস্তবতার মধ্যে আবিষ্কার করলেন কাব্যের প্রস্তুতিকে। কিন্তু তবু একদল কবি হালের এই ফ্যাসানকে অস্বীকার করে বাংলা কবিতার স্বকীয় সুরকেই ধরে রাখলেন যার জন্য আজও প্রেমের কবিতার আঙ্গিনা থেকে আমাদের নির্ব্বাসন ঘটেনি। এমনি করেই গড়ে উঠেছিল মতামতের দুই শিবির—রোমান্টিসিজ্‌ম্‌ এবং বাস্তববাদ। এর মধ্যে কোনটি সৎ এবং মহৎ কাব্যের উপযোগী সে-প্রশ্নের আলোচনা করা এখানে সম্ভবপর নয়। তবে রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি দিয়ে এটুকু বললেই যথেষ্ট যে "কবিতায় বাস্তব অবাস্তব নিয়ে যারা তর্কে মেতে উঠে তারা মূল কথাটাই ভুলে যায়, সে হচ্ছে কাব্য। কবিতাকে নেপথ্যে রেখে নিছক বাস্তবের পালা রচনা করার মত সহজ কিছুই নেই—আব্রুর চেয়ে বেআব্রু সহজ যদি সৌন্দর্য্য ও সৌজন্যকে মনে করা যায় অনাবশ্যক। কিন্তু কবিতার পক্ষে কবিতা হওয়াই চাই—বাস্তব না হলেও চলে, হলেও ক্ষতি নেই।"

বিশ শতকের যুদ্ধোত্তর বাংলা দেশে বাস্তবতার প্রচণ্ড হিড়িকে বাংলা কবিতা থেকে রোমান্টিসিজ্‌ম্‌ প্রায় অন্তর্হিত হ'তে চলেছিল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং সমর সেন সাম্যবাদী স্বপ্নে সুর মেলালেন বুভুক্ষু মিছিলের পদাতিক পদক্ষেপে যাদের রক্তে গড়া হবে একদিন নতুন সমাজের বুনিয়াদ—

"উচ্চারিত ক্ষোভে তাই বিস্ফোরক দিন
ছাত্র আর মজুরের উজ্জ্বল মিছিলে
বিপ্লব ঘোষণা করে গেছে।
... ...
গলিত নখ পৃথিবীতে আমরা রেখে যাব
সংক্রামক স্বাস্থ্যের উল্লাস।" (পদাতিক)

বাস্তবতার হাহাকারে সমর সেনের দৃষ্টি থেকে মুছে গেছে স্বপ্নের সোনালী রঙ। পৃথিবীতে তিনি দেখেছেন শুধু ব্যর্থতার নগ্ন ছবি। রাত্রি তাঁর কাছে স্বপ্নের স্বাদ আনে না, বাতাস আনে না চামেলীর সৌরভ। তাই শুনি—

"আর রাত্রি
রাত্রি শুধু পাথরের উপরে রোলারের
মুখর দুঃস্বপ্ন" (নাগরিক)

তাই—

"রুদ্ধশ্বাস রাত্রির শেষে
জ্বলন্ত আগুনের পাশে আমাদের প্রার্থনা,
সমান জীবনের অস্পষ্ট চকিত স্বপ্ন।" (নাগরিক)

মর্ত্ত্যের দুয়ারে কবি দেখেছেন "শুধু দিন-যাপনের শুধু প্রাণ-ধারণের গ্লানি", জীবিকার কুৎসিত ছবি—

"মড়কের কলরোল নতুন শিশুর কান্না···
বৃদ্ধ শিশু আর বুদ্ধিহীন বৃদ্ধের দল
স্খলিত দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে কাঁদে আর হাসে
ট্রামে আর বাসে।" (কয়েকটি দিন)

তাই ক্লীব পঙ্গু সমাজ-জীবনের সমস্ত আবর্জ্জনা সরিয়ে কূপমণ্ডুকের বাসা ভেঙ্গে দিয়ে যে বিপ্লবের আবাহন, সেই কাম্য বিপ্লবের সংকেত কবি দেখতে পেয়েছেন অনাগত ভবিষ্যতে—

"দূরে পশ্চিমে
বিপুল আসন্ন মেঘে অন্ধকার স্তব্ধ নদী।" (কয়েকটি দিন)

প্রেমেন্দ্র মিত্র বাস্তববাদী হলেও প্রেমকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। সমর সেনের মত তিনি ঘোর বাস্তববাদী নন। সময় এবং পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে সাম্যবাদী কবিতা লিখলেও প্রেম এবং জীবনবোধের জিজ্ঞাসা তাঁর কবি-জীবনের দরোজায় ভিড় জমিয়েছে। একদিকে তিনি proletariatদের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে লিখেছেন—

"আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির
আর ছুতোরের মুটে মজুরের,
আমি কবি যত ইতরের!" (আমি কবি)

কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর হৃদয় বাস্তবকে ভুলে গিয়ে নীল আকাশের তলায় এসে দাঁড়ায়—

"তোমার নয়ন হতে
আজিকার নীল দিন
জীবনের দিগন্তে ছড়ায়।" (নীল দিন)

বিশ শতকের এই বিজ্ঞানী সভ্যতার দৌলতে মানুষের জীবনও বোধ হয় যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। পক্ষাঘাতে পঙ্গু এই স্থবির জীবনে আছে শুধু 'স্তিমিত হয়ে নিভে যাওয়া', শুধু জৈবিক পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাকা। তাই উদ্দাম জীবন-বোধে অস্থির কবির কণ্ঠে শুনি দুরন্ত আরণ্য উল্লাস—

"মৃত্যুর মৌতাতে বুঁদ হয়ে গেছি সব
রমণী ও মরণেতে ভেদ নাই!

হে-ইডি, হা-ইডি, হা-ই !
হে-ইডি, হা-ইডি, হা-ই !" (নীলকণ্ঠ)

সমরোত্তর বাংলা দেশে সমাজ-চেতনতা প্রায় সমস্ত কবিকেই আচ্ছন্ন করেছিল। পুরোনো জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করে সাম্যবাদী ভিত্তিতে নতুন সমাজ গড়ে তোলার দুর্ব্বার স্বপ্ন ছিল তাঁদের কবি-সত্তায়। কিন্তু তবু বাস্তবতার এই রূঢ় অধ্যায় থেকে আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয়ে রইলেন বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, জীবনানন্দ দাশ। তাঁরা হালের ফ্যাসানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে বাংলা কবিতার স্বকীয়তাকেই ধরে রেখেছিলেন, যে-স্বকীয়তার স্বাক্ষর দেখতে পাই রোমান্টিক প্রেমের কবিতায়। বৈষ্ণব কাব্য থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত এই রোমান্টিক সুর বাংলার আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে রয়েছে। আধুনিক কবিতায়ও সেই সুর বেজে উঠেছে সম্পূর্ণ নতুন করে। বলা যেতে পারে old wine in a new bottle.

অতীতেই সৌন্দর্য্যের বসবাস এই বিশ্বাস বুদ্ধদেব বসুর চেতনায় বাসা বেঁধেছে। অতীত জীবনের কোন এক অপূর্ব্ব মুহূর্ত্ত তাঁর অনুভূতিতে সুরভিত স্মৃতির রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে—

"ছোট ঘরখানি মনে কি পড়ে
সুরঙ্গমা ?
মনে কি পড়ে ?
জানালায় নীল আকাশ ঝরে
সারাদিনরাত হাওয়ার ঝড়ে
সাগরদোলা,
... ...
মনে কি পড়ে
তোমার আমার রক্তে ঢেউয়ের দোলা।"
(Do you remember an inn, Miranda)

মানবিক প্রেমের সত্তাকে প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে বুদ্ধদেবের কবি-হৃদয়ের নিবিড় উচ্ছলতা ঐকান্তিক হয়ে উঠে—

"আজো তো মনে হয় মেঘ যেন মেঘ নয়
কার চুল, কার চুল, কালো চুল, এলো চুল
কঙ্কাবতীর কালো এলো চুল। (কার চুল)

তারপর একদিন সময়ের নিয়মে চলার গতিতে অবাধ উদ্দামতা থেমে আসে। জীবনের জানালায় উঁকি দেয় প্রৌঢ়ত্বের প্রশান্তি। 'কঙ্কাবতী'র উচ্ছলতা নদী হয়ে মিশে যায় সময়ের সাগরে। তবু প্রেম অটলই থাকে—

"আজকে দেখছি আশা ঝরে গেছে,
বাসা ভেঙ্গে গেছে
আছে শুধু আছে ভাষা
আর আছে ভালোবাসা।" (পথের শপথ)

অবশেষে এই রূপান্তর একদিন শান্তির সঙ্গমে এসে পৌছলো—

"চিরন্তনে মুক্তি দাও ক্ষণিকার অম্লান ক্ষমায়
ক্ষণিকেরে করো চিরন্তন,
দেহ হোক মন, মন হোক প্রাণ, প্রাণে হোক মৃত্যুর সঙ্গম
মৃত্যু হোক দেহ প্রাণ মন।" (রূপান্তর)

বুদ্ধদেব বসুর প্রথম অধ্যায়ের উচ্ছলতা অজিত দত্তে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তাঁর কবিতা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের জীবনবোধের গভীর জিজ্ঞাসা, বিষ্ণু দের পাণ্ডিত্যের ভারাক্রান্তি অথবা সমর সেনের সমাজসচেতনতা থেকে সরে এসে আশ্রয় নিয়েছে এক শান্ত, নির্জন রূপকথার দেশে, যেখানে মাঠ সবুজ, আকাশ নীল, আকাশে লক্ষ তারার গান। সেই আকাশের সন্ধানে অজিত দত্ত লিখলেন—

"হে নির্জন সহচরী, আমি যাবো তোমাদের সাথে
স্বপ্নের অরণ্যপথে, সঙ্গীতের তারাভরা রাতে।"

কলকাতার নাগরিক পরিবেশে অজিত দত্তের কবি-মন হাঁপিয়ে উঠেছিল। 'ট্রামের চাকার নীচে আর্তনাদ শোনা যায় লোহা-দানবের'।

তাই তাঁর যৌবনের সত্তা প্রেমকে আবিষ্কার করলো—

"সাতডিঙ্গা মধুকর যে-দূর সাগরে দেয় পাড়ি,
একেলা সোনার কন্যা সেই দেশে অঘোরে ঘুমায়।
কুমারের উদাসীন মন
সেখানে বেঁধেছে বাসা।"

পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে অজিত দত্তও মাঝে মাঝে বাস্তববাদী হয়ে উঠেছেন। বিগত মহাসমরের যে-আলোড়ন ও সংঘাত পৃথিবীর উপর দিয়ে বয়েছিল তা হয়তো কবির মনে ছায়াপাত করে তাঁকে অলক্ষ্যে বাস্তবতার দিকে আকর্ষণ করেছে। তাই 'স্বপ্নের অরণ্য-পথ' এবং 'সঙ্গীতের তারাভরা রাত' থেকে সরে এসে কবি লিখলেন—

"বাজনা বাজে হুঙ্কারে আর বাজনা বাজে শঙ্খে
রথ নেমেছে উল্টোপথের জঞ্জালে আর পঙ্কে
অঙ্গীকারের দুন্দুভি ওই জগন্নাথের ভক্তের
চন্দনে আর চলবে না কাজ তিলক কাটো রক্তের।" (উল্টোরথ)

অতীতে প্রকৃতিতে এবং প্রেমে জীবনানন্দ দাশের অন্তর্মুখী চেতনা নিবিড় ও ঐকান্তিক হয়ে উঠেছে। বর্ত্তমানের ভাবনা থেকে অতীতের অনুভূতিতে তিনি অধিকতর আগ্রহশীল। প্রকৃতির পরিচিত রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ তাঁর রক্তের অণুপরমাণুতে এবং প্রেম তাঁর হৃদয়ের ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর বর্ণনায় আমাদের প্রতিদিনের প্রকৃতি এক অভিনব রূপ এবং স্বাদ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে—

"হয়তো এসেছে চাঁদ মাঝরাতে একরাশ পাতার পিছনে
সরু সরু কালো কালো ডালপালা মুখে নিয়ে তার
শিরীষের অথবা জামের,
ঝাউয়ের—আমের ;" (কুড়ি বছর পরে)

অথবা—

"হৃদয় ভরে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ণ ফেন্টের সবুজ ঘাসের গন্ধে,
দিগন্ত-প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে,
মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জ্জনের মত অন্ধকারে চঞ্চল বিরাট সজীব
রোমশ উচ্ছ্বাসে,
জীবনের দুর্দ্দান্ত নীল মত্ততায়।" (হাওয়ার রাত)

জীবনানন্দ দাশ জীবনের বহু পথ হেঁটে, বহু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে একমাত্র প্রেমকেই চিরন্তন সত্য বলে আবিষ্কার করেছেন—

"অনেক লবণ ঘেঁটে সমুদ্রের পাওয়া গেছে এ-মাটির ঘ্রাণ,
ভালোবাসা আর ভালোবাসার সন্তান
আর সেই নীড়,
এই স্বাদ—গভীর—গভীর! (পাখীরা)

কবির এই প্রেমিক সত্তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উর্দ্ধে অতীতের চেতনায় গড়ে তুলেছে হৃদয়ধর্ম্মী ভাবের এক শাশ্বত ইমারত—

"আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।" (বনলতা সেন)

রবীন্দ্রোত্তর যুগে রচিত কবিতার পাতা উলটিয়ে এটুকু অনায়াসে বলা যায় যে বলিষ্ঠ সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আধুনিক বাংলা কবিতা আপন স্বকীয়তা অর্জ্জন করে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরে উঠেছে। প্রচলিত ঐতিহ্যের আদেশকে অস্বীকার করে তার আন্দোলন সার্থক ধারায় প্রবাহিত এবং সাফল্যমণ্ডিত। সাহিত্যের দরবারে তার আসন পাকাপাকিভাবে কায়েম হয়ে গেছে। আকাশে রবি অস্তমিত ; তবু জেগে আছে কয়েকটি উজ্জ্বল তারা। "রবীন্দ্রনাথের বিরাট অর্কেষ্ট্রা থেমে গেছে ; তবু শুনতে পাচ্ছি কয়েকটা সুন্দর বাঁশীর সুর বা বেহালার ছড়ের টান।"

ইউরোপে মধ্যযুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং ধর্ম

শ্রীশিবনাথ রায়—পঞ্চম বর্ষ আর্ট্‌স্

ক্রিশ্চিয়ান চার্চের ইতিহাসের সংগে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন প্রাক্-রিফর্মেশন যুগে ক্যাথলিক্‌বাদই ছিল ইউরোপের ধর্মের প্রধান রূপ। মুখ্যতঃ এই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল বাস্তব ঐতিহাসিক ভিত্তির উপরে কেননা ইউরোপীয় সমাজের এক চরম দুর্দিনে ধর্ম গ্রহণ করেছিল তার রক্ষার ভার, তার সংহতি অটুট রাখবার দায়িত্ব। চতুর্থ এবং পঞ্চম খ্রীস্টাব্দে ইউরোপীয় সমাজ সম্মুখীন হয়েছিল প্রচণ্ড বর্বর আক্রমণের, মূলতঃ চার্চের উদ্যোগেই এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের বাঁধ গড়ে ওঠে হোলি রোমান সম্রাটদের সাহায্যে এবং সহযোগিতায়। বস্তুতঃ হোলি রোমান চার্চ্ এবং হোলি রোমান সাম্রাজ্যের আদর্শ প্রায় অভিন্ন বলে বিবেচিত হতে পারে কেননা চার্চ্ সেখানে চেষ্টা করেছে ক্রিশ্চিয়ানিটির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ঐক্য প্রচার করতে, আর হোলি রোমান এম্পায়ার চেষ্টা করেছে সেই আদর্শকে বাস্তব রূপ দিতে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সেই অখণ্ড চেতনাকে প্রতিষ্ঠা করতে।

সমাজের সংহতি এবং ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য এই সময় বিশেষ একটা সামাজিক ব্যবস্থা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল যা ফিউডাল ব্যবস্থা নামে পরিচিত। কৃষিভিত্তিক মধ্যযুগীয় ক্যাথলিক্-চার্চ্ও অতি স্বাভাবিকভাবেই এই নূতন পরিবেশে গড়ে ওঠে। চার্চ্ই হয়ে দাঁড়ায় ফিউডালিজমের প্রধান ভিত্তি এবং ধনতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রধান শত্রু। যখন সামাজিক অচলায়তনে ফাটল ধরল এবং সমাজ গ্রহণ করল উৎপাদনের এক নূতন ধরণ তখন ক্যাথলিক চার্চ্‌কেও পিছিয়ে পড়তে হল কেননা ক্যাথলিক্‌বাদ ছিল প্রধানতঃ সামন্তযুগেরই ধর্ম, নবোদ্ভিন্ন ধনতন্ত্রের দাবী মিটাবার ক্ষমতা হয়ে গিয়েছিল এর নিঃশেষিত। বাস্তব উদাহরণের আশ্রয় গ্রহণ করলে সামন্ততন্ত্র এবং ক্যাথলিক্‌বাদের সংযোগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভূমিদাস এবং গুটিকতক সামন্ত নিয়ে বিভক্ত যে-সমাজ তার প্রতি ক্যাথলিক চার্চের ছিল অসীম নিষ্ঠা। বিপুল উৎসাহ নিয়ে সামন্ততন্ত্রকে সে সমর্থন করেছে, পরিবর্তে পেয়েছে মোটা প্রতিদান এবং শোষণের অধিকার।

বিভিন্ন ধরণের ছিল এই শোষণ। প্রথমতঃ অর্থলোভে পোপ্‌রা হস্তান্তর করতেন বিশপগিরি সর্বোচ্চমূল্যে। প্রার্থীদের যোগ্যতা বিচারের কোন বালাই না থাকার দরুণ এ ব্যবস্থার ফল কি ধরণের হতে পারে তা সহজানুমেয়। পোপেদের বিপুল বিলাস এবং ব্যয়ভার মেটানোর জন্য আরো কয়েকধরণের কর দিতে বাধ্য ছিল সমাজ, পোপের যুদ্ধের ব্যয়ভারও বহন করতে হত সমাজকে। এই ধরণের অপ্রত্যাশিত ব্যয় নির্বাহ করা হত tithe নামক কর বসিয়ে। এ ছাড়া annate নামে আরেক ধরণের করেরও অধিকারী ছিল চার্চ্। নূতন চার্চ্-কর্মচারীর

কাছ থেকে তার আয়ের বিশেষ একটা মোটা ভাগ আদায় করে সেই টাকা থেকে স্থানীয় চার্চের প্রয়োজন মেটানো হত। এ ছাড়া চার্চের উচ্চপদাধিকারী কোন কর্মচারী সফরে বেরোলে তার ব্যয় নির্বাহের জন্য Procuration বলে এক কর বসানো হত, প্রায়শঃই এই কর্মচারীরা সংগৃহীত অর্থের সব ভাগটাই দখল করে নিতেন। আবার, কোন চার্চ্-কর্মচারীর পদ শূন্য থাকলে যতদিন পর্যন্ত নূতন কোন কর্মচারী নিযুক্ত না হতেন ততদিন পর্যন্ত তার প্রাপ্যে অধিকারী ছিলেন পোপ নিজে। এ ছাড়া বিবাহ, চুক্তি ইত্যাদি ব্যাপারে চার্চের আইন অমান্য করা হয়েছে সন্দেহ করা হলেই অপরাধীরা দিতে বাধ্য ছিল মোটা জরিমানা। এ ছিল ফিউডালযুগে চার্চের শোষণের একটা বিশেষ দিক। অপরাপর দিকেও আমরা দেখি একই প্রবৃত্তির পুনরাবৃত্তি। সামন্তযুগের লুটপাট মারামারিতে ক্যাথলিক চার্চের অসীম আগ্রহ। আধ্যাত্মিকতার উঁচু মিনার পরিত্যাগ করে চার্চ্ তখন সামন্তদের মতই তাদের এক বিশিষ্ট সহযোগী মিত্রতে পরিণত হয়েছে। এই সহযোগ ছিল অবশ্য অপরিহার্য কেননা বহু পাদ্রী এবং বিশপেরা বড় বড় সামন্তদের কাছ থেকে ভূমি গ্রহণ করে এবং সম্পত্তিবান মোক্ষকামী মক্কেলদের কাছ থেকে কিছু অংশ আদায় করে নিজেরা সামন্ততন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ইউরোপে চার্চ্ই ছিল সবচেয়ে বড় জমিদার, দেশের বেশীর ভাগ জমিই ছিল চার্চের হাতে। ফিউডাল প্রথায় পাদ্রীরা এইসব জমির চাষীদের শোষণ করতেন। ফলে চার্চ্ এবং ফিউডাল ব্যবস্থার মধ্যে একটা অখণ্ড ঐক্য দেখা যায় যার প্রতিফলন দেখি চার্চের গড়নে। রাজার মত সমস্ত চার্চ্ সংগঠনের উপরে পোপ, তাঁর নীচে সামন্তদের মতো বিশপেরা, বিশপদের নীচে ছোটোখাটো জমিদারদের মতো সাধারণ চার্চ্-কর্মচারীরা, আর সব নীচে চার্চের নিজস্ব কৃষককুল। তাছাড়া জমিদারদের মতো চার্চেরও নিজস্ব বিচারালয় ছিল এবং নিজ সীমানার ভিতরে যে সকল অনাচার অনুষ্ঠিত হত তার বিচার হত এইসব আদালতে। জমিদারদের মত চার্চ্ও সকল রকম ফিউডাল সুযোগ সুবিধার অধিকারী ছিল।

সাধারণ দৃষ্টিতে পুরোহিত এবং সামন্তশ্রেণী একই শোষকশ্রেণীভুক্ত হলেও এই দুটি শক্তির মধ্যে আদর্শ নৈতিক পার্থক্যও ছিল যথেষ্ট। ক্ষমতার দাবী নিয়ে চার্চ্ এবং হোলি রোমান সাম্রাজ্যের ভিতরে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চলে। চার্চ্ দাবী করেছিল আত্মিক ভিত্তির উপরে তার শক্তির প্রতিষ্ঠাবলে তার অধিকার রাষ্ট্রের চেয়েও বেশী কেননা আত্মা হচ্ছে দেহের প্রাণ, যার অবর্তমানে দেহ মৃত। অন্যদিকে সাম্রাজ্যশক্তি দাবী করেছিল নিজের প্রভুত্ব এই যুক্তিতে যে চার্চের চরম দুর্দিনে রাষ্ট্রশক্তিই খ্রীস্টধর্মের রক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল, সেদিন খ্রীস্টানধর্মকে রাষ্ট্রশক্তি রক্ষা না করলে তা লুপ্ত হয়ে যেত। রাষ্ট্রশক্তি নিজের দাবীর সমর্থনে বাইবেল এবং পুরানো ঘটনা থেকে সাক্ষ্যসাবুদ উপস্থিত করতে কসুর করেনি। সার্বভৌমত্বের দাবী নিয়ে চার্চ্ এবং এম্পায়ারের মধ্যে এই সংগ্রামে মধ্যযুগের ইতিহাস কলংকিত হয়ে রয়েছে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট বিভেদ থাকলেও সাধারণ লোককে শোষণের ব্যাপারে পুরোহিত এবং সামন্তরা ছিল অভিন্ন।

ফিউডাল যুগে সমাজের প্রকৃতিগত বিরোধিতার জন্য সে-যুগে ব্যবসায় বাণিজ্য সহজে গড়ে উঠতে পারেনি। প্রথমতঃ জমিদারদের দ্বারা শাসন ক্ষমতা অধিকৃত হওয়ায় দেশে এক-শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারেনি যা শিল্পব্যবসায়ের প্রসারের পক্ষে অপরিহার্য ছিল। দ্বিতীয়তঃ ছিল মূলধনের অভাব। তৃতীয়তঃ যে সকল শিল্প তখন গড়ে উঠছিল তার অভাব ছিল এক বৃহৎ দিনমজুরের দলের। চতুর্থতঃ চলাচলব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা সমস্ত ইউরোপময় এক বিশাল বাজার সৃষ্টির সম্ভাবনাকে প্রতিহত করে। সুতরাং অপরিহার্য কারণেই মধ্যযুগের শিল্প এবং ব্যবসায়ের বিশেষ প্রসার ঘটেনি। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমূহের সমবায়ে সংগঠিত ছিল মধ্যযুগের আর্থিক সমাজ। ধীরে ধীরে কারিগরদের হাতের কাজের বিস্তারের সংগে এই সমাজ রূপান্তরিত হতে থাকে। চাষের কাজের পাশে হাতের কাজ অর্থাৎ কুটীরশিল্পেরও বিশেষ একটা স্থান ফিউডাল সমাজে ধীরে ধীরে দেখা যায়। কুটীরশিল্পগুলিকে কেন্দ্র করে যে ছোট ছোট শহর গড়ে ওঠে তাদের উৎপন্নজাত দ্রব্য কৃষিদ্রব্যের সংগে কেনাবেচার মাধ্যমে মধ্যযুগের বাজার সম্প্রসারিত হতে থাকে।

নবম দশম শতাব্দীতে ইউরোপে ব্যবসায় বাণিজ্যের বিশেষ প্রসার ঘটেনি কেননা ফিউডাল ব্যবস্থার দ্রুত প্রসারের ফলে যে-শান্তি সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকলে ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার হতে পারে তা অবর্তমান ছিল। ইউরোপের এই স্থবির অর্থনৈতিক অবস্থায় পরিবর্তন আসতে থাকে একাদশ শতাব্দী থেকে। প্রধানতঃ তিনটি ধারায় এই পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে—ভৌগলিক আবিষ্কারের ফল হিসাবে প্রাচ্যের দেশগুলির সংগে ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসারে, ইউরোপের কুটীরশিল্পের অগ্রগতিতে, এবং কৃষির উন্নতির জন্য পতিত জমি উদ্ধারের প্রচেষ্টায়। এই তিনটি ধারার ঘাত প্রতিঘাত ইউরোপের অর্থনৈতিক কাঠামোতে এনেছে প্রচণ্ড আলোড়ন এবং তিনটি শক্তিশালী শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে—ব্যবসায়ী এবং ছোট কারিগরদের সমবায়ে গঠিত বুর্জোয়াদের, একদল দক্ষ কারিগরের, এবং অপর একদল দিনমজুরের। দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতকে ব্যবসায় বাণিজ্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ঘটে—ক্রুজেডের ফলে এবং এই সময়ে ভেনিস, জেনোয়া, পিসা এবং ফ্রান্সের ও জার্মানীর কতকগুলি শহর ছিল বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। সমুদ্র তীরবর্তী শহরগুলি থেকে ব্যবসায় বাণিজ্য দেশের ভিতরে সম্প্রসারিত হতে থাকে। কৃষির উপরে এর প্রভাব প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়—শহরের ক্রমবর্ধমান কৃষিজ চাহিদা মেটানো পুরানো ব্যবস্থায় অসম্ভব হয়ে পড়ছিল—এই চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল দুই উপায়ে, হয় উন্নতধরণের চাষের উপায় অবলম্বন করে অথবা মোট কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়িয়ে। এর মধ্যে প্রথমোক্ত উপায় গ্রহণ ফিউডাল ব্যবস্থায় ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই দ্বিতীয় ধরণের প্রচেষ্টাই ইউরোপে ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়েছিল, এর ফলে কৃষির উন্নতির সংগে কৃষিজ দ্রব্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে থাকে, সংগে সংগে জনসংখ্যাও বর্ধিত হতে থাকে। ইউরোপের অর্থনৈতিক পরিবর্তনে এ দুটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মধ্যযুগের এই অর্থনীতির ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে তিনটি বিশেষ প্রকৃতি দেখা যায়, এক—কমিউন এবং

গিল্ড ভিত্তিক শিল্পসমাজ এবং দ্বিতীয়তঃ কৃষিভিত্তিক কতকগুলি দেশ যেগুলি কাঁচামাল সরবরাহ করত ; এ ছাড়া ছিল কতকগুলি শহর যথা ভেনিস এবং ফ্লোরেন্স যেগুলি ব্যবসায়ীদের পুঁজি সরবরাহ করে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল।

ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার এবং শিল্পের বিস্তারের সংগে সংগে ধর্মেরও দৃষ্টিভংগী পরিবর্তিত হতে থাকে। এ যুগের ধর্ম এবং অধ্যাত্মসাধনার তাই পরিচয় বোঝা যায় না অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পরিচয় না জানলে কেননা মানুষের চিন্তা ভাবনা, দর্শনবিজ্ঞান প্রভাবিত হয় সামাজিক সম্বন্ধ এবং উৎপাদনের বিশেষ রীতির দ্বারা। ক্যাথলিক্‌ধর্মকে আমরা দেখি ফিউডাল ব্যবস্থার সমর্থনে এবং ধনতন্ত্রের অগ্রগতিরোধের সহায়তায়। একাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত যে-পরিবর্তন ঘটতে থাকে ইউরোপীয় অর্থনীতিতে, ক্যাথলিক চার্চ্‌ তাথেকে আপনাকে বিযুক্ত রাখতে পারেনি তাই চার্চের ভিতরে গড়ে উঠতে থাকে পরস্পরবিরোধী কয়েকটি অভিমত এই নবাংকুরিত ধনতন্ত্র সম্বন্ধে। প্রথম দৃষ্টিতে ধনদৌলৎকে অসীম ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হত আত্মিকমুক্তির বিঘ্নস্বরূপ বলে, দ্বিতীয় মতাবলম্বীরা এই নূতন সামাজিক পরিবর্তনের দিকে নজর দেবার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না কেননা চার্চের এ সম্বন্ধে কোন কর্তব্য নেই বলেই তাঁরা মনে করতেন, আর তৃতীয় দলে যাঁরা ছিলেন তাঁরা এই নূতন অর্থনীতিকে চার্চের অধিকারে আনতে সচেষ্ট ছিলেন কেননা তাঁদের ধারণা ছিল মোক্ষ সাধনা মানুষের লোভ এবং অর্থতৃষ্ণার ভিতর থেকেই জেগে উঠবে। এই মতে যাঁরা বিশ্বাস করতেন তাঁরা ধর্মজীবন থেকে বিচ্যুত সকলপ্রকারের পরিশ্রমকে মুক্তির বিঘ্নস্বরূপ বলে মনে করলেও ভগবদ্‌ভক্তির দ্বারা সেগুলোর কলংকমোচন সম্ভব বলে মনে করতেন।

প্রথমোক্ত মতে যাঁরা বিশ্বাস করতেন তাঁরা প্রচার করেছিলেন একমাত্র সমাজ সংসার পরিত্যাগ করে বাণপ্রস্থ নিয়ে ঈশ্বর আরাধনাতেই মোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভব, তাঁদের ব্রত সন্ন্যাস এবং ত্যাগের। ভোগের দ্বারা মুক্তি নেই—এই তথ্যই তাঁরা বিশেষভাবে প্রচার করেছেন—তাই মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে তাঁদের কাছে মনে হয়েছে রক্তলোলুপ হিংস্র হায়নার সংগ্রাম বলে—ব্যবসায় বাণিজ্যের ভিত্তি লোভ, তাই ঈশ্বর ব্যবসায়ী মহাজনদের কাছ থেকে বহুদূরে সরে গেছেন বলে তাঁরা বিশ্বাস করতেন। ইহজগতের সকল আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়াই একমাত্র ধর্মের পথ এই ধারণা তাঁদের ছিল।

যাঁরা ইহজগতের সমস্যা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করতেন ধর্মের মধ্যে তার স্থান নেই বলে, তাঁরা বিশ্বাস করতেন ইহজগতের সকল অন্যায়ের নিরসন হবে স্বর্গে, তাই এজগতে ন্যায়বিচার আশা করা অন্যায়। হব্‌স্‌ এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন তাই তিনি লিখেছিলেন 'অত্যাচারিতরা বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে তাদের দুঃখ দূর করবার চেষ্টা না করে যেন ঈশ্বরের বিচারে আস্থা রাখে, তিনিই অন্যায়ের যোগ্য প্রতিবিধান করবেন'।

তৃতীয় মতই চার্চে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এই মতে যাঁরা বিশ্বাস করতেন তাঁদের ধারণানুযায়ী সমগ্র ইউরোপীয় সমাজ ছিল এক বৃহৎ ক্রিশ্চিয়ান কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌, তাই

মানুষের জীবনের ঐহিক এবং পারত্রিক লোকের সকল দিকই নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার চার্চের আছে, কেননা বৃহৎ একটি কারখানা যেমন অচল হয়ে যেতে পারে ক্ষুদ্র একটি যন্ত্রের দোষে তেমনি সমস্ত সমাজের মোক্ষসাধনা ব্যাহত হতে পারে একটি মানুষের সামান্য চরিত্রচ্যুতিতে। মানুষের ভবিষ্যৎ ভগবান কর্তৃক পরিকল্পিত হয়ে আছে—জীবনের সুখলাভ সম্ভব একমাত্র সেই সৃষ্টিকর্তাকে জানবার চেষ্টাতে। স্তরে স্তরে বিভক্ত মানবজীবন তাই একই সূত্রে বিধৃত আর এই জীবন সম্বন্ধে চূড়ান্ত কথা বলবার একমাত্র অধিকার চার্চের। আত্মিক সাধনাই যেখানে মুখ্য ব্যাপার সেখানে বর্হিজীবনের প্রচেষ্টাকে অসংগত বলে মনে করলেও মধ্যযুগের সমন্বয়ী দর্শনে তাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। ধর্ম নিয়ে যাবে জীবনকে তমসা থেকে আলোকের দিকে, নীচের থেকে উপরের দিকে মধ্যবর্তী ধাপগুলোকে এড়িয়ে না গিয়ে। সমাজ হচ্ছে বিভিন্নশ্রেণীতে বিভক্ত ব্যক্তির সমষ্টি এবং তাদের প্রত্যেকের কর্তব্য পৃথক পৃথক এবং তাদের সামাজিক প্রয়োজনও অপরিহার্য এবং এক অভিন্ন উদ্দেশ্য তাদের পরিচালনা করছে। এই ধরণের দর্শনে স্বাভাবিক সমর্থন রয়েছে ফিউডালতন্ত্রের। শোষণের সকল অধিকার এবং মুষ্টিমেয় লোকের বিশেষ সুবিধাকে ধর্ম এইভাবে এক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার বর্মে রক্ষা করেছে। এই মতে তাই দেখি শ্রেণীমৈত্রীর আদর্শ যা স্পষ্টতঃ ফিউডাল শোষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত। এই মতবাদ প্রচার করেছে কৃষকেরা যেন তাদের ভাগ্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে এবং তাদের অধিকারের সীমা লংঘন করতে চেষ্টা না করে, জমিদাররা যেন প্রজাদের বেশী উৎপীড়ন না করে, ব্যবসায়ীদের জীবনধারণের জন্য যেটুকু দরকার তার চেয়ে অধিক উপার্জনের চেষ্টা করলে তা নিন্দাভাজন হবে। এইভাবে ধর্ম বাধা দিয়েছে সকল সম্ভাব্য পরিবর্তনের। এর আদর্শ অনুসারে বিধিপ্রদত্ত সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি ব্যক্তির স্থান সুনির্দিষ্ট এবং প্রত্যেকের কর্তব্য শ্রেণীহিসাবে অপরের থেকে স্বতন্ত্র এবং সামাজিক মঙ্গল নির্ভর করবে শ্রেণীবিশেষ স্বকীয় কর্তব্য যেভাবে সম্পন্ন করবে তার প্রত্যক্ষ অনুপাতে।

এই সামাজিক দর্শন নিরাবলম্ব অবস্থায় গড়ে ওঠেনি, এর পিছনে ছিল বাস্তব তাগিদ কেননা ফিউডালতন্ত্রের ভূমি ব্যবস্থার সংরক্ষণের প্রয়োজনই এইরকম দর্শনের জন্মদান করেছিল। ধনতন্ত্রের বিকাশ সৃষ্টি করছিল ফিউডালতন্ত্রের ধ্বংসের সূচনা, তাই চার্চ্‌কেও তার বিরোধিতায় অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল। তাই অর্থোপার্জনের সকল প্রচেষ্টাকেই চার্চ্‌ নীতিবাদের মাপ-কাঠিতে বিচার করতে চেষ্টা করেছে এবং ব্যবসায়ীদের কেন্দ্র করে নূতন যে-শ্রেণী গড়ে উঠছিল তাকে সহজভাবে স্বীকার না করে তাদের চেষ্টাকে বিঘ্নিত করেছে। পুঁজিসংগ্রহের জন্য সুদে টাকা নেওয়ার রেওয়াজকে কঠোরভাবে নিন্দা করেছে, ব্যবসায়ী সমাজের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মধ্যে চার্চ্‌ কোন মংগলের সূচনা দেখেনি, সামাজিক ধনবৃদ্ধির সম্ভাবনার ভিতরে সে দেখেছে অকল্যাণের ছায়া। চার্চ্‌ প্রচার করেছিল লোভ করা অন্যায়, দারিদ্র্য অতি মহান কেননা তা স্বর্গপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ত্বরান্বিত করে। পরের ধনের দিকে কুনজর দিলে মুক্তির কোন সম্ভাবনা নেই। তাই প্রচারিত হয়েছিল নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপারও এ পৃথিবীতে

ঘটতে পারে, অলৌকিক বলেও কোন কিছু নেই কিন্তু স্বর্গের দরজা কখনো কৃপণের জন্য খুলবেনা।

সামাজিক এই নীতিবাদের মাধ্যমে মধ্যযুগের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা হলেও বাস্তবঘটনাকে খানিকটা চার্চ্ও স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। চার্চের বড়ো বড়ো কর্তারা আর্থিক প্রয়োজনের দিকটাকে একেবারে অস্বীকার করতে পারেননি তাই অর্থগৃধ্নুতার সংগে সামাজিক কল্যাণবোধের একটা সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টা দেখা যায় মধ্যযুগের শেষ দিকে। আর্থিক ব্যাপারে চার্চ্ও যথেষ্ট লিপ্ত ছিল, রোমের পোপের আয় ছিল যে কোন বৃহৎ রাজ্যের আয়ের চেয়েও বেশী। দান্তে সুদখোর মহাজনদের নরকে পাঠাবার ওকালতী করলেও তাদের রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিশেষ একশ্রেণীর সেবক বলে একজন পোপ তাদের সামাজিক উপযোগিতা স্বীকার করে নিয়েছেন। একসময়ে ইংল্যাণ্ডে আর্চ্বিশপ কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত এবং বিতাড়িত একদল লম্বার্ড ব্যাংকারের শাস্তি বাতিল হয় রোমের পোপের আদেশে। এছাড়া পাদ্রীরা পর্যন্ত সুদ নিয়ে টাকা ধারে খাটাতেন —এমন কি সরকারীভাবে ব্যবসায় বাণিজ্য নিন্দার্হ কাজ বলে বিবেচিত হলেও বহু পাদ্রীর নিজস্ব ব্যবসায় ছিল এবং মোক্ষচিন্তার সংগে সংগে তাঁরা অর্থাগমের কথাও ভাবতেন। প্রকৃতপক্ষে রিফর্মেশন আন্দোলন যখন আরম্ভ হয় তখন চার্চের এই আর্থিকজগতের সংগে সংযোগজনিত নৈতিক অধঃপতনই সমালোচনার মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত ধনতন্ত্রের বিকাশের পথে ধর্মের যে-আবর্জনা পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল তা দূর করে দিয়েছিল রিফর্মেশন আন্দোলন।

ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কেও চার্চের দৃষ্টিভংগী ছিল অনুরূপ সংরক্ষণশীল। যদিও চার্চ্ বলেছে জমিদাররা যেন সার্ফ্দের উপর সদয় ব্যবহার করে, কেননা তারা তাদের সন্তানস্বরূপ এবং দাসত্ব থেকে তাদের মুক্তিদান অত্যন্ত পুণ্যের কাজ তবুও ফিউডাল ব্যবস্থার মূল প্রশ্নকে চার্চ্ আক্রমণ করেনি। নৈতিক দিক থেকে চার্চ্ মাত্র সংস্কারের পক্ষপাতী ছিল পুরানো ব্যবস্থা বজায় রাখবার জন্যই কেবল—যে-ব্যবস্থা বলেছে গরীবদের জন্ম বড়লোকদের সেবার জন্য, জমিদারা আর নাইট্রা যুদ্ধ করে সামাজিক ঐক্য এবং শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখবে আর পাদ্রীরা সমস্ত সমাজের পরিচালনা করবে কেননা তারা সমাজের মস্তিস্কস্বরূপ। ফিউডাল-তন্ত্রের সংগে চার্চের সংযোগ আরও স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় ইউরোপে সতেরো থেকে উনিশ শতকে যখন ধনতন্ত্রের দাবীতে সামন্ততন্ত্রের বিনাশ এবং ভূমি-দাসদের মুক্তি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তখন ক্যাথলিক চার্চ্ও সহযোগিতা করেছে মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামন্তশ্রেণীর। ধনতন্ত্রের নূতন দাবীতে যে-মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে উঠছিল বাস্তবক্ষেত্রে ধর্মের বাধা তার পূর্ণতা প্রাপ্তির পক্ষে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

জমিদারদের সংগে চার্চের শোষণ এবং সামন্ততন্ত্রের পক্ষে ক্যাথলিক চার্চের ওকালতী মধ্যযুগে এক প্রচণ্ড বিক্ষোভ এনে দিয়েছিল। এই অসন্তোষ কেবলমাত্র নূতন মধ্যবিত্তশ্রেণীর

মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা—এর প্রবাহ সমাজের সর্বনিম্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন এনে দিয়েছিল—এর প্রকাশ ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হলেও এ আন্দোলন ছিল মুখ্যতঃ অর্থনৈতিক। মধ্যযুগের ইতিহাসের বিশেষ ধারাই এই—মানুষের জীবনের সকলরকমের চিন্তাভাবনা, আকাংখা বিক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে ধর্মের ভিতর দিয়ে কেননা ধর্মই ছিল তখনকার জীবনের পটভূমিকা এবং পরোক্ষে তা ছিল তদানীন্তন সমাজব্যবস্থার বাস্তব প্রতিফলন। এই প্রজাবিদ্রোহগুলি ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র ইউরোপময়, এর মধ্যে ইংল্যাণ্ডে ওয়াইক্লিফ, ললার্ড্ এবং ওয়াট টাইলারের আন্দোলন, জার্মানীতে হাসাইট্, বুন্দ্শু এবং হান্স্ বমের আন্দোলন, ফ্রান্সের জাকেরীবিদ্রোহ এবং সুইজারল্যাণ্ডের কৃষকবিদ্রোহ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিদ্রোহগুলির স্বরূপ ছিল মোটামুটিভাবে অভিন্ন। সামন্তদের শোষণ এবং নিম্নবিত্তশ্রেণীর এই আন্দোলনগুলি তদানীন্তন সমাজব্যবস্থার ভাংগনের দিকটা স্পষ্ট দেখিয়ে দেয়—ভূমিহীন কৃষকদের মহাজন, চার্চ্ এবং জমিদার এই তিন শত্রুর কবলে পড়ে নাভিশ্বাস উঠেছিল—এ ছাড়া বেশীটাকার লোভে চাষের জমি ভেড়া চরাবার জন্য ইজারা দেওয়ার যে প্রথা জমিদারদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং অর্থগৃধ্নু মহাজনদের বেশী সুদে টাকা ধার দেওয়া ও তার অনাদায়ে চাষের জমি পর্যন্ত নীলাম করার প্রথা কৃষিসমস্যা আরো সংকটময় করে তোলে। এই আন্দোলনগুলি মুখ্যতঃ কৃষকবিদ্রোহ হলেও এর সংগে সহযোগিতা করেছিল ছোট কারিগরেরা। এদের মূল লক্ষ্য ছিল নিজেদের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা, জমিদারদের নিয়ন্ত্রণ থেকে ও নবাংকুরিত ধনিকতন্ত্রের চাপে ধ্বংসোন্মুখী ব্যবস্থার পূর্ণপ্রতিষ্ঠা এবং সেহেতু অনেকটা প্রগতিবিরোধী। তবুও সামন্ততন্ত্রের বিরোধী আন্দোলন হিসাবে কারিগর এবং ব্যবসায়ীদের বিদ্রোহের মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

ব্যবসায়ীদের এবং কারিগরদের কেন্দ্র করে সমাজের অভ্যন্তরে যে এক নূতন শক্তি গড়ে উঠছিল তার সূচনা দেখা যায় সংস্কৃতিক্ষেত্রে ইউরোপীয় রেনেসাঁসে। সংস্কৃতির এই পুনর্জাগরণ আরম্ভ হয় প্রথমে ইটালীতে, এখানকার বণিকেরা ছিল এই সংস্কৃতির প্রধান সহায়। রেনাসাঁস্ আন্দোলনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে এর বুর্জোয়া প্রকৃতি সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকেনা। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শনকে আধ্যাত্মিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে ব্যবহারিক জীবনের সংগে নিবিড়ভাবে যুক্ত করবার প্রয়াস স্পষ্ট রেনেসাঁসের আদর্শে। তাছাড়া এই যুগের সংস্কৃতির আলোচনার মূল উৎস দেখি বুর্জোয়াসমাজের আত্মবিশ্বাস এবং ক্ষমতা-লাভ। রেনেসাঁসের আমলে গ্রীক ক্লাসিক পুস্তক সমূহের পুনরুদ্ধার এই বুর্জোয়াশ্রেণীর উন্নতিতে এবং আত্মপ্রতিষ্ঠালাভে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেছিল, কেননা গ্রীক দার্শনিকদের রচনার মধ্যে ইউরোপীয় মন পরিচয় পেয়েছিল গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বাধীন চিন্তার প্রসারের। ব্যক্তিতন্ত্রবাদের দীক্ষা এইভাবে ইউরোপ পেয়েছিল রেনেসাঁসের নিকট থেকে।

এই সংস্কৃতি আন্দোলন ছাড়াও ইউরোপে কতকগুলি চিন্তাধারা গড়ে উঠছিল যা উদীয়মান বুর্জোয়াদের আশা আকাংখা বিশেষভাবে প্রতিফলিত করে, এই ভাবাদর্শগুলির

সংগে যথাযোগ্য পরিচয় না থাক্‌লে রিফর্মেশনের প্রকৃত স্বরূপ যথাযোগ্য বোঝা যায়না কেননা ভাবাদর্শগুলি সংস্কৃতিক্ষেত্রে যেমন বুর্জোয়াদের আশা আকাংখা প্রতিফলিত করেছে তেমনি ধর্মক্ষেত্রে সামাজিক বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে বুর্জোয়াশক্তির সংগ্রাম লিপিবদ্ধ রয়েছে রিফর্মেশনের ইতিহাসে। ব্যবসায়ী এবং মহাজনদের পূর্ণ বিকাশলাভ একমাত্র সম্ভব ছিল ফিউডালনিয়ন্ত্রণহীন বাধানিষেধমুক্ত এক সমাজে যেখানে পূর্ণ প্রতিযোগিতার উপযুক্ত আবহাওয়া বিরাজমান। বুর্জোয়া সমাজের এই দাবীর প্রকাশ আমরা দেখি মেকিয়াভেলি এবং গ্রোটিয়াসের রচনায়। ধনতান্ত্রিক রাজনীতির জনক মেকিয়াভেলির জন্ম বাণিজ্যশিল্প-সমৃদ্ধ ইটালীতে, তাঁর জন্ম এবং শিক্ষার পরিবেশ গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে তাঁর দর্শনকে। মুখ্যতঃ রাজনীতিকে ধর্মের বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে মুক্ত করে তাকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠা করার দাবীই তাঁর বিখ্যাত 'প্রিন্স্' গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই পুস্তকে তিনি প্রচার করেন উপায়ের যথার্থতা বিচার করা হবে উদ্দেশ্য দিয়ে, অর্থাৎ রাজনীতির প্রয়োগে ন্যায় অন্যায়ের নৈতিক অনুশাসনের প্রয়োগ যা ক্যাথলিক চার্চ্ বরাবর দাবী করে এসেছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠলো। এইভাবে রাষ্ট্রনীতিকে ধর্মের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করার প্রথম সক্রিয় শক্তিশালী প্রচেষ্টা তাঁর সময় থেকেই আরম্ভ হয়। এছাড়া একজন শক্তিশালী রাজার নেতৃত্বে জাতিকে সংঘবদ্ধ করার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি বলেন। ইটালীয় বণিকদের যে-প্রয়োজনের দিকটা আমরা দেখি, সেটা তৎকালীন সমগ্র বণিকসমাজেরই প্রয়োজন—পরিপূর্ণ ধনতন্ত্র গড়ে ওঠার আদর্শ পরিবেশের দাবী দেখা যায় ফিউডাল-শোষণমুক্ত, শান্তিপূর্ণ এক কেন্দ্রীয় শাসনের অধীন সমাজে—এই দিক থেকে মেকিয়াভেলির রাজনৈতিক দর্শনের মূল্য ইউরোপে নিউ মনার্কির প্রতিফলন। ঠিক একই সময়ে ইউরোপে নেশনবোধের বিকাশ হতে থাকে। মধ্যযুগের ক্যাথলিক সমাজ যে-অখণ্ড খৃস্টান কমন্‌ওয়েল্‌থের ধারণার উপর দাঁড়িয়েছিল তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ধর্মীয় আন্দোলনের মারফৎ কেননা বিভিন্ন সংস্কারকরা চার্চের অনাচারকে আক্রমণ করতে গিয়ে তার নৈতিক অধিকারের ভিত্তিকেই অস্বীকার করতে থাকেন। ফলে ইউরোপ যে এক এবং অখণ্ড এই আদর্শ যে-নীতির উপর দাঁড়িয়েছিল তার ভিত্তি বিনষ্ট হয়ে যায়। বুর্জোয়া জাগরণের প্রকাশও গ্রহণ করেছে একই উপায়। ফিউডাল বিধিব্যবস্থা বুর্জোয়া আবহাওয়ায় রূপান্তরিত হওয়ার সংগে সংগে ইউরোপে জাতীয়তা বাদের বিকাশ আরম্ভ। তাই জাতীয় চেতনার প্রথম বিস্তার হল্যাণ্ড্ এবং ইংল্যাণ্ডে যেখানে সামন্ততন্ত্র প্রথমে বিনষ্ট হয়।

পাশাপাশি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও চলছিল বিপুল পরিবর্তন। বিভিন্ন শক্তির ঘাত প্রতিঘাতে রিফর্মেশনের ইতিহাস, তাই এর পর্যালোচনায় কোনটিকেও বাদ দিলে চলেনা কেননা তা হলে এর যথার্থরূপ বোঝা যায় না। রিফর্মেশন আন্দোলন ছিল মূলতঃ ধর্মক্ষেত্রে বুর্জোয়াদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। মধ্যযুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কিভাবে ফাটল ধরল তা আমরা জানি। ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল বণিকতন্ত্রের অনুকূল পরিবেশ। প্রথমতঃ

পুঁজির অভাব দূর হয়েছিল ব্যবসায় বাণিজ্যে অর্জিত মুনাফায়, দ্বিতীয়তঃ ভূমিদাস প্রথায় ভাঙন ধরায় কৃষিতে লিপ্ত চাষীরা শহর বন্দরে ভিড় জমাতে থাকে কাজের আশায় এবং প্রসারণশীল বাণিজ্যের চাপে ইউরোপের বাজার বড় হতে থাকে। কাজেই পুঁজিবাদের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি মিটেছিল এবং নূতন উৎপাদন ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়।

সমস্ত ইউরোপে সে সময়ে দেখা যায় এক বিপুল উৎপাদনের প্রচেষ্টা—কম্যুন গিল্ডের উৎপাদন রীতির যুগ শেষ হয়ে আরম্ভ হয়েছে বৃহদায়তন উৎপাদনের যুগ শ্রমবিভাগকে কেন্দ্র করে। বাণিজ্যে উন্নতদেশগুলিকে দেখা যায় উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টাতে ব্যস্ত, অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের নীতি গ্রহণ করেছে স্পেন, পর্তুগালের মত কয়েকটি দেশ—খনি এবং পূর্তে নিয়োগ করা হচ্ছে মোটারকমের পুঁজি—প্রচুর টাকা মূলধন নিয়ে গড়ে উঠেছে ট্রেডিং কোম্পানী। পুরানো দিনের মতো এরা আর ছোটখাটো সুবিধা চায় না, রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায় এরা দুর্বল প্রতিযোগিদের পরাস্ত করতে চায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। এক নূতন অর্থশক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইউরোপের ভাগ্য নিয়ামক, এরই ঘাত প্রতিঘাতে ভেংগে পড়ছিল ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক মহাপ্রাচীর—অবশ্যম্ভাবীরূপে সূচিত হচ্ছিল সকল সামাজিক সম্বন্ধের বৈপ্লবিক পরিবর্তন—আর এই নূতন অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল হল্যাণ্ড, যদিও স্পেন এবং পর্তুগালের হাতেই ছিল প্রাচ্যের স্বর্ণভাণ্ডারের চাবীকাঠি। হল্যাণ্ডের রাজধানী আমস্টারডমের মধ্যে পাওয়া যায় ষোড়শ শতকের অর্থনীতিক জীবনের পরিচয়। এই শহরটির ভৌগলিক অবস্থান করেছিল এর অর্থনৈতিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বিচিত্র রকমের পণ্যসম্ভারের সমাগম হত সেখানে ক্রয়বিক্রয়ের জন্য। আমস্টারডমের পরে অ্যান্ট্‌ওয়ার্পের উন্নতির সংগে সংগে ইউরোপের বিশিষ্ট শক্তিগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাধে কে আগে এই বন্দরটির সংগে বাণিজ্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করতে পারে এই নিয়ে। হল্যাণ্ডের এই শ্রীবৃদ্ধির ফলে সেখানে গড়ে উঠেছিল শক্তিশালী এক বণিকশ্রেণী এবং বিশেষ করে একদল ধনী মহাজন যারা এই যুগের বাণিজ্য প্রচেষ্টাকে মূলধন সরবরাহ করে নিজেদের মুনাফাবৃদ্ধির সংগে সংগে বিভিন্নদেশের সমশ্রেণীলোকের শ্রীবৃদ্ধিলাভে সহায়তা করেছে। তাই দেখি দ্রুত উন্নতি হচ্ছে অ্যান্ট্‌ওয়ার্প্, লিয়ন্স্, ফ্রাংকফার্ট্, ভেনিস, লণ্ডন, রুঁয়ে, পারীর আর সেখানে গড়ে উঠছে আন্তর্জাতিক ক্লিয়ারিং হাউস বিভিন্ন দেশের মধ্যে পাওনা টাকার আদানপ্রদানের জন্য।

উৎপাদন জগতে এই পরিবর্তন থেকে আপনাকে বিচ্যুত এবং মুক্ত রাখতে পারেনি তখনকার ধর্মচিন্তা, প্রকৃতপক্ষে ত্রয়োদশ শতক থেকেই অনুভূত হতে থাকে ধর্মজগতে এক আলোড়ন, মোক্ষকল্পনাতে আসে এক নূতন পরিবর্তনের সূচনা যা আরম্ভ হয়েছিল উৎপাদনের ভংগী পরিবর্তনের সংগে। ধর্মকেও এই পরিবর্তিত পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য দেখা যায় প্রচণ্ড বাস্তব তাগিদ যা লক্ষ্য করা যায় পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতকের অর্থনৈতিক এবং

ধর্মনৈতিক চিন্তাধারার আলোচনায় যার চূড়ান্ত প্রকাশ রিফর্মেশন আন্দোলনে। মোটামুটি ভাবে সামাজিক dislocation এর যুগ বলতে পারা যায় ষোড়শ শতাব্দীকে যা হোল রিফর্মেশন আন্দোলনের সামাজিক পটভূমিকা। সমাজকে এই হানাহানি থেকে রক্ষা করবার নৈতিক দায়িত্ববোধের প্রেরণা, অপরদিকে ক্যাথলিক চার্চের শোষণ থেকে সমাজের মুক্তি আনার প্রয়াস রচনা করেছে রিফর্মেশনের ভূমিকা। তাই রিফর্মেশন আন্দোলনের একশ্রেণীর নেতাদের আমরা যেমন দেখি পোপের অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তেমনি তাঁদের দেখি ধনতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে। অর্থনৈতিক জগৎ যে ধর্মের অধিকারভুক্ত নয় এ ধারণা তখনও দূরীভূত হয়নি তাই ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য এবং দুর্দশার প্রতিকার খুঁজতে গিয়ে লুথার, যুইংলি, বুলিংগার ইত্যাদি ধর্মসংস্কারকরা বাইবেল এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলি হাতড়ে দেখেছেন সুদ দেওয়া অন্যায় কিনা এবং কতখানি মুনাফা শাস্ত্রসম্মত। ইংল্যাণ্ডেও দেখি ল্যাটিমার, পনেট্, ক্রাউলি, লেভার, স্যাণ্ডিস্, জুয়েল, বেকন ইত্যাদি প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতদের একই আলোচনায় রত থাকতে। তবু এই তত্ত্বগত আলোচনায় বিশেষ কিছুই লাভ হয়নি; কেননা সমাজের এই দুর্দশার সমাধানকল্পে তাঁরা যে-ব্যবস্থার পরিকল্পনা করেছিলেন তা আদর্শের দিক থেকে পবিত্র এবং মহান হলেও বাস্তবক্ষেত্রে তার প্রয়োগ ছিল অসম্ভব।

সামাজিক অন্যায়ের দিকে যেমন এই সংস্কারকদের নজর পড়েছিল তেমনি চার্চের অনাচার এঁদের সমালোচনা থেকে মুক্তি পায়নি। এঁদের চার্চ্-সমালোচনায় প্রকাশিত হয়েছে বুর্জোয়া দৃষ্টিভংগী বিশেষভাবে। ক্যাথলিক চার্চের নৈতিক দুরাচার এবং আর্থিক শোষণ তাই প্রচণ্ড সমালোচনার কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়ায়। মূলতঃ Indulgence অর্থাৎ কাঞ্চন দক্ষিণায় পাপ মার্জনার যে-প্রথা প্রচলিত ছিল ক্যাথলিক চার্চে তাকে আক্রমণে আরম্ভ করেন মার্টিন লুথার আপনার বিদ্রোহী জীবন। তিনি প্রচার করেছিলেন অবাস্তব এম্পায়ারের পরিবর্তে ঈশ্বরপ্রেমে অভিসিঞ্চিত এক বিরাট ভ্রাতৃসংঘ গড়ে তোলা ধর্মের আদর্শ হওয়া উচিত, যেখানে প্রত্যেককেই কায়িক পরিশ্রম করে অন্ন উপার্জন করতে হবে। ভিক্ষুক অথবা সন্ন্যাসের আদর্শের স্থান সেখানে থাকবে না। আর এই ভ্রাতৃসংঘের পুরোহিত হবে পবিত্র বাইবেল, কোন পাদ্রী অথবা যাজক নয়। স্বর্গের দরজা কতখানি উন্মুক্ত হবে তা বিচার্য হবে ব্যক্তি বিশেষের ভক্তির পরিমাপে, অর্থের মাপকাঠিতে নয়। লুথারের এই দর্শন বিচার করলে দেখা যায় এতে নূতন কথা তিনি কিছু বলেননি, কারণ কৃষক এবং কারিগরদের বিদ্রোহে এই ধরণের দাবী উঠেছিল। আন্দোলনকারীরা সামাজিক অন্যায়ের প্রতিবিধানের সংগে সংগে চেয়েছিল ধর্মকে জটিলতার থেকে মুক্তি দিয়ে এবং চার্চের নিয়ন্ত্রণ থেকে অব্যাহতি দিয়ে জীবনের সংগে যোগাযোগের পথ সহজ করা হোক। পাদ্রী লুথার তাঁর সামাজিক নীতিতেও তাঁর গোঁড়ামি ত্যাগ করতে পারেননি, তাই ব্যবসায় বাণিজ্যের মধ্যে তিনি সামাজিক উন্নতির সম্ভাবনা দেখেননি অথবা ধনবৃদ্ধিকে যে কল্যাণের পথে নিযুক্ত করা যেতে পারে তাও

উপলব্ধি করেননি। তাই ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসারকে তিনি দেখেছেন প্রতিক্রিয়াশীল সন্দেহের দৃষ্টিতে অশান্তির বাহন মনে করে। লুথারের মন পড়েছিল অতীতের দিকে, তাই খৃস্টান সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে কোন ঐতিহাসিক ভূমিকা থাকতে পারে তা তিনি অস্বীকার করেছিলেন। যে-আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, ব্যাংকিং এবং ক্রেডিট ব্যবস্থার ফলে ইউরোপের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তিত হচ্ছিল তা লুথারের মতে পাপলীলার প্রকাশ—তাই তার সংসর্গ খাঁটি খ্রীস্টান কর্তৃক পরিত্যাজ্য।

সংস্কারক লুথারের জীবন দুটি ধারায় বিভক্ত—একদিকে তাঁকে দেখি ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে আক্রমণে কৃষক, কারিগর, নিম্নবিত্ত এবং জার্মান রাজাদের নেতৃত্ব করতে, সে-ভূমিকায় তিনি প্রগতিবাদী—তাঁর জীবনের অপর ধারায় তিনি প্রতিক্রিয়াশীলদের পুরোধা, যেখানে জার্মান রাজাদের তিনি প্রজাবিদ্রোহ দলনে সহায়তা করছেন। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় ভূমিকাতেই লুথারের যথার্থ পরিচয়। জ্ঞানতঃ তিনি ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল তাই ফিউডাল ব্যবস্থার ভাংগনের আশংকা তাঁকে বিচলিত করে তুলেছিল এবং তাঁকে জার্মান রাজাদের সহযোগী মিত্র এবং উপদেষ্টাতে পরিণত করেছিল। রাজাদের প্রতি প্রজাসাধারণের আনুগত্য তাঁর ধারণানুযায়ী ছিল অবশ্য কর্তব্য, তাই বিদ্রোহের সকল চেষ্টাই তাঁর মতে নিন্দনীয়। লুথারের পক্ষে যুগের স্পষ্ট নির্দেশ বোঝা সম্ভব হয়নি, তাই ষোড়শ শতকের ধর্মসংস্কারকদের মধ্যে মার্টিন লুথার একটি কমপ্লেক্সের সৃষ্টি করেছেন।

কিন্তু মার্টিন লুথারের রাজনৈতিক মতামতের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে মতামত যা তাঁকে দিয়েছে ইতিহাস-বিধাতার আসন। ধর্মজগতে পোপের অধিকার অস্বীকারের ফলে ইউরোপের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় আসে বিপুল পরিবর্তন কেননা পোপের অধিকার অগ্রাহ্যের অর্থ অখণ্ড ইউরোপীয় কমন্‌ওয়েল্‌থের ধারণাকে অস্বীকার এবং সংগে সংগে জাতীয়তার ভিত্তিতে দেশ এবং চার্চ্‌ সংগঠনের নীতিকে স্বীকার করে নেওয়া। চার্চের মুনাফা লুঠের এবং সার্বভৌমত্ব লাভের আশায় তাই জার্মান রাজারা লুথারকে সমর্থন করেছিলেন। তাই তাঁর ধর্মনৈতিক আদর্শ আধুনিকযুগের চিন্তাধারার ভিত্তিস্বরূপ। লুথারকে তাই ইতিহাসের অন্ধশক্তি বললে অন্যায় হয় না।

ষোড়শ শতাব্দীর আরেকজন সংস্কারকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন ক্যাল্‌ভিন। মার্টিন লুথারের মতো তাঁর মতবাদ প্রতিক্রিয়াপন্থী নয়—সমাজের বাস্তব অবস্থার পরিপূর্ণ স্বীকৃতি ছিল তাঁর দর্শনে, যে-ধনতান্ত্রিক শক্তিকে মার্টিন লুথার অখ্রীস্টানীয় এবং হেরেটিক বলে নিন্দা করেছেন তার বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা দেখি ক্যাল্‌ভিন্‌বাদে। লুথারবাদ যেখানে প্রতিষ্ঠিত শক্তির কাছে শ্রদ্ধাবনত এবং সমাজবিরোধী শক্তির সংগে আপোষমুখী, সেখানে ক্যাল্‌ভিন্‌বাদ অনেক প্রগতিশীল কেননা ক্যাল্‌ভিন ব্যক্তির মুক্তিকামনাতেই নিজের শক্তিকে আবদ্ধ রাখেননি, সমাজ, রাষ্ট্র, চার্চ্‌ এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত জীবনের সকল দিককেই তিনি প্রগতিশীল ধর্মীয় দৃষ্টির আলোকে তুলে ধরেছেন সমালোচনার পাদপীঠে।

ক্যাপৃভিন্‌বাদ প্রধানতঃ গড়ে উঠেছিল ব্যবসায়-বাণিজ্যকেন্দ্রিক শহর সমূহে। ষোড়শ শতকের আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র জেনেভা থেকে এর আদর্শের দ্রুত-বিস্তার ঘটতে থাকে বাণিজ্যবহুল দেশ সমূহে। এর কারণ ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট কেননা ক্রমবর্ধমান ব্যবসায়ীসমাজকে লুথারের মতো সংকীর্ণ সন্দেহের দৃষ্টিতে না দেখে ঐ সমাজকে ক্যাল্‌ভিন্‌বাদ উপযোগিতার স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং অপরিহার্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিল ব্যবসায়জগতে পুঁজি বিনিয়োগ এবং মুনাফার প্রয়োজনকে। তাছাড়া জীবনধারণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে যে বেশী রোজগারের কোন প্রয়োজন নেই—এই ধরণের যে-চিরাচরিত বিশ্বাস চলে আসছিল তার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ ছিল এই আদর্শে। জমির খাজানা থেকে আয়ই যে একমাত্র শাস্ত্রসম্মত নয় এবং ব্যবসায়ীদেরও যে বিশেষ একটা স্থান আছে সমাজে তা ক্যাল্‌ভিন্‌বাদ স্বীকার করেছিল—এই স্বীকৃতির উৎস ক্যাল্‌ভিনের দর্শনের মধ্যে নিহিত। ক্যালভিন বিশ্বাস করতেন মানুষের জীবন পূর্বকল্পিত হয়ে আছে তার সংসার প্রবেশের পূর্ব থেকেই, আর সে-জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরের মহিমা প্রচার সংগ্রামবহুল কর্মময় জীবনের মধ্যে। ক্যাল্‌ভিন্‌বাদ তাই সন্ন্যাসের আদর্শ স্বীকার করে না কেননা তা মোক্ষ সাধনার পরিপন্থী। তাই বাণিজ্য সভ্যতাকে ক্যাল্‌ভিন বিষদৃষ্টিতে দেখেন নি অথবা অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টাকে তিনি নিন্দা করেন নি, নিন্দা করেছেন অসৎ কার্যে অর্থের প্রয়োজনকে। অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যে-শৃংখলা, পরিশ্রম এবং সততার প্রকাশ তাকে তিনি অধর্মীয় অথবা অকল্যাণকর বলে নিন্দা করেন নি বরং আত্মিক সাধনার সহায়ক বলে সেগুলোকে অভিনন্দিত করেছেন। সুতরাং অবশ্যম্ভাবীরূপেই ক্যাল্‌ভিন্‌বাদ হয়ে দাঁড়ায় নূতন বুর্জোয়াশ্রেণীর ধর্ম।

লুথার এবং ক্যাল্‌ভিনের প্রচেষ্টা ব্যতীতও ষোড়শ শতাব্দীতে আরো অনেকগুলি সংস্কার আন্দোলন দেখা দিয়েছিল এবং এর ঢেউ শুধু জার্মানীর ভিতরেই আবদ্ধ থাকেনি, এর প্রবাহ ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র ইউরোপে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। তাই দেশে দেশে দেখি একই চেতনার বিকাশ মিস্টিক্ এবং Anabaptist আন্দোলনের মধ্যে। আন্দোলনগুলির মধ্যে আকারে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও এদের মধ্যে প্রকৃতিগত অসাম্য বিশেষ ছিল না—মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকে চার্চের নিয়ন্ত্রণ অস্বীকার এবং জীবনের মূল্যবিচারে পাদ্রীদের ফতোয়ারও উপরে মানুষের নিজের বিচারবুদ্ধিকে বড়ো স্থান দেবার দাবী জানিয়েছিল এই আন্দোলনগুলি।

ধনতন্ত্রবাদের দ্রুত প্রসারের জন্য প্রয়োজন ছিল যে-সামাজিক দর্শনের তার অভাব পূরণের প্রতিশ্রুতি ছিল এই নূতন প্রচারিত ধর্মমত সমূহে। তাই দেখি সংস্কার আন্দোলনের অভূতপূর্ব বিস্তার ইউরোপের ব্যবসায় বাণিজ্যে উন্নত দেশগুলিতে। মধ্যযুগের ব্যবসায়ের প্রাণকেন্দ্র হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানীতে এই ধর্মমতগুলির বিশেষ প্রসার লাভ হয়। ইংল্যাণ্ডে টিউডর আমলে রাজশক্তির ক্ষমতাবৃদ্ধির সংগে জাতীয় চার্চ্‌ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ধর্মক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতা জাতীয়তার পূর্ণ বিকাশের পরিপন্থী ছিল বলেই পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয় চার্চ্ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন আরম্ভ হয়—ধর্মীয় ব্যাপারে তাই বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে দেখা যায় প্রটেস্টাণ্ট্ আন্দোলনের সমর্থক হিসাবে—এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইংল্যাণ্ডের টিউডর রাজারা এবং হল্যাণ্ডের অরেঞ্জের ডিউক পরিবার। আর এই আন্দোলনের পটভূমিকা হিসাবে দেখা যায় উদীয়মান বুর্জোয়াদের জাগরণ যা ইংল্যাণ্ড্ এবং হল্যাণ্ড্কে এক অপূর্ব প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত করেছিল। হল্যাণ্ডের ক্যাল্ভিন্বাদ এবং ইংলণ্ডের পিউরিটান্বাদ ছিল এই বুর্জোয়াদের ধর্ম যা মানুষের আর্থিক জীবনকে বিচার করেছিল প্রয়োজনের দৃষ্টিভংগীতে নীতিগত অনুশাসনকে উপেক্ষা করে। বুর্জোয়াশ্রেণীর জয়লাভ সূচিত হয় ইংল্যাণ্ডের ষ্টুয়ার্ট্ বিপ্লবে এবং হল্যাণ্ডে ডাচ বিপ্লবে যখন এই দুটি দেশে ফিউডাল ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অবসান ঘটে এবং পূর্ণ ধনতন্ত্র গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্ট হয়। নবীন বুর্জোয়া স্বার্থের বিশেষ অনুকূল ছিল বলেই ব্যবসায়ী সমাজ প্রটেস্টাণ্ট্ দর্শনকে সাগ্রহে বরণ করেছিল তাই দেখি ক্রম্ওয়েলের আমলে ইংল্যাণ্ডে যখন পিউরিটান ধর্ম বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ঠিক একই সময়ে সমস্ত ইউরোপ জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যিক প্রভুত্ব। প্রটেস্টাণ্ট্ ধর্ম এবং জাতীয় শ্রীবৃদ্ধির সংগে এই ধরণের প্রত্যক্ষ সংযোগ আবিষ্কার করা যায় হল্যাণ্ড্, সুইজারল্যাণ্ড্ এবং পশ্চিম জার্মানীর শিল্প ব্যবসায়ে উন্নত রাষ্ট্রগুলিতে। ফ্রান্সের আর্থিক সমৃদ্ধির বনিয়াদ ছিল সতেরো শতকে সেখানকার হিউগনট্রা, সেখানকার সমৃদ্ধিতে ভাঙন দেখা দেয় যখন চতুর্দশ লুই কোলবার্টের অনুসৃত নীতি পরিত্যাগ করে হিউগনট্-অত্যাচারে রত হন। ক্যাথলিক স্পেন এবং পর্তুগালকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত ইউরোপীয় অর্থনীতির নেতৃত্ব করতে দেখা গেলেও এই প্রাধান্য ছিল অত্যন্ত অস্থায়ী কেননা বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হলেও এই দুটি দেশ নিজেদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য উপনিবেশগুলির যথাযোগ্য ব্যবহার করতে সমর্থ হয়নি। এদের অসম্ভব সমৃদ্ধির ভিত্তি ছিল 'বুলিয়ন্ ইকনমি', তাই কোন স্বাধীন এবং সুস্থ মধ্যবিত্ত শ্রেণী না গড়ে ওঠার ফলেই স্পেন ও পর্তুগাল তাদের অধিকার বজায় রাখতে সমর্থ হয়নি এবং অধিকতর শক্তিমান দেশগুলির নিকট নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

ইউরোপীয় ইতিহাসের পর্যালোচনায় দেখা যায় যে যতদিন পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে ততদিন ধর্ম চেষ্টা করেছে ফিউডাল ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসারকে বাধা দিতে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যখন সম্পূর্ণ কায়েমী তখন চার্চ্ও তাকে স্বীকার করে নিয়েছে ধর্মসম্মত এবং ঈশ্বরানুমোদিত বলে। ধনতন্ত্রে ধর্মের স্থান বিচার এ প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত না হলেও এক্ষেত্রে বলা অপ্রাসংগিক নয় যে পূর্ণ ধনতন্ত্রে ধর্ম এবং শাসক শ্রেণীর মধ্যে আপোষের ফলে ধর্ম রাষ্ট্রের শাসকদের সমর্থনে রত। রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে নেওয়ায় ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকে কতকগুলো বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। এর উদাহরণ নেপোলিয়ন এবং পোপ সপ্তম পায়াসের চুক্তি এবং বিসমার্কের আমলে রাষ্ট্র এবং চার্চের আপোষ। ধনতন্ত্র

এবং ধর্মের সহযোগ আরো স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয় ফাসিস্ত ইতালী এবং নাৎসী জার্মানীতে। একই কারণে ভবিষ্যতে ধর্মের কি ভূমিকা হবে তা অনেকখানি নির্ভর করবে সমাজ বিপ্লবের সাফল্যের উপরে।

অভীপ্সা

শ্রীশংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়—তৃতীয় বর্ষ, আর্ট্‌স্

জলতরংগের মত ছলোছলো দিন যদি হয়
যদি মমতার মৃদুল শিহর ঝরে যায় এখানে মনে,
শান্তনু-সুস্নিগ্ধ প্রেম রোদ হয়ে মাঠে মাঠে ঝরে
প্রজাপতি-পাখার মত স্বপ্নালু, সুন্দর অবক্ষয়!

এ মাটিতে ক্ষয়ে যাওয়া ভালো। ধানের গোড়ায় গোড়ায়
শিশিরের শীতের স্পর্শ বহুক্ষণ সারারাত ধরে;
ভাদ্রের আদুরে গলায় আশ্বিনের আমন্ত্রণ শুনি
অঘ্রাণে ধানের পানে চেয়ে চেয়ে চোখে জল ঝরে!

তখন সকল খেদ, সব ব্যথা ভেঙে ভেঙে যায়:
আকাশের রোদ-সীমা শেষ হলে জ্যোৎস্না-চাঁদোয়া দোলে;
নক্ষত্র-পান্নার প্রাণ তখনই ত খুঁজে খুঁজে মরি,
আহা, ব্যর্থ প্রাণ কত প্রাণ তারা হয়ে আকাশে হারায়।

নির্জন মুহূর্তে

শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত—তৃতীয় বর্ষ, আর্ট্‌স্

ধূসর গোধূলি-আঁকা সায়াহ্নের তীরপ্রান্তে বসি'
সোনালি-হলুদে শুধু দিগন্তের পাণ্ডুলিপি লিখি,
প্রত্যহের কক্ষচ্যুত স্বপ্ন-ঝরা অবাক প্রাণের
পৃথিবীতে টিপিটিপি নেমে আসে কবিতা-উর্বশী।

হৃদয়ের দেহলীতে দিনান্তের আলোর আল্‌পনা
এঁকে দেয় সেই মেয়ে গৃহলক্ষ্মী বধূর মতন,
অরূপের রূপ-তীর্থে স্বপন-সুষমা দিয়ে চলে
মনের শিল্পীর ছন্দ-সংগীতের ইন্দ্রজাল বোনা।

দূরাকাশে ইন্দ্রধনু-বর্ণালীর বিলাসের মত
জাদুর পরাগ মাখা সে মুহূর্ত ভাষাতীত, শুধু
মনের স্ফটিক-পথে চিরন্তন নির্জন স্বাক্ষর
থাকে তার ; সে মুহূর্তে এসেছিল স্বপ্ন-কথা যত।

সময়-সমুদ্রে হায় হারাল সে মুহূর্ত-বিদিশা
এখনো হৃদয়ে তবু কাঁপে তারি সুর-শতভিষা।

হৃদয়-সময়-স্বপ্ন

শ্রীসুস্নাত গংগোপাধ্যায়—চতুর্থ বর্ষ, বিজ্ঞান

এখন দশটা বাজে। নিদাঘের আসন্ন দুপুরে
গলিত পীচের গন্ধ পথে পথে, রোদ
পৃথিবীর বুকে রূঢ় ভাস্করের ক্রোধ
হয়ে গলে পড়ে। ক্ষিপ্র হাতে
এটা ওটা মুখে গুঁজে তরল রোদের স্পর্শে পুড়ে
বাসে ওঠা, শ্বাসরোধী তাপে, ঘামে, ধাক্কায়, পেষণে
পিঞ্জরে পশুর মতো নিত্যকার প্রাতে
এই যে কলেজে ছোটা—ক্লান্ত দেহে অবসন্ন মনে
ক্লাশে ঢোকা—তারপর অধ্যাপকের
বক্তৃতার অশ্রান্ত প্রপাত
মন দিয়ে শোনা—অকস্মাৎ
কখনো হঠাৎ যদি চোখে পড়ে সোনালী আলোকে

উজ্জ্বল রঙের খেলা ডালে ডালে সবুজ গাছের,
কিংবা কানে ভেসে আসে ক্লান্তডানা কপোতের ডাক,
তাহলে নিষ্ঠুর হাতে ভেঙে ফেলে ক্ষণিক স্বপ্নকে
কাগজে আঁচড় কাটা—গাছ, পাখী, রোদ আজ থাক ;

তারপর ঘাড় গুঁজে লিখে লিখে সারাদিন গেলে
যখন বিকেল নামে পৃথিবীর বুকে—
বৈকালী লালের আভা ঝরে পড়ে সলাজ কিংশুকে,
আকাশের নীলে, শাদা মেঘে, ঘাসে আর
ঘরমুখো মেয়েদের রঙীন শাড়িতে—তবু সেই ছবি ফেলে
বাসে উঠে ঘরে ফেরা, ফের
বইয়ের পাতায় মাথা গোঁজা—এই দুঃসহতার
শেষ নেই ? শেষ নেই ছক্-কাটা রং-চটা এই জীবনের ?

তবুও স্বপ্ন নামে ! উচ্ছ্বসিত তারুণ্যের বানে
ভেঙে পড়ে দৃঢ়বদ্ধ প্রহরার বাঁধ !
মধুময় মনে হয় অকস্মাৎ বিরস বিস্বাদ
জীবনকে—জ্যোৎস্না হয়ে রাত্রির আরাম
যখন হৃদয়ে জ্বলে, কিংবা শিশুসূর্যের আহ্বানে
যখন আলোর কুঁড়ি ভীরু চোখ তোলে—তবে সেই রূপ-রঙ
গানে বেঁধে নিতে চাই—স্বপ্ন ভাঙে, কলম রাখলাম !
আর তো সময় নেই, নটা বাজে ঢং-ঢং-ঢং !

একটি কবিতার ইতিহাস

শ্রীবটকৃষ্ণ দে—পঞ্চম বর্ষ, আর্ট্‌স্

রাত্রি, মেঘ, স্বপ্ন, নীল,—শব্দের দুস্তর পরিক্রমা
পেরিয়ে, ধূসর এক সাহারা-মরুর পথে এসে
যদি শুধু দেখা যায় আদিগন্ত মরীচিকা-দেশ-এ
সূর্য-বায়ু-বালুকার প্রেমে নাকি পথিকের ক্ষমা
নেই,—তবে, বলো, সেই কোন বিশ্ব-বিজয়ের বলে
কথার পাহাড়ে আজ চড়াই-উৎরাই করা চলে ?

আমি তো কতো সেই জীর্ণ জগতের কুড়িয়ে ধূলি-কণা
নিভৃতে একা জেগে গড়েছি ঘর, আহা, এঁকেছি আলপনা,—
ইন্দ্রধনু হ'তে রঙের তুলি তুলে শিল্প গেছি এঁকে,
ব্যথার বাসরে সে, আসে নি তবু, মন আশারই লিপি লেখে!
কতো যে শতভিষা তৃষায় কেঁদে-কেঁদে নীরবে ঘুমিয়েছে
আমার কথা তবু রাতের কোরকেতে কমল ফুটিয়েছে!

তার পর আমি ক্লান্ত ;
শতধা-দীর্ণ প্রাণ তো
হল, হায়, রক্তাক্ত,—
যেখানে স্বপ্ন থাকতো,
সেখানে বীত-মাধুর্যে
নেই এক ফোঁটা সুর যে!

তবু তো আমার সেতারের-তার সুপ্ত সুরের
সপ্ত রাগের আরাধনা করে ; ব্যথা-দুঃখের
ক্ষুধার সুধার সব সঞ্চয়ে পূর্ণ হবেই
প্রাণ প্রাংগন ; এই বেদনার ইতিহাস, সেই
শুভ্র ভোরের ভৈরবী রাগে ভুলবে সবাই,
তাই, সংগীত জন্ম দেবার কোনো ক্ষোভ নাই॥

বর্ষার কবি

শ্রীযতিকুমার সেনগুপ্ত—তৃতীয় বর্ষ, আর্ট্‌স্

'আষাঢ়স্য প্রথম দিবস'। বাদলধারার আগমনী সুরু। ঝরো-ঝরো ধারায় বারি ঝরছে ···ঐ সামনের বুড়ো-বট গাছঘেরা পুকুরটার গায়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, সাদা ঘোলাটে আর উচ্ছল জলরাশি। সব নিঝুম, নিশ্চুপ। কেবল ঐ সামনের পুকুর-চাওয়া তেমহলা ঐ বাড়ীটার ওপরতলার এক কোণে একটি ছোট্ট ছেলে বসে রয়েছে। অবাক-বিস্ময়-ঘেরা তার চাহনি। চারপাশে তার 'শ্যামের গণ্ডী'; তবে মন তার অতন্দ্র-অচল। লক্ষ্মণের গণ্ডী পার হয়ে সীতার বিপদ ঘটেছিল, তাই 'শ্যামের-গণ্ডী' পেরোতে সাহস হত না, কিন্তু মন সেই গণ্ডীঘেরা থাকতো না; তাই ছেলেটি শুধু চুপ্‌টি করে বসে আছে, তার নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীতে; আর অবাক-বিস্ময়ে শুনে চলেছে এই নৈঃশব্দ্যের মাঝখানের অপূর্ব ছন্দিত ধ্বনিঝংকার।···সামনের ওই ঝরো-ঝরো বারি-ঝরা আকাশ, ওই অস্পষ্ট-হয়ে-আসা বুড়ো চীনে বট, ওই সাঁতার-কাটা শুভ্রপক্ষ হাঁসের দল···সবই মিলে যেন একটা অপূর্ব আনন্দ-লোক সৃষ্টি হয়ে চলেছে ওই ছন্দিত বারিধারার মোহমায়াঘেরা হয়ে আর ছোট্ট শিশুমনের বিস্ময়পরশে। সেই ছোট্ট শিশুমনও তাই এই অপূর্ব রহস্যলোকের জানা-অজানার আসরে নিজের ঠাঁই করে নিয়েছে, অজানার-পারহতে-ভেসে-আসা বাদলধারার অন্তরসংগী হয়ে কোন্ নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে পাড়ি দিয়েছে। ঐ পুকুর-বটগাছ ছাড়িয়ে, শ্যামের সংকীর্ণ গণ্ডী ভুলে মন তার চলে গিয়েছে কোন্ অজানার রহস্যলোকে, যেখানে হয়তো অচেনা-অদেখা নদীধারার কূলে-উপকূলে বান এসেছে, টাপুর-টুপুর বৃষ্টি সুরু হয়েছে, আর শিব-ঠাকুরের বিয়েও সুরু হয়েছে—এদিকে উচ্ছল বর্ষণধারা বয়ে চলেছে, তবু শিবঠাকুরের বিয়ে থামেনি, এক এক করে' তিনকন্যে দান হয়ে গিয়েছে···এক কন্যে রাঁধাবাড়ার কাজে, এক কন্যে খেতে বসে গিয়েছেন আর এক কন্যে হয়তো রাগ করে বাপের বাড়ী চলে যাবার পথে—। আর শিশুকবিও সেই যাত্রাপথের পথিক। শিবঠাকুরের বিয়ে শেষ হয়েছে—তাই সেই দৃশ্যকাবের নীরব দর্শকও পাড়ি জমিয়েছে—এবার তার যাত্রা সুরু তেপান্তরের মাঠে, কিংবা সাতসমুদ্দুর পারের ক্ষোন্ বীরপুরুষ আর বীরকন্যার স্বপ্নপুরীতে, সেখানে সত্যমিথ্যার বালাই নেই, কিংবা কোন সম্ভব অসম্ভবের প্রশ্ন নেই—। সবপেয়েছির দেশের সেই অভিযাত্রিক, সেই শিশুকবিমনই আজকের বিশ্ববিস্ময়কর প্রতিতা। সেই কবিই আজকের বিশ্বকবি।

···তারপর? দিন চলে গিয়েছে। শিশুকবির পাঠ-জীবনের হাতে-খড়ি সুরু হয়েছে—'জল পড়ে, পাতা নড়ে'—অক্ষর পরিচয়ের পর প্রথম শব্দপর্যায়!···জল পড়ছে তার ছন্দিত

বর্ষণছন্দে, সংগে বাতাসের উচ্ছল হিল্লোল, তাই গাছের পাতাগুলোও কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে। এটা শুধু বাইরের দৃশ্য জগতেই নয়, শিশুকবির অস্পষ্ট মানস-ছবির বইয়ের পাতায়-ও সেই 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'।—বর্ষণ সুরু হয়েছে আর তার হিল্লোলে পাতার ঘুমন্ত প্রাণে সাড়া জাগ্‌ছে—কবিমনের ঘুমন্ত মোহঘোরও কেটে যাচ্ছে, আর তার হিল্লোলিত কবি-অন্তর প্রথম বর্ষাগমের আনন্দ অনুভব করে চলেছে। তাই বর্ণপরিচয়ের এই শব্দ-পর্যায়ের 'জল-পড়ে, পাতা-নড়ে'র ধ্বনি-সীমায় এসে বাক্য হয়েছে নীরব, কণ্ঠ হয়েছে মৌন, কিন্তু গতি হয়নি স্তব্ধ, বা মনের কাকলি হয়নি অস্ফুট ও নিশ্চুপ। মনের মনিকোঠায়, কথা হয়েছে কাকলি, কণ্ঠ হয়েছে সংগীতমুখর। মনের ও প্রাণের সাধনরাজ্য তখন ঐ টই-টম্বুর পুকুর-পাড়ে, সুয্যি যখন ডুবুডুবু, কাজলকালি মেঘে তখন আকাশ ছেয়ে এসেছে, মন্দিরেতে কাঁসরঘণ্টা ঢং ঢং করে বেজে চলেছে, সংগে ঝরো-ঝরো বারিঝরা সুরু হয়েছে, আর মাঝে মাঝে ঐ শিকড়-ছোঁওয়া পাগলা-হাওয়া পাতা কাঁপিয়ে কবিমনকে ডাক দিয়ে চলেছে ঐ শোলোকবলা কাজলাদিদির কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে।

কতোদিন, দরমায় ঘেরা ঘরে ক্লাস চলেছে, এমন সময় হয়তো ঝর-ঝর ধারায় ভরা বাদর এসেছে, অবিশ্রান্ত জলের কলোচ্ছ্বাস তার সংগে—। সামনের বারান্দায় জল জমেছে—সব দরজাজান্‌লা বন্ধ হয়ে ঘর অন্ধকার হয়ে এসেছে, মাষ্টারমশায় তাঁর পড়াশোনা থামিয়ে চুপ করে বসে আছেন—ছেলেরা হুটোপুটী করে চলেছে, কিন্তু শিশু রবিকবি চুপ্‌টী করে বসে রয়েছে নিজের বইদপ্তর হাতে নিয়ে, এদিকে বাঁধনহারা মন তার মুখর যাত্রাপথে পাড়ি জমিয়েছে, হয়তো কোন কল্প-লোকের তেপান্তরের মাঠে, যেখানে হয়তো অবিরল ধারায় বৃষ্টি ঝরে চলেছে ঝম-ঝম করে 'বরখত নীরদপুঞ্জে,' আর সেই বরষণের মধ্য দিয়েই রাজপুত্র ছুটেছে তার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে, আর শিশুকবি তার একমাত্র সাথী—সেই রাজকন্যা-খোঁজার পথের পথী—যে রাজপুত্রের শংকাভরা অন্তরের ব্যথার দরদী ব্যথী।·· এইতো বর্ষার কবির জীবনস্মৃতির বাল্য-খতিয়ান।

তারপর কবি-জীবন এগিয়ে চলেছে। কবিমানসও তার সাধনাপথের বাঁকে বাঁকে গতি ফিরিয়েছে কিন্তু বর্ষার পরশ অক্ষয় ও অমূল্য। তার অবদান অপরিসীম। 'আজি হৃদয় মোর কেমনে গেল খুলি' হতে 'না-জানি কেনরে এতদিন পরে জাগিয়া উঠেছে প্রাণ' পর্যন্ত অধ্যায়ে সেই বাদল-বাউলের একতারারই এক ক্ষীণ সুর। ছোট্টবেলাকার জোঁড়াসাকোর বাড়ীর সামনের ঐ বাদলঝরা, পুকুরঘেরা পরিবেশে বর্ষার যে-সীমিত রূপ-সুষমা শিশুকবি-মনে দাগ কেটেছিল, সেই সংগোপন বর্ষা-মিতালিই কবির উত্তর জীবনে অনুপ্রাণনা জুগিয়েছে। এটা যেন instinct এর মতো সহজ, সরল ও মধুময়। তাই রবীন্দ্রনাথ বর্ষার কবি। বর্ষার গান, বর্ষার সজল পরশ তাঁর প্রাণের পরতে পরতে, অণুতে ও অন্তরে। বর্ষার বাদল-বাউল সারা আকাশ জুড়ে একতারায় যে-সুর তুলে চলেছে, রবিকবি তারই সুরকার।

আর বর্ষামংগল-আবাহনের মৌল সুরে সেই বর্ষাদিনের অব্যক্ত দুঃখম্লান হৃদয়েরই পুনমূর্ছনা। কবি যখন তাই চলে গিয়েছেন মেঘদূতের দেশে—'সেদিন সে উজ্জয়িনী প্রাসাদশিখরে কী না জানি ঘনঘটা, বিদ্যুৎ-উৎসব, উদ্দাম পবনবেগ গুরুগুরু রব ?…' ভারতের পূর্বপ্রান্তে বর্ষাদিনের শ্যামল বংগদেশে কবি চলেছেন সেই মেঘদূত-যাত্রাপথে—সামনে দিগন্তের তমাল-বিপিন, দীর্ঘ শ্যামচ্ছায়া…পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর,…অন্ধকার হয়ে এসেছে দিন, বর্ষণ অবিরাম ঝরোঝরো। পবন দুরন্ত আকুল, তার আক্রমণঘাতে আকুল অরণ্যকুঞ্জ উদ্যতবাহু…

'বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ি মেঘভার
খরতর বক্রহাসি শূন্যে বরষিয়া
অন্ধকার রুদ্ধগৃহে একেলা বসিয়া
পড়িতেছি মেঘদূত…।'

সেই অলকাপুরবাসিনীর অব্যক্ত বিরহবেদনায় ব্যথাম্লান হয়ে উঠেছে কবিমন। তাই ঐ বৃষ্টি-পড়া আঁধার নিশায় কবিমনেরও অন্তর-অভিসার সুরু হয়েছে ঐ আষাঢ়ের আকাশচারী শুভ্র মেঘদলের সাথে, যারা বয়ে নিয়ে চলেছে ঐ দীর্ঘশ্বাস-ঘেরা, অশ্রুবাষ্প-পৃক্ত প্রেমের বারতা, ঐ সুদূর বাতায়ন-পার্শ্বে, যথায় 'ব্যথাম্লান বিরহিনী ভূতল-শয়ান, মুক্তকেশে ম্লানবেশে, সজল নয়নে।' সেদিনকার সেই মেঘসংঘর্ষের সুগম্ভীর নির্ঘোষ একদিনে জাগিয়ে তুলেছিল যে সহস্র বর্ষের অন্তর্গূঢ় বাষ্প-আকুল বিরহ-ক্রন্দন, সেই দিনস্মৃতির অনুরণনে সহানুভূতি-কাতর কবিমনেও ঝরে পড়েছিল অবিরল-অশ্রু-আর্দ্র সহানুভূতির পরশ। তাই প্রতিবার সেই বর্ষণক্লান্ত বহুদীর্ঘ আষাঢ় সন্ধ্যায় ক্ষীণ-দীপালোকের সীমিত আবেষ্টনে কবিমনের তন্ত্রীতে জেগে উঠেছে সেই বিয়োগ-বিজন-বেদনা, সেই মেঘদূতবাহী রুদ্ধসঘন পুঞ্জ দুঃখ-গাথা। আর সেই বিরহ-আর্ত মন নিয়ে কবির যাত্রা সুরু হয়েছে বিশ্বের বিরহিনী-প্রেয়সীদের সমবেদনা জানাতে—যাদের চিত্ত-প্রাণ জর্জর হয়ে উঠেছে দুঃখতাপে, অন্তরে যাদেরও সেই বিরহ-বেদনজ্বালা—সেই 'ঈ ভর বাদর, মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।'—তাই অজানিত আশংকায় কবিমনও আকুল হয়ে উঠেছে—

'গগন সঘন অব, তিমির মগন ভব
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘরব,
শাল তাল তরু সভয় তবধ সব
পন্থ বিজন অতি ঘোর,
একলি যাওবি তুঝ অভিসারে ?'

কিন্তু, তাই বলে কী শ্রীরাধা বিরত হবে তার এই অনন্ত অভিসার যাত্রা থেকে, এই শাঙন-গগনে ঘোর ঘনঘটা আর নিরন্ধ্র নিশীথিনীর অন্ধভয়ে ? না !

বিরহিনীর সমব্যথীর কবিমনের উত্তর—না, এ অভিসার যাত্রা স্তব্ধ হবে না—। এই বিরাট শব্দঝংকার-ঘেরা প্রকৃতির অন্ধ-রন্ধ পরিব্যাপ্ত করে যে স্বরাট, মহা-দেবতা হরি,

সেই 'হরি বিনে কৈসে গোঙায়বি দিনে রাতিয়া?' তাই 'গুরু গুরু মেঘ গুমরি' গুমরি' উঠলেও, বিদ্যুৎবিদীর্ণ আকাশের আলো দেখে সেই অঝোর-ঝরা 'রিমঝিম রিমঝিম বরখত নীরদপুঞ্জে' যাত্রা করতে হবে ঐ বর্ষাপ্রকৃতির অমত্তগম্ভীর শব্দ-ঝংকার অনুসরণে। তাই শ্রীরাধার দুঃখ অভিসার,…সেই অনন্ত বাদলঝরা রাতে, সংগে সংগে কবিমনও সেই দুঃসহ দুর্গম অভিযাত্রী, সেই…

'মিনতি বেদনাআঁকা নীরবে চাহিয়া থাকা বিদায়খনে
ঝরঝর ঝরে জল বিজুলি হানে
পবন মাতিছে বনে পাগল গানে।
আমার পরাণপুটে কোন্‌খানে ব্যথা ফুটে
কার কথা বেজে উঠে হৃদয়কোণে।'

কতোবার এসেছে সেই আষাঢ়ের প্রথম দিবস! সেই 'শ্রাবণ বেলা, বাদলঝরা যূথীবনের গন্ধে ভরা।' বা সেই 'বারি ঝরো, ঝরোঝরো ভরা বাদর'। ঝড় হয়েছে, সংগে সংগে সুরু, উতরোল বর্ষণ, আর কবির অন্তরের—

'অন্তরে আজ কী কলরোল, দ্বারে দ্বারে ভাঙ্‌লো আগল
হৃদয় মাঝে জাগ্‌ল পাগল আজি ভাদরে
আজ এমন করে কে মেতেছে বাহির ঘরে।'

বা সেই 'বাদল মেঘে মাদল বাজার গভীর রোলে' কবির অন্তরের

'কোথায় ছিল গহন প্রাণে, গোপন ব্যথা, গোপন গানে
আজি সজল বায়ে…ছড়িয়ে গেল সকল খানে, গানে গানে।'

বা সেই 'আকাশভরা বেদনাতে রোদন উঠে বাজি' যবে তখন

'ঝিল্লি মুখর বাদল সাঁঝে, কে দেখা দেয় হৃদয় মাঝে
স্বপনরূপে চুপে চুপে ব্যথায় আমার চরণ ফেলে।'

কিন্তু তবু, এই ব্যথাবিধুর কবিমনেই বর্ষার কবির শেষ পরিচয় নয়। এমন হয়েছে, বহু যুগের ওপার থেকে যখন আষাঢ় এসেছে, তার প্রথম বর্ষণ-শব্দ সম্পদ নিয়ে আর তার ক্ষিতিসৌরভ-রভস্ নিয়ে, কবিমনেও তখন জেগে উঠেছে অপূর্ব ছন্দিত কলগুঞ্জন-ঝংকার। সারা আকাশ জুড়ে ঝরোঝরো ধারায়, বাদলবাউল যখন তার ঝংকৃত একতারা বাজিয়ে 'নেচে নেচে হল সারা' কবিমনেও তখন ছন্দিত নৃত্যমঞ্জীর—'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মত নাচে রে'—নববর্ষার সজল-শ্যাম নীলঅঞ্জন যখন দিগ্‌দিগন্তে পত্রপল্লবে ছড়িয়ে গিয়েছে… সেই পুলকিত নীপ-নিকুঞ্জ, সেই আনন্দ উল্লসিত দাদুরীর কলরোল, বা সেই আনন্দমুখর ঝিল্লীকানন, উচ্ছল নদীকল্লোল—এই বিরাট প্রকৃতি-বৈচিত্র্যের উল্লাস-স্পন্দিত পরিবেশের মাঝে কবিমনেও বিকশিত হয়েছে কলাপের মত ঐ শতবরণের ভাব-উচ্ছ্বাস—ঐ পাগ্‌লা-হাওয়ার বাদল দিনে ঐ পাগল মনের জেগে ওঠা বা ঐ 'আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া

উল্লাসে কারে যাচে রে…'। কিন্তু এহ বাহ্য। বর্ষার মৌল প্রেরণা তার উদাস-উতল সুরে, যখন সেই 'ভাদর-বাদর বিরহকাতর শ্রাবণ পূর্ণিমাতে' বিরহী কবিচিত্তের অনন্ত প্রশ্ন—

'আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কী এনেছিস্ বল্—
হাসির কানায় কানায় ভরা নয়নের জল ?'

আবার যখন ঘনকৃষ্ণ মেঘের দল সারা আকাশ জুড়ে, দীর্ঘ নীলাঞ্জনছায়া বিস্তার করে আসন্ন-বর্ষণ-প্রতীক্ষায় অমত্ত-গম্ভীর হয়ে উঠেছে—ধূসর পাংশুল মাঠ—নদীপথে ত্রস্ত তরী পাল নামিয়েছে সেই চারদিকের উদাত্ত-অনাহত পরিবেষ্টনীর মাঝে ব্যথাকাতর কবিচিত্তের আকুল অনুরোধ—

'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে
ওরে তোরা আজ যাস্‌নে ঘরের বাহিরে'…।

তবে এও সব নয়। বর্ষার ভৈরব-ভয়ংকর রূপেরও রূপকার, কবি। তাই, যখন ভৈরব হরষে, ক্ষিতিসৌরভরভসে, শ্যামগম্ভীর নবযৌবনা বরষা' আসে, যখন ঐ 'শ্রাবণের গগনের গায়, বিদ্যুৎ চমকিয়া যায়' বা যখন ঐ 'আহ্বান আসিল মহোৎসবে, অম্বরে গম্ভীর ভেরি-রবে' তখনই ঐ অমত্ত-গম্ভীরের আবাহন বন্দন সুরু—ঐ

'নীলঅঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায় সম্বৃতঅম্বর, হে গম্ভীর !' বা ঐ
'মাটির কঠিন বাধা হল ক্ষীণ, দিকে দিকে হল দীর্ণ
নবঅংকুর জয়পতাকায় ধরাতল সমাকীর্ণ—
ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর—হে গম্ভীর !'

বর্ষার এই ভৈরব রূপচিত্র শুধু নতুন নয়, অপূর্ব ও অসামান্য। আর এই ভৈরব-রূপেই বর্ষা-মংগলের প্রথম আবাহন-আগমনী সুরু। ভৈরব-মন্দ্র-কলস্বনে বজ্র-শঙ্খ-মুখর বর্ষামাদল বেজে ওঠার সংগে সংগে কবির চোখের পরে প্রত্যক্ষ হয়েছে ঐ শ্রাবণের বুকের ভেতর লুকিয়ে-থাকা-আগুন, আর সেই আগুনের ভয়ংকর কালো-রূপ।

'ওরে সেই আগুনের পুলক ফুটে, কদম্ববন রাঙিয়ে ওঠে
সেই আগুনের বেগ লাগে আজ আমার গানের পাখার কাছে।'

তাই সেই বহ্নিপ্রভ বর্ষার কাছে কবির আকুল প্রার্থনা—যেন ঐ ভৈরব-ভয়ংকরের নির্দেশ মেনে ঘরের কোণের সকল সংকীর্ণ বাঁধন সীমা লঙ্ঘন করে নিজের হাড়ভাঙা ঐ বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন ঐ ভয়ংকর সুন্দর বেদনার্ত পথে—

'বেদনা তোর বিজুল শিখা জ্বলুক অন্তরে
সর্বনাশের করিস্ সাধন বজ্র মন্তরে।
অজানাতে করবি গাহন, ঝড় সে হবে পথের বাহন
শেষ করে দিস্ আপনারে তুই প্রলয় রাতের ক্রন্দনে।'

এম্‌নি করে, কবিমনের বিভিন্ন-বিচিত্র প্রকাশ এই স্নিগ্ধসজল মেঘকজ্জল বর্ষাকে কেন্দ্র করে,—তাই একদিকে যেমন প্রেম-বিরহার্তির প্রেরণা—

'আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার
দিনের আকাশ মেঘে অন্ধকার।
মনে ছিল আস্‌বে বুঝি, সে কি আমায় পায়নি খুঁজি
না বলা তার কথাখানি জাগায় হাহাকার।'

অন্যদিকে কবিচিত্তের সেই 'মিষ্টিক', অধ্যাত্মপিপাসু সূক্ষ্ম সজাগ মনের স্পন্দ-কাতর অনুভূতি। সেই সীমার মাঝে অসীমের আবাহন, মর্তের মাঝে অমর্তের বন্ধন। তাই বর্ষার ঘনঘটায়, চারদিকে যখন নিবিড়-নীরন্ধ্র আঁধার ঘনিয়ে আসে, বরখত নীরদপুঞ্জের একটানা শব্দ-নৈঃশব্দ্যে যখন মনের মধ্যে নির্জন-নিঃসংগতার মীড় চড়তে থাকে, উতরোল শ্রাবণের আমন্ত্রণে মনে জেগে ওঠে দুর্বার অভীপ্সা-কামনা—তখন অতীন্দ্রিয়ের স্পর্শ-উন্মুখ কবি-অন্তরে যে-নিরন্তর বিরহ-ব্যথা জেগে ওঠে, তা শুধু অন্তর-প্রিয়ার জন্য বা কাব্যের মানসসুন্দরীর জন্য নয়, তা সেই অবাঙমনসোগোচর ভূমার ভাবোপলব্ধির জন্য—সেই অসীম-সুদূরের স্পন্দনস্পর্শ আশায়—

'শ্রাবণ মেঘের আধেক দুয়ার ঐ খোলা
আড়াল থেকে দেয় দেখা কোন্ পথভোলা।
…নানাবেশে ক্ষণে ক্ষণে, ঐ তো আমার লাগায় মনে
পরশখানি নানা সুরের ঢেউ তোলা—।'

তাই তিমিরনিবিড় রাতে মন যখন হয়ে উঠেছে নিরুদ্দেশের পানে উধাও,—উধাও,—তখন

'আমার স্বপ্নস্বরূপ বাহির হয়ে এলো,
সে যে সংগ পেল
আমার সুদূরপারের স্বপ্ন-দোসর সাথে
সেদিন তিমিরনিবিড় রাতে।'

এম্‌নি করে একে একে আষাঢ়-শ্রাবণ-শেষ গড়িয়ে গিয়েছে, প্লাবন-ঢালা বাদল-ধারা সারা হয়ে বিদায়-সুর বেজে উঠেছে, সেই বর্ষারাতের শেষে বহু যুগের ওপারে আবার আষাঢ় অদৃশ্য হতে চলেছে। কবির হৃদয়বীণা তখন মৌন মূক ও সংগীতহারা—। তাই 'বর্ষামংগলে'র বিদায়ে বিদায়ী-সংগীত-অঞ্জলি—আর কবিহৃদয়ের সুসম-সংবৃত প্রশস্তি-প্রণতি-বাণী—

'নমো নমো নমো, করুণাঘন, নমো হে
নয়নস্নিগ্ধ অমৃতাঞ্জন পরশে
জীবন পূর্ণ সুধারস বরষে
তব দর্শনধন সার্থক মন হে,
অকৃপণবর্ষণ, করুণা-ঘন হে॥'

কলেজের ষ্টীমার পার্টি

শ্রীসুনীল কুমার পাইন—৫ম বর্ষ, বিজ্ঞান

কলেজের চিরাচরিত প্রথানুযায়ী এবারেও ষ্টীমার পার্টি জাঁকজমকের ভিতর দিয়ে সম্পূর্ণ হোল। ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গের দুর্গতদের সাহায্যের জন্য ষ্টীমার পার্টির পরিকল্পনা বন্ধ রাখা হোয়েছিল।

বিরাম-পীঠিকা-গৃহ-সম্পাদক শ্রীকাজল কুমার দত্তগুপ্তের নেতৃত্বে এবারকার ষ্টীমার পার্টি সুসম্পন্ন হোল—দাদা-ভাই ও বন্ধুদের সহযোগিতায়। সাধারণ সম্পাদক সুনীতি কুমারকেও জানাই অভিনন্দন—তার সক্রিয় প্রযোজনার জন্যে।

ত্রুটি যে ছিলনা তা বলা যায় না—এ সব ব্যাপারে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নয়—কিন্তু সে ত্রুটির বিকৃত অভিব্যক্তি দেখা দেয় নাই সকলের সক্রিয় সহযোগিতায়।

১৬ই মার্চ—সকাল ৮ টায়—যাত্রা হবে সুরু—সম্পাদক জানিয়ে দেন মুখে মুখে—নোটিশ পাঠিয়ে দেন প্রত্যেক বিভাগে—আর কলেজের বারান্দায় কালো বোর্ডের উপরও লাল আর নীল লেখা ঘোষণা করে এ বার্তা। এক সপ্তাহ দেরী আছে তবু আন্তঃবিভাগীয় টেবিল টেনিস্ প্রতিযোগিতার শেষমীমাংসার দিন যায় পেছিয়ে—সম্পাদক ব্যস্ত। চরম সার্থকতা আসবে কিনা এ সন্দেহে তাঁর মন বিগ্‌ড়ে-যাওয়া পেণ্ডুলামের মতই অস্থির, অনিয়মিত ও সামঞ্জস্যহীন।

ঠিক আটটায় ষ্টীমার ছাড়্‌বে—এ ছিল কড়া নির্দ্দেশ। এ জন্যে দেখা গেল চাঁদপাল ঘাটে জেটির সামনে অনেক ছেলে জমে গিয়েছে ৮টার সময়। আমিও ঠিক সময়ে পৌছ্‌লাম—ষ্টীমারটার দিকে দৃষ্টি চালিয়ে দিলাম। সাড়ে ৮টা বাজ্‌ল—শিক্ষকদের মধ্যে এসেছেন দেখলাম অধ্যক্ষ জে, সি, সেনগুপ্ত, ডাঃ সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ এন কে সেন, আর সংখ্যা-বিজ্ঞানের অধিনায়ক মহাশয়। মেয়েরাও এসে গেছেন ইতিমধ্যে—সংখ্যায় তাঁরা ৭।৮ জন—গত বারের তুলনায় চারগুণ।

শুন্‌লাম আরও কিছুক্ষণ দেরী করা হবে, কারণ চতুর্থ-বর্ষের ছাত্ররা এসে পৌছান নাই—এবারে অধ্যক্ষ মহাশয় ব্যস্ত হোয়ে পড়েছেন তাড়াতাড়ি ষ্টীমার ছাড়বার জন্য। আমিও বেরিয়ে আসি ষ্টীমার থেকে—সোজা রাস্তায়, কল্যাণের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়—কিছুক্ষণ পরে চক্ষু বিস্ফারিত করে দেখা গেল—দূরে, বেশ কিছু দূরে, তিনজন চতুর্থ বর্ষের ছাত্র আস্‌ছেন—তাঁরা বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক রমণী ঘোষ, সূর্যকুমার চ্যাটার্জি ও গত বছরের ইউনিয়নে বিরোধী দলের নেতা—দীপ্তেন। যাক্ ষ্টীমার এবার ছাড়্‌বে!

জেটির গা থেকে "হাওড়া" ষ্টীমার সরে আস্‌তে লাগ্‌লো একটু একটু করে—যাঁরা

যাবার তাঁরা সবাই তরীবক্ষে—যাঁরা ফেরার পথযাত্রী তাঁরা অদূরে জেটির উপর—দাঁড়িয়ে। আকাশটা মেঘ্‌লা—আবহাওয়াটা তাই আরও সুন্দর—ঝির্ ঝির করে বাতাস দিচ্ছে, তার মধ্যে তীব্রতাও আছে বেশ। যাত্রালগ্নের মিষ্টি আবেশ কেটে উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই কর্ম-চঞ্চল হোয়ে ওঠে ষ্টীমার—মাইক জানিয়ে দেয়—"This is Presidency College Broadcasting Station," তার পর মাইকে আরম্ভ হয় মিলন গুপ্তের mouth organ; সত্যিই সুন্দর। ষ্টীমারের ডেকের উপর চারিধারেই ছেলেদের গ্রুপ হয়ে গেছে—তাস, ক্যারম্, দাবা সবই চল্‌ছে—এক কোণে ঘেরা অংশে ওয়েষ্টার্ণ টিউনের মাধ্যমে হিন্দীগানের তালে তালে ছেলেরা বল্‌ড্যান্সের বৃথা চেষ্টা কর্‌ছেন। শিক্ষক্‌দের জন্য নির্দিষ্ট স্থানের দিকে বেশ গল্পে জমে রয়েছেন তাঁরা। পাশের রেলিঙ্গে বসে কল্যাণ এরিখ্ মেরিয়া রেমার্কের "Three Comrades" এর বঙ্গানুবাদ পড়বার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন—মেয়েরা একটা টেবিলের উপর বসে দাবা খেল্‌ছেন—কিন্তু বাতাসের তীব্রতা তাদের সে চেষ্টা দেয় বান্‌চাল করে। চিত্রা সরকার, দীপালি ঘোষাল রেলিঙ্গের ধারে দাঁড়িয়ে—দৃষ্টি তাঁদের হয় গঙ্গার ঘোলাটে জলের ছোট ছোট ভেঙ্গে-পড়া ঢেউএর দিকে—না হয় দূরে—ওপারের শ্যামল বনানী বা মেঘলা আকাশের দিকে। মালতী মুলকি আর বিভা ভট্টাচার্য—মুখোমুখি দাঁড়িয়ে—হয়ত ভাবছেন—দূরে ব্যোটানিক্সে কত algae, কত Bryophyta আছে ইত্যাদি।

ওধারে একটার পর একটা হিন্দীগান বেজেই চলেছে—আর সময়ও কাট্‌ছে ধীরে ধীরে। ডেকের পাশে সিঁড়ির উপর একদল ছেলে বিচিত্র ভঙ্গীমায় দাঁড়িয়েছে ক্যামেরার মুখোমুখি—ক্লিক্ করে শব্দ হয়—ক্যামেরার ভিতর ফিল্ম থাক্‌লে হয়ত ছবি উঠ্‌বে। নীচের দিকে নেমে যাই—দেখি ইডেন হিন্দু হষ্টেলের Cheap Canteen এর নরেনবাবু—এধারে ওধারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—দেখছেন কটার সময় খাবার বন্দোবস্ত করা যায়। খাবারের ভার তাঁরই উপর দেওয়া হয়েছে।

হিন্দী গানের মাঝে মাঝে মিলন গুপ্তের mouth organ কানে ভেসে আসে—ষ্টীমার ধীরে ধীরে এগোতে থাকে ডায়মণ্ডহার্‌বারের দিকে—মাঝে মাঝে সূর্য মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারবার চেষ্টা করে।

কাজল দত্তগুপ্তের শারীর বিদ্যায় অনার্স, সেজন্য পক্ষপাতিত্ব করেন আমাদের একটি কেবিন ছেড়ে দিয়ে। কিছুক্ষণ কেটে গেছে—ঘড়ির দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখি ছোট কাঁটাটা ঢলে পড়েছে ১২ টার ঘরে—একটু পরেই সম্পাদকের নির্দেশে ছাত্রদের কিউ করে লাইন দিতে দেখা গেল Central office এর সাম্‌নে—শুন্‌লাম খাবারের ছাড় পত্র মিল্‌বে এখানে।

৩।৪ দল হয়ে যাবার পর আমাদের নামতে হোল দক্ষিণ হস্তের কার্য সমাপনের জন্য। খুবই তৃপ্তি পেলাম যখন দেখ্‌লাম—মেয়েরাই ভার নিয়েছেন পরিবেশনার—দামী শাড়ীর নিম্নাংশ ময়লা জল কাদায় নষ্ট হয়ে গেছে সে দিকে তাঁদের খেয়াল নেই—তাঁরা তাঁদের সাধ্যমত সহযোগিতা দেখিয়ে—এ সুন্দর পরিবেশকে করে তুলেছেন প্রীতিদায়ক।

সুশৃঙ্খলার সাথে দুপুরের আহার পর্ব শেষ হ'য়ে গেল। আবার সকলকে দেখা গেল ডেকের উপর জমায়েৎ হতে—শিক্ষকেরা কেবিনে বসেই আহার পর্ব শেষ করলেন। মাইকের ভার যাঁদের উপর ন্যস্ত ছিল তাঁরা আবার সুরু করলেন কর্ম্মসূচী—কয়েকটা হিন্দী রেকর্ড হবার পর আরম্ভ হল কণ্ঠসংগীত—যিনি গাইতে কখনও জানেন না, তিনিও মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে দিলেন—মনে হ'ল কর্ণ-পট বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

আকাশে আরও মেঘ জমে উঠেছে—বাতাসও জোরালো—টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টিও আরম্ভ হয়েছে। ডেকের সাম্নের দিকে যাঁরা ছিলেন তাঁরা পিছিয়ে এলেন—বৃষ্টিতে ভেজার যাঁদের অভিরুচি বলে মনে হ'ল তাঁরা শান্ত ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন।

সম্পাদক জানান ৪ টার সময় চা মিল্‌বে—৪টা প্রায় বাজে—আরও জানানো হ'ল যাঁরা যেখানে দাঁড়িয়ে, বসে বা শুয়ে আছেন তাঁরা সেখানেই থাক্‌বেন—স্থান পরিবর্তন কর্‌লে চা বা বৈকালিক আহার পরিবেশনায় বাধা সৃষ্টি হবে। তাঁর কথা সকলেই হয়ত রাখ্‌তেন, যদিনা প্রকৃতি বাধা দিতেন। বাতাস আরও তীব্র হয়ে ওঠে—বৃষ্টির গতিও এলোমেলো—সবাই কেবিনের দিকে ছোটে—কিন্তু কেবিন তো মাত্র ছয়টা—৩০০ ছেলের স্থান সঙ্কুলান তো হতে পারে না সেখানে। বেলা দুটার সময় ষ্টীমার কল্‌কাতাগামী হয়েছে—ইতিমধ্যে বেশ কিছুটা আমরা এগিয়ে এসেছি।

ওধারে মাইকে রত্না ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে মেয়েদের গান বা "যা খুসি" আরম্ভ হয়েছে—একলাইন গাইছেন—তারপর হেসে উঠ্‌ছেন। যাক্ এধারে চা এসে গেছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেই সম্পাদক কর্মীদের সাহায্যে ঠিক সময়ে কাজ আরম্ভ করলেন। জানা গেল সকলেই চা আর খাবার পেয়েছেন। ওধারে বেলা একটু একটু করে পড়ে এলো—বৃষ্টি ও বাতাস দুই-ই কমে আসে। মেয়েদের প্রোগ্রাম চলেছে তো চলেছেই—তবে একধার দিয়ে শান্তি, তাতে বিরক্তির উদ্রেক হয় নাই।

দূরে বোটানিক্সে একটি ঘর থেকে একজন ভদ্রলোক নিশান ওড়ান, অধ্যক্ষ মহাশয় তাতে সায় দেন।

ধীরে ধীরে কর্মচঞ্চল দিন ফুরিয়ে আস্‌ছে—কালো রাত্রি ঘোষণা কর্‌বে তার আগমন একটু পরেই, তাই ঘোলাটে সন্ধ্যা একটু একটু করে এগিয়ে আস্‌ছে। পশ্চিম গগনে সূর্য জ্বলন্ত একটা অগ্নিকুণ্ড—তার পাশে হাল্কা মেঘ গুলো ধোঁয়ার মত ভেসে বেড়াচ্ছে। ঝির ঝির করে বাতাস বইছে—স্নিগ্ধ হলেও শীত শীত কর্‌ছে। মাইকে সম্পাদককে ধন্যবাদ জানিয়ে দেওয়া হয়—তারপর মাইক বন্ধ হয়—সবাই তৈরী হয়ে নেয়। ইতিমধ্যে সন্ধ্যার আব্‌ছা অন্ধকার আমাদের ষ্টীমারটাকে ঘিরে ফেলেছে—দূরে চাঁদপাল ঘাট থেকে আলো দেখা যাচ্ছে। জেটির গায়ে এসে তরী ভিড়ে। সাড়ে ৬টা বেজেছে—সবাই নেমে যাবার জন্যে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে—অভিযান হ'ল শেষ। সমস্তদিনের নির্মল আনন্দের আবেশ রয়েছে সবার মনে—১০ ঘণ্টার অভিজ্ঞতা একদিনেই কখনও ম্লান হয়ে যায় না, এর রেশ থাক্‌বে বহুদিন।

গ্রন্থ-পরিচয়

অধ্যাপক শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

কবিগুরু : শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। ওরিয়েণ্ট অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস। তিনটাকা বারো আনা ॥

রবীন্দ্রদর্শন : শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোং। দুইটাকা ॥

রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত কোন আলোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হলে সুধী পাঠকবর্গের আনন্দবোধ হয়। গত দুতিন বছরে "রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা" ভিন্ন অন্য কোনও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আমার নজরে পড়েনি। কাজে কাজেই একসঙ্গে দুজন প্রথিতযশা লেখকের রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত গ্রন্থ হাতে আসায় খুশি হয়েছি। স্বল্পোদকেও সূর্যালোক ধরা পড়ে। গ্রন্থ দুখানির অবয়ব বৃহৎ না হলেও তাদের সীমায়িত পরিধিতে মননশীল রসবোধের সন্ধান মিলেছে, তার জন্য সর্বাংশে সাধুবাদ জানানো উচিত।

অমূল্যধনবাবু রবীন্দ্রনাথের কাব্য গ্রন্থগুলির বিচার করেছেন, সুতরাং তাঁর আলোচনা মূলত সাহিত্যিক-বিচার। আর হিরণ্ময়বাবু রবীন্দ্রনাথের দার্শনিকতার রূপ-নির্ণয়ে ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু অমূল্যধনবাবু হেগেলীয় ক্রমবাদের সূত্র ধরে কাব্যবিচারে রত এবং হিরণ্ময়বাবু কাব্যবিচারের মধ্য দিয়ে দার্শনিকতত্ত্বসন্ধানী। অমূল্যধন-বাবুর গ্রন্থে প্রস্তাবনা ও পরিশিষ্ট সহ রবীন্দ্রকাব্যের ক্রমবিকাশ আলোচিত হয়েছে। লেখক খ্যাতনামা ছান্দসিক ও ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক। তাঁর এই গ্রন্থখানি সাহিত্যানুরাগী সুধীবৃন্দ সাগ্রহে পাঠ করবেন এ-আশা নিশ্চয়ই করব।

কাব্যের ব্যাখ্যার নবত্ব সমালোচনার প্রাণ। যখন কোন সমালোচক তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনায় অগ্রসর হন তখন তাঁকে আমরা সাগ্রহে অনুসরণ করে থাকি। অমূল্যধনবাবুর ব্যাখ্যার নবত্বে রবীন্দ্রনাথের কোন কোন কাব্য ও কবিতা যে অনাস্বাদিতপূর্ব মাধুর্যলাভ করেছে এ-কথা দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করা চলে। 'সোনার তরী' ও 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতা দুটির ব্যাখ্যা অথবা 'নৈবেদ্য', 'খেয়া' ও 'পূরবী'র বিশ্লেষণ তাঁর সমালোচক-খ্যাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবে। "রবীন্দ্রকাব্যের ক্রমবিকাশ" মূলত একটি বড়ো বইয়ের খসড়া। আমরা বড়ো বইটির আশু প্রকাশ কামনা করি।

কিন্তু অমূল্যধনবাবুর দৃষ্টিকোণ ও বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে সবিনয়ে দুএকটি কথা বলতে চাই। সমালোচনার ক্ষেত্রে আমি লক্ষ্য করেছি যে বহুক্ষেত্রে সমালোচক পূর্ব থেকে পরিকল্পিত মানদণ্ড নিয়ে অগ্রসর হন এবং কাব্যের উপর তাকে আরোপ করেন। এই ছক-বাঁধা সমালোচনাই Procrustean bed. সূত্রের খাতিরে কাব্যকে কোথাও টেনে কোথাও চেপে ছকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ফর্‌মুলার বাঁধনে কি কোনও মহৎ শিল্পীকে বাঁধা যায়? রবীন্দ্রনাথ যে নিজেই লিখেছেন: "আমারে বাঁধবি তোরা, সে বাঁধন কি তোদের আছে?"

অমূল্যধনবাবুও যে এই দোষমুক্ত হতে পারেননি তার বহু প্রমাণ গ্রন্থমধ্যে রয়েছে। তাই 'গানভঙ্গ' ও 'পরশ পাথরে'র মধ্যে তিনি মর্মগত মিল দেখেন, 'বিজয়িনী' কবিতায় "প্রত্যক্ষ সরল সত্যের কাছে কল্পনা কৌতুক ও রঙ্গবিলাস"-এর পরাজয় দেখেন। কিম্বা ধরা যাক 'কল্পনা'র কথা। তিনি লিখেছেন: 'সোনার তরী'

ও 'চিত্রায়' যে কল্পলোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাহা হইতে এই জগৎব্যাপী ও জীবনব্যাপী সত্য বিভিন্ন। এই সত্য হইতে নিস্তার কোথাও নাই, ইহা আমাদের স্বপ্ন সুন্দর চিরপোষিত কল্পনাকে বঞ্চিত করে।"

এ-কথা সর্বজন স্বীকার্য যে 'কল্পনা'র 'দুঃসময়', 'বিদায়', 'বর্ষশেষ', 'অশেষ' প্রভৃতি কবিতাগুলিতে কঠোর জীবনসত্যার্জনের আকাংক্ষা প্রকাশিত কিন্তু একথাও কি সমভাবে সত্য নয় যে, প্রাচীন ভারতের রূপহর্ম্যে ফিরে যাবার পিপাসা ঐ কাব্যেই আছে? সমালোচক তাঁর ছকের খাতিরে 'মদন ভস্মের পর' কবিতাটিকে যথার্থ ভস্ম করেছেন।

আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কাব্যবিচারে যে কোনও ছক হার মানতে বাধ্য। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। কল্পনা কাব্যের 'বিদায়' কবিতাটি (গান) রচিত হয় ৭ই আশ্বিন ১৩০৪। কবিতাটিতে পড়ি:

অমর মরণ রক্ত চরণ নাচিছে সগৌরবে।
সময় এবার হয়েছে নিকট বাঁধন ছিঁড়িতে হবে॥

কিন্তু ঐ একই তারিখে লেখা হয়েছে: যামিনী না যেতে জাগালে না কেন
বেলা হল মরি লাজে॥

কবিমনের দুইটি স্বতন্ত্র 'মুডে'র প্রকাশ কবিতাদ্বয়ে প্রকাশ পেয়েছে। 'কল্পনা'র 'বৈশাখ' কবিতার রুদ্রদাহকে তিনি ব্যবহার করেন কিন্তু 'বর্ষামঙ্গল' 'শরৎ' 'বসন্ত' কবিতাগুলিকে তিনি বিস্মৃত হন। তাছাড়া 'কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ' গানটি কি খেয়া-গীতাঞ্জলির পূর্বাভাষ নয়?

'গীতাঞ্জলি'র প্রসঙ্গে তাঁর আলোচনাকেও আমার অভ্রান্ত মনে হয় না। তিনি লিখেছেন: "গীতাঞ্জলির আদর্শ কর্মযোগ নহে, এক প্রকার অপার্থিব রহস্য ও মাধুর্যে পরিপূর্ণ প্রেমযোগ। ইহার দেবতা পার্থসারথি নহেন, তিনি গোপীজন বল্লভ।" এই মন্তব্যকে আমি একদেশদর্শী বলতে চাই। কেননা, গীতাঞ্জলিতে 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি', 'ভজন পূজন সাধন আরাধনা', 'বিপদে মোরে রক্ষা করো', 'আরো আঘাত সইবে আমার', 'এই করেছ ভালো নিঠুর' কবিতাগুলিও আছে। এর সুর 'নিত্য বৃন্দাবনে'র সুর নয়।

'বলাকা' প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন "প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক Bergsonর প্রভাব কবির উপর পড়িয়া থাকিতে পারে কিন্তু উপনিষদের 'চরৈবেতি' এই বাণীর মধ্যেই কবি তাঁহার মুক্তির সূত্র খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন।" রবীন্দ্রনাথের জীবনে বহু মতের ও পথের, তত্ত্ব ও সাধনার প্রভাব পড়েছে একথা সকলেই স্বীকার করবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি অর্থাৎ তাঁর দার্শনিক মতামত তাঁর নিজস্ব।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত, অমূল্যবাবু 'চরৈবেতি'কে পেয়েছেন উপনিষদে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'চরৈবেতি'র স্থান 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-গ্রন্থে (৭, ১৫, ১-৫)।

রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলির আলোচনা সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আমার মতের পুরোপুরি মিল দেখতে পাইনি। কেননা লেখক "নবজাতক শেষলেখা" পর্যায়ে দেখেছেন "কবির বাস্তব বোধকে আচ্ছন্ন করিয়া একটা অতীন্দ্রিয় বোধ এই সময়ে প্রবল হইয়া উঠিতেছে।" কিন্তু আমরা এই পর্বেই পড়ি 'পক্ষীমানব', 'আফ্রিকা', 'আহ্বান', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'বুদ্ধভক্তি', 'ওরা কাজ করে' প্রভৃতি অসংখ্য কবিতা।

পরিশিষ্টে 'মানসী' কাব্যের যে আলোচনা যোজনা করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য যুবজনহিত। সুতরাং তার বিশেষ আলোচনা করলাম না।

শেষে উল্লেখ করব তাঁর শব্দ প্রয়োগের দোষগুণ। নতুন শব্দ ব্যবহার করে তিনি আমাদের পরিভাষা বিরল সমালোচনা সাহিত্যের ক্ষেত্র প্রশস্ত করেছেন কিন্তু কদাচ, তত্রাচ, অপিচ, ইত্যাকার প্রভৃতি শব্দ পীড়াদায়ক বলে মনে হয়েছে। তিনি যে 'বর্তায়মান' শব্দ ব্যবহার করেছেন, সে প্রয়োগ ব্যাকরণ মতে অশুদ্ধ।

অমূল্যধনবাবুর বিচারের ভাষা সহজ, স্বচ্ছ ও যুক্তিবহ। কিন্তু আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি ব্যর্থতার

পরিচয় দিয়েছেন। যেমন ধরুন রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর উচ্ছ্বাস—"একটা অতি কোমল, স্থূল হস্তের স্পর্শকাতর রহস্যোন্মুখ ছন্দোবিলসিত অধীরতাকম্পিত দীপশিখার মত শিহরণ করিতে করিতে একটা পরিক্ষীয়মান মূর্চ্ছনার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়, রাখিয়া যায় একটা অতৃপ্ত স্পন্দন। এ যেন প্রণয়োন্মুখ বিরহখিন্ন তরুণীচিত্তের স্বতঃ প্রকাশ।" এর কি দরকার ছিল?

'রবীন্দ্র-দর্শন' গ্রন্থখানিতে লেখক যথাক্রমে বস্তু পরিচয়, দর্শনের মার্গ, বিশ্বের রূপ, সত্যোপলব্ধি, মানুষের ধর্ম ও সমালোচনা—এই ছয়টি অধ্যায়ে অতি সহজ করে তাঁর বক্তব্যকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর গ্রন্থে কোথাও পাণ্ডিত্যের আস্ফালন নেই, দার্শনিক তত্ত্বজটিলতা নেই, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গ্রন্থপাঠে গভীর তৃপ্তি বোধ করি। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর রস-উপলব্ধির সহায়ক হবে এই বইখানি।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "My religious life has followed the same mysterious line of growth as has my poetical life" [Religion of Man]. রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনাকালে বুদ্ধিমান পাঠক অবশ্যই এই আপেক্ষিকতাবাদ লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-জীবন বা অধ্যাত্মজীবন, তাঁর ব্রহ্মানুভূতি ও বিশ্বানুভূতির মূল "আমার জন্ম যে-পরিবারে সে-পরিবারের ধর্মসাধন একটি বিশেষ ভাবের। উপনিষদ এবং পিতৃদেবের অভিজ্ঞতা, রামমোহন এবং আর আর সাধকদের সাধনাই আমাদের পারিবারিক সাধনা। আমি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। জাতকর্ম থেকে আরম্ভ করে আমার সব সংস্কারই বৈদিক মন্ত্র দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, অবশ্য ব্রাহ্মমতের সঙ্গে মিলিয়ে।" মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন মহর্ষির জীবন ও সাধনার অদ্বৈতযোগ। "পিতার কাছে গায়ত্রী মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ পেয়েছি। তখন আমার বয়স বারো বৎসর হবে। এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হোত বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক। ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই ভূলোক, অন্তরীক্ষ, আমি তারই সঙ্গে অখণ্ড। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি-অন্তে যিনি আছেন তিনিই আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব; বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা এক ধারায় মিলেছে।" (মানুষের ধর্ম)

প্রায় কৈশোর কাল থেকে এই উপলব্ধি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখা যায়। সুতরাং রবীন্দ্র-দর্শনের মূলভিত্তি কোথায় বোঝা গেল। তার সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের ও ধর্ম-সাধনার বিভিন্ন ধারা সুফী, সন্ত, বৈষ্ণব, বাউল সব ধারা এসে রবীন্দ্র মানসসমুদ্রে মিলিত হয়েছে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ রবীন্দ্রনাথের দার্শনিকবোধে পাওয়া যায় কিন্তু সেও রবীন্দ্রনাথের স্বোপলব্ধির স্পর্শযুক্ত। পাশ্চাত্যদর্শনের সঙ্গেও তাঁর যোগ ঘনিষ্ঠ কিন্তু কারও প্রতিধ্বনি তাঁর রচনায় মিলবেনা। কারণ রবীন্দ্রনাথের দার্শনিকতা মস্তিষ্ক বা বুদ্ধিলোকে আবদ্ধ নয়, তার উৎস উপলব্ধি লোক। রবীন্দ্রনাথের সর্বেশ্বরবাদ, বিশ্বানুভূতি, জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সমন্বয়বাদ প্রভৃতির যে-আলোচনা হিরণ্ময়বাবু করেছেন তা যুগপৎ পাঠককে চিন্তার খোরাক এবং রসের পানীয় জোগাবে।

আমি দর্শনের খাস ছাত্র নই। তবুও গ্রন্থখানি পড়ে আমি গভীর আনন্দ পেয়েছি। সেই দাবিতেই গ্রন্থের উৎকর্ষবিধান সম্পর্কে দুএকটি মন্তব্য করতে চাই।

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক-উপলব্ধির কি স্তর-পরিক্রমা আছে? অর্থাৎ যিনি বালক বয়সে উপনিষদের শ্লোক কণ্ঠস্থ করেছিলেন তাঁর দার্শনিক-বোধের পরিণতি কোন পথে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যের সমন্বিত মাধ্যমে তাঁর বিচার করলে ভালো হোত। বিশেষ বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা করলেও গ্রন্থখানি প্রায় পূর্ণাঙ্গ বলা চলে। তবুও যেমন আমরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে করে থাকি, রবীন্দ্র-দর্শনের আলোচনায় সে-রীতি ব্যবহার করা কি যায় না?

দ্বিতীয়তঃ, রবীন্দ্র-দর্শনের অন্যতম জটিলতত্ত্ব জীবনদেবতাবাদ সম্পর্কে একটি পৃথক আলোচনা থাকা দরকার ছিল। তৃতীয়তঃ, তিনি 'বলাকা'র 'চঞ্চলা' কবিতার যে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন, অর্থাৎ "স্থানের রঙ্গমঞ্চে, কালের

কাঠামোতে, রূপের রাজ্যে পরমসত্তার এই যে প্রকাশ তা নিত্যচঞ্চল, তা গতিশীল। রূপ হতে রূপান্তরে তাঁর নিত্যই ছোটাছুটি। বলাকার কবিতায় তাঁকে নদীর গতিশীলতার সহিত তুলনা করা হয়েছে। হে বিরাট নদী……ইত্যাদি।" এই ব্যাখ্যাকে আমি স্বীকার করতে পারিনি। তিনি যাঁকে পরমসত্তা বলেছেন 'চঞ্চলা' কবিতার মধ্যে তার পরিচয় নেই, থাকতে পারে না। চতুর্থতঃ, গ্রন্থকার Religion of Man-কে যত ব্যবহার করেছেন, Creative Unity, Personality, Sadhana প্রভৃতিকে তেমনি প্রায় বর্জন করেছেন। রবীন্দ্র-দর্শনের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদগুলিরও স্থান আছে। তিনি সে-গুলিকে কী ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তার কোনও আলোচনা এ-গ্রন্থে নেই। কিন্তু না থাকুক তবুও বইখানির ভূমিকায় সুবোধবাবু যা লিখেছেন আমি সে-সম্বন্ধে একমত।

বঙ্কিম মানস : অরবিন্দ পোদ্দার ॥ ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড ॥ পাঁচ টাকা ॥

আধুনিক কালের সাহিত্যজিজ্ঞাসায় 'বিশুদ্ধ রস'বাদী দৃষ্টির প্রতিবাদে সমাজবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিপ্রয়োগ ক্রমশ দৃঢ়মূল হচ্ছে, এটা আশা ও আনন্দের কথা। বাংলাসাহিত্যবিচারে এই দৃষ্টিভঙ্গি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অপাংক্তেয় হয়েই ছিল কিন্তু 'বঙ্কিম-মানস' যে এই অচলায়তনী মনোবৃত্তিকে ভাঙতে পেরেছে সেখানেই এর বিশেষ কৃতিত্ব।

'বঙ্কিম-মানস' গ্রন্থখানিতে লেখক প্রাক্-বঙ্কিম এবং বঙ্কিম-সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিক পটভূমি, তার অর্থনৈতিক রূপান্তর, নব নব শ্রেণীর উদ্ভব, শ্রেণী-বিন্যাসের পরিবর্তিত রূপ এবং ইংরাজ-শাসনকালে বিপরীত ভাব-ধারার অনিবার্য দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ প্রভৃতি নির্দেশে যথেষ্ট শ্রম বা বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে যে প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার ধারা বহমান তার উৎস বঙ্কিম-মানস, এবং বঙ্কিম-মানসের রূপান্তরের পিছনে সক্রিয়ভাবে বিদ্যমান যুগ-মানসের সংকট। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদগুলির সাহায্যে বঙ্কিমের মতাদর্শের গতি-পরিণতি নির্ধারণের যে-চেষ্টা তিনি করেছেন, তার ফলে বঙ্কিম-মানস পাঠকের চোখে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলতে হয় যে, ঐতিহাসিক বাতাবরণ রচনায় তিনি প্রশংসনীয় দক্ষতার পরিচয় দিলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি যেন পরিবেশবাদী হয়ে পড়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলাসাহিত্যক্ষেত্রে পদক্ষেপের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে শ্রীপোদ্দার বহু অনুমান লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর 'বঙ্কিমচন্দ্র' (১২৯৭, বঙ্কিমের জীবিতকালে প্রকাশিত) পাঠে জানা যায় যে Rajmohan's Wife রচনার পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র একখানি উপন্যাস লিখেছিলেন। তাছাড়া ১৮১৫ সালে রামমোহনের গ্রন্থ প্রকাশের ঠিক পঞ্চাশ বছর পরে 'দুর্গেশনন্দিনী'র আত্মপ্রকাশ। এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা দেখা না গেলেও মনন-প্রধান সাহিত্যে ও কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে অকল্পনীয় সার্থকতা অর্জিত হয়েছে। সেকালের সব মনীষীই বাংলা ভাষায় তাঁদের সাধনা-লব্ধ ফল প্রকাশ করেছেন। তার পিছনে ছিল আত্মজাগরণ, আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিস্তারের প্রেরণা। কাজে কাজেই "আবাদে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, বঙ্কিম-মানসে এমনি একটা চেতনার বিকাশ কল্পনা করা অসঙ্গত নয়—" মন্তব্যটি বঙ্কিমচন্দ্রকে সুবিধাবাদী পর্যায়ে দাঁড় করায় না কি ?

এই ধরণের একখানি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আলোচনা সম্ভব নয়। ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থখানি একাধারে তথ্যসংগ্রহ ও মননশীল সূক্ষ্মবিচারের যোগফল। আমি চাই সাহিত্যজিজ্ঞাসু ব্যক্তিমাত্রেই এই বইখানি পড়ুন এবং সমাজবাদী চেতনাদীপ্ত সমালোচনার নিরিখে বঙ্কিম-মানসের সঙ্গে পরিচিত হোন।

আমাদের কথা

ছাত্রপরিষদের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী ঃ

প্রত্যেক বছর ছাত্র-পরিষদের কার্য্যবিবরণী লেখা হয় কাজের শেষে অর্থাৎ আমাদের যা কিছু করণীয় তা করা হয়ে গেলে। কিন্তু এবার প্রকাশনা বিভাগের কর্ম্মদক্ষতার ফলে পরিষদের কর্ম্মজীবন লিখতে হচ্ছে তার জীবনের মধ্যাহ্নেই, ফলে এই বিবরণীতে স্থান পাবে আমাদের কাজের একটা অংশ মাত্র।

পরিষদের কর্ম্মভার হাতে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের প্রতিষ্ঠা-সপ্তাহ-উৎসবের আয়োজন করতে হয়। ফলে নতুনত্বের পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ন সম্ভব হয়নি, গতানুগতিকতার পথ এড়াবার স্বপ্ন থাকলেও সামর্থ্য জোটেনি ভাগ্যে। এবারের প্রতিষ্ঠা-সপ্তাহের অন্যতম আকর্ষণ হয়েছিল প্রদর্শনী-বিতর্ক সভা। এলিট সিনেমা হলে প্রদর্শিত রাশিয়ান চিত্র 'জেনারেল সুভোরফ' এবং জে. আর্থার র‍্যাঙ্কের 'গিভ আস দিস ডে' ছাত্র-ছাত্রী-অধ্যাপক নির্ব্বিশেষে সকলের সাধুবাদ অর্জন করেছিল। কলেজের আর্ট্‌স্ লাইব্রেরী হলে অনুষ্ঠিত সান্ধ্য বিচিত্রানুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন সুজিত নাথ এবং তাঁর সম্প্রদায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সুনীল ঘোষ, নচিকেতা ঘোষ প্রভৃতি আরো অনেক প্রখ্যাতনামা শিল্পীবৃন্দ। এই সমস্ত গতানুগতিক অনুষ্ঠান ছাড়া এবছরের প্রতিষ্ঠা সপ্তাহের অন্যতম বিশেষত্ব হচ্ছে প্রাক্তন ছাত্র সম্মিলন। এই সভায় শ্রদ্ধেয় রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি প্রমুখ বাংলার বহু প্রথিতযশা ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি আমার সেইসব ছাত্রবন্ধুদের, যাঁদের অকৃত্রিম ও আন্তরিক সাহায্যে সম্ভব হয়েছিল আমাদের প্রশংসা অর্জ্জন। পার্থসারথি গুপ্ত, বারীণ গাঙ্গুলী, বরুণ দে, বিমল বর্ম্মন, প্রদীপ দাস, তুষার ঘোষ, কাজল দত্তগুপ্ত, রথীন চ্যাটার্জ্জি, সুধীর চক্রবর্ত্তী, বটকৃষ্ণ দে প্রভৃতি ছাত্রদের কর্ম্মোৎসাহই আমাদের আয়োজনকে সাফল্যের পথে এগিয়ে দিয়েছিল। কলেজের অন্যতম ছাত্রী দীপালি ঘোষালের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই আমাদের পক্ষে এলিট সিনেমায় চিত্রপ্রদর্শন সম্ভবপর হয়েছিল। পরিষদের তরফ থেকে তাঁকে আমি জানাই আমার কৃতজ্ঞতা ও অজস্র ধন্যবাদ।

এ বছরের নতুন প্রচেষ্টা হিসাবে নাম করতে পারি শান্তি-সপ্তাহ উৎসবের। এই উপলক্ষ্যে ফিজিক্স্ লেক্‌চার থিয়েটারে ছাত্র-ছাত্রীদের একটি সভা আহ্বান করা হয় এবং শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ ডাঃ যতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় নিম্নলিখিত চারটি বিষয়ের উপর কলেজের ছাত্রদের লেখা প্রবন্ধ পাঠ এবং আলোচনা করা হয় ; শান্তি ও বিজ্ঞান, শান্তি ও সাহিত্য, শান্তি ও জাতীয় পুনর্গঠন এবং প্রগতি-চিন্তাধারা ও প্রেসিডেন্সি কলেজ। এর পর দিন আর্ট্‌স্ লাইব্রেরী হলে বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বহুরূপী অভিনীত 'কাবুকী' নামক নক্সা সকলের সাধুবাদ অর্জ্জন করে। উল্লেখযোগ্য অতিথিরূপে নাম করা যায় কবি বিমল ঘোষের। কলেজের ছাত্রেরা এই অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। দেয়ালী-বিভাগ এই সময় খুব অল্প সময়ের মধ্যে বিশেষ-শান্তি-সংখ্যা প্রকাশ করে কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দেয় ; এর জন্যে গগন দত্ত এবং সুধীর রায়চৌধুরী আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। বিতর্ক বিভাগের সম্পাদক বরুণ দে এই সঙ্গে একটি প্রদর্শনী-বিতর্কেরও আয়োজন করেছিলেন। এই উৎসবের পরিচালকরূপে সত্যেশ চক্রবর্ত্তী অপূর্ব্ব কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দেন। সত্যেশ চক্রবর্ত্তী এবং সুপ্রিয় রায়ের কাছে এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

অনিবার্য্য কারণ বশতঃ রবীন্দ্র-পরিষদ এবার এখনও পর্য্যন্ত কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে উঠতে পারেনি। তবে আমরা আশা করি যে, উৎসাহী কর্ম্মী অরূপ রায় শীঘ্রই নিজের কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দেবেন।

বিতর্ক-বিভাগ খুব কুশলতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। এবারে কলেজে অনুষ্ঠিত বিতর্ক-সভায় বহু প্রখ্যাতনামা প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যাপকগণ যোগদান করেছিলেন।

বিরাম-পীঠিকা বিভাগের সম্পাদক কাজল দত্তগুপ্তের আয়োজিত সাংবাৎসরিক জলবিহার এবার সত্যই অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী করে।

সমাজ-সেবা বিভাগের সম্পাদক বারীণ গাঙ্গুলী এখনও পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য কিছুই করেন নি, তবে করার সময় ও সুযোগ এখনও তাঁর হাতে আছে প্রচুর।

নাট্য-পরিষদ সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি, কারণ, সাধারণতঃ আমাদের বাৎসরিক নাট্যানুষ্ঠান হয়ে থাকে পুজোর বন্ধের আগে।

অধ্যক্ষ যতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অন্যান্য অধ্যাপক মহাশয়দের মূল্যবান উপদেশ ও শুভেচ্ছার জন্য ছাত্র-পরিষদ কৃতজ্ঞ।

ছাত্রী-সম্পাদিকা ঝরণা সেন যোগ্য দক্ষতার সঙ্গে তাঁর বিভাগ পরিচালনা করছেন। এবারে কলেজের প্রতিটি অনুষ্ঠানে আমরা ছাত্রীদের কাছ থেকে যে সাহায্য ও সাড়া পেয়েছি, তার জন্যে ধন্যবাদ জানাই। বিশেষভাবে নাম করতে বাধ্য হলাম ঝরণা সেন, চিত্রা সরকার, বরুণা ভট্টাচার্য্য, দীপালি ঘোষাল ও রত্না ঘোষ দস্তিদারের—এঁদের আন্তরিকতা আমাদের সাফল্যের অনেকখানি জুড়ে আছে।

অভাব-অভিযোগ প্রভৃতি রেখে দিলাম পরের পত্রিকার জন্যে ; কারণ, সমস্ত পথটা অতিক্রম না করলে বোঝা সম্ভব নয় কোথায় আছে সংস্কারের প্রকৃত এবং আশু প্রয়োজন। সকলকে আমার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানিয়ে—

সুনীতিকুমার বসু—সাধারণ সম্পাদক

প্রকাশনা বিভাগ :

গত ডিসেম্বরে কার্যভার গ্রহণ করার পর থেকে বস্তুত আমাকে কোন কাজই করতে হয়নি, দু'বার পত্রিকা বিতরণ করা ছাড়া। অবশ্য এর জন্য গত বছরের কর্মসচিব মানস মুকুটমণির কাছে আমি কৃতজ্ঞ, কারণ পত্রিকা প্রকাশের সব কাজই বলতে গেলে তিনি করেছেন, যদিও আইনতঃ কর্মসচিব আমি-ই। তবে আগামী সংখ্যা দুটো প্রকাশের ভার সম্পূর্ণ আমার ওপর। এবং আমার বিভাগীয় পরিচালন-ক্ষমতার বিচার প্রকাশিতব্য ঐ সংখ্যা দুটোর দ্বারাই করা উচিত।

পত্রিকা প্রকাশ ছাড়া 'দেয়ালী' পরিচালনার ভার-ও আমার ওপর ন্যস্ত হয়েছে। নিয়মিত ও সুষ্ঠু-সুচারুভাবে সম্পাদিত 'দেয়ালী' প্রকাশ করে যুগ্ম-সম্পাদক সুধীর রায়চৌধুরী ও গগন দত্ত তাঁদের সম্পাদন-দক্ষতা ও কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে 'দেয়ালী'র "শান্তি-সংখ্যা" তাঁদের আশ্চর্যসুন্দর সম্পাদনার প্রোজ্জ্বল স্বাক্ষর। এর জন্য আমি নিজেও গৌরবান্বিত, কারণ অন্য সম্পর্ক ছাড়া আইনগতভাবেও তাঁদের সংগে আমার সম্পর্কটা একরূপ অচ্ছেদ্য।

যাই হোক্, শেষ পর্যন্ত তাঁরা আর 'দেয়ালী'র সম্পাদনা করতে স্বীকৃত হলেন না। ব্যক্তিগত কারণে তাঁরা পদত্যাগ করলেন, যদিও তাঁদের পদত্যাগের বিষয় বর্তমানে ইউনিয়ানের বিবেচনাধীন। নবনিযুক্ত যুগ্ম-সম্পাদক পার্থসারথি গুপ্ত এবং তুষারকান্তি ঘোষ আপাততঃ অস্থায়ীভাবে কাজ চালিয়ে যাবেন এবং তাঁরাও আশা করি স্বীয় সম্পাদনাদক্ষতা ও কর্মক্ষমতার পরিচয় দেবেন। আরো আশা করি পূর্বতন সম্পাদকদ্বয়কে আমরা আবার 'দেয়ালী'র সম্পাদক হিসেবে আমাদের মধ্যে পাবো।

সর্বশেষে অনুরোধ ছাত্রছাত্রীরা যেন যথাসময়ে তাঁদের পত্রিকা গ্রহণ করে কর্মসচিবকে ভারমুক্ত করেন।

কল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত—কর্মসচিব

বিতর্ক পরিষদ :

এ বছর আমরা এখন অবধি দুটি প্রদর্শনী বিতর্ক-সভা এবং একটি সাধারণ প্রতিযোগিতামূলক বিতর্ক-সভা আহ্বান করতে সমর্থ হয়েছি। একটি আন্তঃকলেজীয় বিতর্ক-প্রতিযোগিতায়ও আমাদের কলেজ এবার যোগদান করেছে। গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে আমরা তিনটির বেশী বিতর্ক-সভার অধিবেশন করাতে সক্ষম হই নি বলে দুঃখ রয়ে গেল ; তবে ছুটির পর, পাক্ষিক বিতর্ক-সভার আয়োজন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে। বিতর্ক-বিভাগের কার্যক্রমে হয়ত কিছু ত্রুটি পাওয়া যেতে পারে এবং সেগুলির প্রতিকার করবার জন্য আমরা সর্বদা সচেষ্ট থাকব, তবে দুঃখের বিষয় এই যে, যে-প্রেসিডেন্সি কলেজের বিতর্ক-ধারা বিদ্বৎসমাজে যথোচিত খ্যাতিলাভ করেছে, তারই ছাত্রেরা সমষ্টিগতভাবে শিক্ষার এই অত্যাবশ্যক অঙ্গের প্রতি এখনো উপযুক্ত সমাদর প্রদর্শন করেন নি। তৃতীয় বার্ষিক কলা পাঠগোষ্ঠী গত বছরের মাঝামাঝি এক্ষেত্রে প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা দেখিয়েছিল, কিন্তু সেটাও যেন আমরা কিছুদিন ধরে দেখতে পাচ্ছি না। এই ধরণের বিতর্ক-পরিষদ প্রতি বার্ষিক শ্রেণীতে গঠন করতে পারলে হয়ত বিতর্ক-রীতিতে অনভিজ্ঞ ছাত্র-ছাত্রীদের কিছু লাভ হতে পারে।

জানুয়ারী মাসের গোড়ায় ভারতবর্ষের জনসভার নির্বাচন সম্বন্ধে একটি Symposiumএর আয়োজন করতে চেষ্টা করা হয়েছিল, তবে হয়ত যথেষ্ট প্রচারের অভাবে অতি অল্প ছাত্র-সমাগম হয় এবং Symposiumটিকে স্থগিত রাখতে বাধ্য হই। এক সপ্তাহ পরে বার্ষিক প্রতিষ্ঠাতৃ দিবসের প্রদর্শনী-বিতর্ক-সভা আহ্বান করা হয়। বিষয়বস্তু ছিল "A peace move by either of the two power-blocs is, in the present circumtances, futile and foredoomed". প্রাক্তন ছাত্রদের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকদ্বয় শ্রীনির্মল ভট্টাচার্য ও শ্রীঅম্লান দত্ত এবং বর্তমান ছাত্রদের পক্ষ থেকে সনৎ ভট্টাচার্য, সুধাংশু দাশগুপ্ত, অশোকমোহন রায় এবং অসীম দাশগুপ্ত এই বিতর্কে যোগদান করেন। বিশেষ করে প্রথমোক্ত বক্তার ভাষণ খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। ডেভিড হেয়ার ট্রেণিং কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীক্ষেত্রপালদাস ঘোষ এবার সভাপতিত্ব গ্রহণ করে আমাদের বাধিত করেছিলেন।

পরবর্তী বিতর্কসভাটি অনুষ্ঠিত হয় ২১ মার্চে। বিষয় বস্তু ছিল "An examination degree is the only benefit obtainable from a University education. সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শ্রীঅমিয় মজুমদার ও অন্য বিচারকর্তা ছিলেন অধ্যাপক শ্রীঅমল ভট্টাচার্য। বক্তাদের মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে প্রদীপ দাশ (দ্বিতীয় বর্ষ কলা) এবং তৃতীয় বর্ষ কলার অমর্ত্য সেন ও পার্থসারথি গুপ্ত।

২৯এ মার্চ ফিজিক্স্ লেক্‌চার থিয়েটারে আর একটি প্রদর্শনী-বিতর্ক-সভার আয়োজন করা হয়। বিষয়বস্তু ছিল "The forces of peace are today stronger than the forces of war" এবং বিতর্কমহলে প্রখ্যাত শ্রীসাধন গুপ্ত, অধ্যাপক শ্রীঅম্লান দত্ত, শ্রীউৎপল দত্ত, শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত, শ্রীবিশ্বনাথন্ ও শ্রীবিষ্ণু মুখার্জি প্রমুখ মহোদয়গণ এই সভাটিতে যোগদান করেন। এই বিতর্কটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলবার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র এবং অন্যতম বক্তা শ্রীদীপক রায়কে আমার অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শ্রীঅমিয় মজুমদার।

শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের আন্তঃকলেজীয় বিতর্ক-প্রতিযোগিতায় আমাদের কলেজের প্রতিনিধিত্ব করেন সুধাংশু দাশগুপ্ত ও অশোকমোহন রায়। এঁরা যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। দলগতভাবে আমাদের কলেজ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

অভাব-অভিযোগ প্রতি বৎসরেই থাকে, তবে আমি এটুকু বলে শেষ করব যে ইউনিয়ানের বাজেট অধিবেশনের রায় অনুযায়ী যখন আমাদের কলেজের শান্তি-সপ্তাহ অনুষ্ঠানগুলিতে ৫০৲ টাকা দিতে হয়েছে তখন

বিতর্ক-বিভাগে ৩৫০৲ টাকা বরাদ্দই কি যথেষ্ট? এ-ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'ল যে কলেজ ইউনিয়ানের কোন কোন বিভাগে, যেগুলির প্রাধান্য বোধ হয় বিতর্কের চাইতে খুব বেশী নয়, প্রায় দ্বিগুণ বরাদ্দ করা হয়েছে।

যাঁরা আমাকে সকল সময়ে তাঁদের সাহায্য ও সহানুভূতি দান করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। কলেজের বিতর্কসভাগুলিতে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীঅমিয় মজুমদার যে-সক্রিয় সহায়তা এবং উৎসাহ প্রদান করেছেন, তার জন্য আমরা সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকব।

বরুণ দে—সম্পাদক

রবীন্দ্র পরিষদ :

এবারে রবীন্দ্র পরিষদের কার্য-ধারার বিবরণী স্বল্প। কার্যকাল ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি আরম্ভ হওয়াতে এবং আরও দু' একটি কারণে কর্মসূচী বিশেষ দীর্ঘ হয়নি। কার্যভার গ্রহণের পরেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের কোলকাতার সাম্প্রতিক অধিবেশনে কবিগুরুর 'নবীন' গীতিনাট্য মঞ্চস্থ করায় পরিষদ কৃতিত্ব দাবী করতে পারে। কলেজের ছেলেমেয়েদের সামনে কোনো নাটকের অনুষ্ঠান করা এক কথা, আর বিদেশে গণ্যমান্য সুধীদের সামনে সেটা করা অন্য ব্যাপার; তাতে দায়িত্ব অনেক। কারণ বিদেশের প্রতিনিধিরা যখন নিজেদের কর্মস্থলে ফিরে যাবেন, তখন এ অনুষ্ঠান যে শুধু তাঁদের কাছে প্রেসিডেন্সি কলেজের বহুমুখী কর্মধারার একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে তা নয়, রবীন্দ্রকৃষ্টির একটি বিশিষ্ট দিক হিসাবেও তাঁদের মনে রেখাপাত করবে। তাই এ দায়িত্ব নিতে পরিষদ প্রথমে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিল কিন্তু পরে পূর্ণোদ্যমে চেষ্টা করায় অনুষ্ঠান সর্বাংগসুন্দর হয়েছিল।

২রা জানুয়ারি, ১৯৫২, রাত্রি সাড়ে নটায় প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাঙ্গণে বিজ্ঞানকংগ্রেসের জন্যে নির্মিত বিরাট মণ্ডপে কংগ্রেসের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিসহ কয়েক হাজার লোকের সামনে 'নবীন' মঞ্চস্থ করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ করার বাধ্যবাধকতা থাকাতে নাটকটির একটি সংক্ষিপ্ত রূপ নিবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে গীতিনাট্যটির মূল অখণ্ড সুরটি কোনো অংশে ব্যাহত হয় নি। বিভিন্ন কর্মী ও অংশগ্রাহীদের প্রচেষ্টার ফলে সমগ্র অনুষ্ঠানটির মধ্যে একটি সুষ্ঠু রূপ ফুটে উঠেছিল। অনুষ্ঠানের রূপদান করেছিলেন, সংগীতে প্রবীর গুহঠাকুরতা, বরুণ সেনগুপ্ত, রাজর্ষি মজুমদার, দ্যুতীশ দাশগুপ্ত, শিশির সেন, অরূপ রায়, তপতী দেবী, শ্রীলা মহলানবীশ, প্রতিমা সেন, নন্দিতা চৌধুরী, বীথিকা রায় ও বীথিকা মোদক; নৃত্যে মঞ্জুশ্রী চাকী, রিক্তা মজুমদার, মালতী মুলকি, চিত্রা সরকার, মীরা ব্রহ্মচারী, মৃদুচ্ছন্দা রায়চৌধুরী, নন্দিতা মুখোপাধ্যায়, শীলা বসু ও জয়ন্তী দেবী। সাধারণ পরিচালনায় রবীন্দ্র পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য, সংগীত পরিচালনায় প্রবীর গুহঠাকুরতা, নৃত্য পরিচালনায় মঞ্জুশ্রী চাকী সহায়তা করেন। যন্ত্রসংগীতে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীসলিল মিত্রের কাছে আমরা অশেষ ঋণী। আর ব্যবস্থাপনায় বর্তমান সম্পাদককে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রবীর গুহঠাকুরতা ও বিশেষ করে সুব্রত রায়ের কাছে সম্পাদক বিশেষ কৃতজ্ঞ।

এই বিরাট অনুষ্ঠানটির পরেই পর পর দুটো পরীক্ষা এসে পড়ায় এবং ছাত্রদের যথেষ্ট উৎসাহের অভাবে পরিষদের পক্ষ থেকে এধরণের আর কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সম্ভব হয় নি। তবে কিছু সাংস্কৃতিক আলোচনার অনুষ্ঠান করা যেতো, কিন্তু তাও কোন না কোন কারণে রূপগ্রহণ করতে পারে নি। এখনো কয়েক মাস সময় আছে এবং পরিষদের অর্থভাণ্ডারও নিঃশেষিত নয়। সুতরাং ভবিষ্যতে এ বিভাগে বিচিত্র ও হৃদয়গ্রাহী ছোটবড় কয়েকটি অনুষ্ঠান করা হবে, এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

অরূপ রায়—সম্পাদক

জুনিয়র কমন রুম :

পুঁথির শুক্‌নো পাতার বাইরেও যে একটা জীবন আছে তার আস্বাদ পাওয়া যায় এই কমন রুমে। এ-কথা অতি পড়ুয়া ছেলেরাও অস্বীকার করতে পারবে না।

সারা বছর ধরে জুনিয়ার কমন রুম কি করলো, কতটুকু আমোদ পরিবেশন করলো আমাদের ছেলেদের তারই একটা ধারাবাহিক বিবরণ দেবার চেষ্টা করছি।

Session-এর শেষের দিকে হ'লেও প্রথমেই ষ্টীমার পার্টির কথা উল্লেখ করতে হয়।

১৬ই মার্চ রবিবার আমাদের 'হাওড়া' ষ্টীমারটী ছাড়লো চাঁদপাল ঘাট থেকে বেলা ঠিক ৯টার সময়। আকাশ ছিল পরিষ্কার, আর আমরা উল্লাসের মধ্যে এগিয়ে যেতে লাগলাম ডায়মণ্ডহারবারের দিকে। আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয় সপরিবারে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। ডক্টর সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর নির্মল কুমার সেন আর ডক্টর চট্টোপাধ্যায় (সপরিবারে) এসে আমাদের আনন্দ অনেক বাড়িয়ে তুলেছিলেন।

ষ্টীমারের মধ্যে দ্বি-প্রাহরিক আহার আর বৈকালিক চায়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। বৈকাল ৩টার সময় আমাদের ষ্টীমারের মুখ ফিরানো হোল, তখনও আমরা ডায়মণ্ডহারবার থেকে কয়েক মাইল দূরে। ছাত্রদের মধ্যে একটা চাপা অসন্তোষের ভাব ফুটে উঠেছিলো ষ্টীমার ফিরানোর জন্যে।

বৈকালের আবহাওয়াটা ছিল আরও সুন্দর। একটু আগেই এক পশ্‌লা বৃষ্টি হ'য়ে গিয়েছিল। পূর্ণভাবে উপভোগ করলাম গঙ্গার বক্ষ থেকে শেষ সূর্যাস্তের শোভা। চাঁদপাল ঘাটে আবার যখন পৌঁছালাম তখন সন্ধ্যে ৭টা।

* * * * * * * *

Inter Department Table Tennis Tournament কমন রুমের এবছরের একটী নূতন কাজ। প্রত্যেক Department থেকে তিনজন করে ছেলে খেলার সুযোগ পেয়েছিলো। প্রতিযোগিতায় বিজয়গৌরব লাভ করে গণিত বিভাগ। শারীরিক বিভাগ Finalএ উঠেছিলো।

আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় আমাদের কলেজ ক্যাম্প্‌বেলের কাছে হেরে যায়। প্রত্যেকবারের মতই এবারেও নূতন ব্যাট কেনা হয়েছে কয়েকটা। এই ব্যাট প্রসঙ্গে একটা অপ্রিয় সত্য কথা না জানিয়ে পারছি না। আমাদের কয়েকটি ছেলের মধ্যে একটা খারাপ রুচির পরিচয় পেয়েছি, সেটা হচ্ছে ব্যাট থেকে রবার তুলে দেওয়া, বল বদলিয়ে নেওয়া। ভবিষ্যতে এরকম আর না ঘটলে আনন্দিত হব।

* * * * * * * *

ম্যাগাজিন আমাদের কমন রুমে যা আসে তা যথেষ্ট নয়। তাছাড়া সবগুলোই আসে অধ্যাপক মহল হয়ে।

কমন রুমের সংকীর্ণতার অভিযোগ আমার পূর্ববর্তীরা করেছেন প্রচুর ; আমিও যে করছিনা তা নয়।

পরিশেষে আমি আমার অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইউনিয়ানের সাধারণ সম্পাদক সুনীতি বোসকে—প্রতিটি কাজে যার কাছ থেকে পেয়েছি প্রচুর সাহায্য। ধন্যবাদ জানাচ্ছি সখিৎ চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ দাস, বরুণ সেকে যাদের উপদেশ ও সাহায্য না পেলে আমার অনেক কাজ কঠিন হ'য়ে পড়তো।

সহৃদয় অধ্যাপক মামুদের সক্রিয় সাহায্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি।

কাজল দত্তগুপ্ত—সম্পাদক

সমাজসেবা বিভাগ :

যদিও দেশের নিরন্ন এবং বস্ত্রহীনদের অভাব মিটানো সম্ভবপর নয় তথাপি প্রত্যেকবারের মত এবারও আমাদের কলেজ থেকে সাহায্য করা হয়েছে তাঁদের যাঁরা নিয়মিত সাহায্য পেয়ে আসছেন। তা ছাড়া

আমাদের কলেজ থেকে সাহায্য করা হয়েছে আরও দুই একজনকে। জানিনা আমাদের সাহায্য কতখানি সার্থক হয়েছে। অনেক কিছুই করবার ইচ্ছা আছে। বারান্তরে তার খসড়া পেশ করব।

বারীন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—সম্পাদক

খেলাধুলা বিভাগ :

এই বছরের কর্মকর্তামণ্ডলী যথারীতি নির্বাচিত হবার পরে পরিষদের প্রথম বৈঠক ২৫.৯.৫১ তারিখে অধ্যাপক শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে সাধারণ সম্পাদক এবং বিভাগীয় সম্পাদকগণ নির্বাচিত হ'ন ; ফুটবল সম্পাদক ইতিপূর্বেই নির্বাচিত হয়েছিলেন, এবং ছাত্রীরা নিজেরা একজন প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করেন। ২৭ তারিখে আর একটি সভায় এই বছরের জন্য ৬০৫৭৲ টাকার বাজেট গৃহীত হয় ; সভাপতি ছিলেন অধ্যক্ষ সেনগুপ্ত। এই বছরের কাজের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা নীচে দিলাম :

ফুটবল: এই বিভাগের সম্পাদক ছিলেন শান্তনু মুখার্জী এবং অধিনায়ক কল্যাণ দত্তগুপ্ত। নিয়মিত প্রাক্‌টিসে অনেক ছাত্র যোগ দেন, এবং ট্রায়াল ম্যাচের পরে কলেজ টীম গঠন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃকলেজ লীগে আমরা আমাদের গ্রুপে চতুর্থ স্থান অধিকার করি ; হেরম্ব মৈত্র শীল্ড খেলায় দ্বিতীয় রাউণ্ডে বঙ্গবাসী কলেজের কাছে ও এলিয়ট শীল্ডে আমরা সুরেন্দ্রনাথ কলেজের কাছে পরাজিত হই। এবারে অনেকগুলি আন্তঃবার্ষিক খেলার শেষে অধ্যক্ষ বি. এম. সেন চ্যালেঞ্জ কাপ ফাইন্যালে ৪র্থ বর্ষ ৩য় বর্ষের কাছে পরাজয় বরণ করে। এবারে একটি নতুন ধরণের ম্যাচ হয়—অধ্যাপক ও অফিস-কর্মচারীদের মধ্যে। অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে একটি খেলায় ছাত্ররা বিপুলভাবে জয়লাভ করে। প্রতিষ্ঠাতৃ-সপ্তাহের প্রাক্তন বনাম বর্তমান ছাত্রদের খেলায় বর্তমান-দল ২ গোলে জয়লাভ করে। একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—নিয়মিত কলেজ দলে খেলে থাকেন এমন ৩।৪ জন ছেলে কয়েকবার অনুপস্থিত থেকে আমাদের যথেষ্ট অসুবিধার কারণ হয়েছেন, এবং আমাদের ২।১ জন খেলোয়াড় কম নিয়েই খেলতে বাধ্য করেছেন। ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, তার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা দরকার মনে করি।

ক্রিকেট: এই বিভাগের সম্পাদক ছিলেন নারায়ণ দাস গাঙ্গুলী এবং অধিনায়ক ছিলেন অরুণ রায়। অনেক উৎসাহী ছাত্রকে নিয়ে নিয়মিত নেট্‌-প্র্যাক্‌টিস চলে, এবং একটি ট্রায়ালের পরে কলেজ টীম গঠিত হয়। বি ই কলেজ এবং ভবানীপুর ক্লাবের সঙ্গে প্রীতিমূলক খেলায় কোন পক্ষই জয়লাভে সমর্থ হয়নি, এবং আন্তঃকলেজ লীগে আমরা স্কটিশ চার্চ্চ কলেজকে পরাজিত করে অবশেষে সিটি ও ল কলেজের কাছে হার স্বীকার করি। আন্তঃবার্ষিক প্রতিযোগিতায় পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট দল ৪র্থ বার্ষিক দলকে হারিয়ে অধ্যক্ষ এ কে চন্দ চ্যালেঞ্জ কাপ অর্জ্জন করে।

নৌ-পরিচালনা: সম্পাদক দীপঙ্কর ঘোষ এবং অধিনায়ক প্রতীপ মুখার্জ্জীকে নিয়ে গঠিত এই বিভাগটি এবারে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেনি। এই ক্লাবে ৭ জন সদস্য ছিলেন, কিন্তু কলেজের কোন দল গঠন করা সম্ভব হ'ল না বলে আমরা আন্তঃকলেজ খেলাটাতে যোগ দিতে পারিনি। আমাদের কলেজের ছাত্ররা নৌ-পরিচালনার ব্যাপারে একেবারেই আগ্রহ দেখাননা ; এই বিভাগটির জন্য যে ২০০৲ মঞ্জুর হয়, তার থেকে University Rowing Club-এ ১৫০৲ দেবার পরে এই বছরে আর এক পয়সাও খরচ করার দরকার হয়নি। নৌ-পরিচালনা বিভাগকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন এই অবস্থায় বিশেষ কিছু নেই।

টেনিস: এই বিভাগের সম্পাদক ছিলেন বরুণ দে। এই বিভাগটিও বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা দেখিয়েছে বলতে পারিনা। মাত্র ৫ জন সদস্য এই ক্লাবে ছিলেন। আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় আমরা যোগ দিতে

পারিনি কারণ কলেজের পক্ষ থেকে কোন দল গঠন করা যায়নি, তবে এর জন্য সম্পাদককে দোষ দিয়ে লাভ নেই। প্রতিষ্ঠাতৃ-সপ্তাহের খেলায় প্রাক্তন ছাত্র শ্রীজিতেন চৌধুরী ও শ্রী এস এন দেব যোগ দিয়েছিলেন।

Small Area Games: এই বিভাগের সম্পাদক সুজিৎ সরকার, ভলিবলের অধিনায়ক সন্তোষ কর্ম্মকার। আন্তঃবার্ষিক ভলিবল খেলার শেষে পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট দল ৪র্থ বর্ষকে পরাজিত করে অধ্যক্ষ জে ঘোষ চ্যালেঞ্জ কাপ অর্জ্জন করে। আন্তঃকলেজ ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় আমরা দ্বিতীয় রাউণ্ড পর্য্যন্ত উঠি। বাস্কেটবল খেলায় কিছু ছাত্র অংশ গ্রহণ করেন।

হকি: এই বিভাগের সম্পাদক ও অধিনায়ক ছিলেন যথাক্রমে সলিল পাঞ্জা ও অমল চক্রবর্ত্তী। যথারীতি প্র্যাক্‌টিস ও ট্রায়ালের পরে গঠিত কলেজ দল আন্তঃকলেজ লীগ খেলায় অংশ গ্রহণ করে, অবশ্য বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারেনি। এস আর দাশগুপ্ত কাপ খেলার ২য় রাউণ্ডে সেণ্ট জেভিয়ার্স দল আমাদের পরাজিত করে। প্রাক্তন ও বর্ত্তমান ছাত্রদের মধ্যে একটি প্রীতিমূলক খেলা হয়, বিদায়ী ছাত্ররা ২—১ গোলে জয়লাভ করেন। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব যাঁরা করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আমাদের অধিনায়ক অমল চক্রবর্ত্তী।

বাৎসরিক প্রতিযোগিতা: ২১, ১, ৫২ তারিখে বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল মাননীয় শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখার্জ্জী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তীব্র প্রতিযোগিতার পরে প্রবীর গুহঠাকুরতা ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জ্জন করেন। ফুটবল, ক্রিকেট ও হকি ব্লু অর্জ্জন করেন যথাক্রমে কল্যাণ দত্তগুপ্ত, অরুণ রায়, এবং অমল চক্রবর্ত্তী। আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় প্রবীর গুহঠাকুরতা ২০০ মিটার দৌড় এবং রাণিং ব্রড জাম্প—দুটিতেই দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।

ব্যায়ামাগার: মোটামুটি ২০ জন ছাত্র নিয়মিত ব্যায়ামাভ্যাস করেন।

ছাত্রীবিভাগ: সম্পাদিকা চিত্রা সরকারের পরিচালনায় ছাত্রীরা ব্যাডমিণ্টন ও টেনিকয়েট খেলে।

আমাদের অভাব ও দাবী: প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের মূল্যবৃদ্ধির দরুণ আমাদের খরচে কুলানো দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। অধ্যক্ষ ডক্টর সেনগুপ্ত এবারে ছাত্রদের চাঁদার হার বাড়িয়ে ৪৷৷০ করাতে আমাদের সুবিধা হয়েছে, কিন্তু সরকারী বরাদ্দ এখনও ১০০০৲। এই বরাদ্দ বাড়িয়ে ২০০০৲ করলে এবং ছাত্রদের চাঁদা জনপিছু ৫৲ হলে আমরা স্বচ্ছল ভাবে কাজ চালাতে পারি। বছরের পর বছর অবশ্য আমরা এই একই দাবী জানিয়ে আসছি, কিন্তু কর্তৃপক্ষ এখনও অবিচল।

পরিশেষে, আমাদের অধ্যক্ষ, পরিদর্শক শ্রীযুক্ত চ্যাটার্জ্জী, বিভাগীয় সভাপতি, সম্পাদক এবং অধিনায়কদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। প্রতি পদে তাঁদের অক্লান্ত সাহায্য না পেলে আমার পক্ষে কিছু করে ওঠা অসম্ভব হত। পরবর্ত্তী সাধারণ সম্পাদককে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

কল্যাণ দত্তগুপ্ত—সাধারণ সম্পাদক

ছাত্রীসংবাদ:

বলাবাহুল্য যে, বর্ষপরিবর্ত্তনের দু'তিন মাসের মধ্যে ছাত্রীমহল থেকে নূতন কোন সংবাদ পাবার আশা কেউ করেন না। তবু প্রত্যেক বছরই যখন একবার, (বিশেষতঃ এ বছরে দুবার) করে কার্য্যাবলীর বিবরণী পেশ করতে হয়,—তখন চর্ব্বিতচর্ব্বণেই ব্যাপৃত হলাম।

ছাত্রীমহলের সব চাইতে বড় অভিযোগ কমনরুম সংক্রান্ত। প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রীসংখ্যা আর নগণ্য নয় এবং সেই সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান। কাজেই কলেজের কর্তৃপক্ষ যদি ছাত্রীদের কমনরুমের আয়তন বৃদ্ধি করায় একটু মনোনিবেশ করেন, আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো।

কমনরুমের আয়তন অস্বাভাবিক রকম ছোট বলে কোন Indoor Games-এর আয়োজন করাও অসম্ভব। অথচ অনেক ছাত্রীই এ বিষয়ে আগ্রহ পোষণ করেন। তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক কমনরুমেই কিছু ম্যাগাজিন থাকার কথা। দুর্ভাগ্যবশতঃ ছাত্রীমহল এই বিষয়ে একেবারেই বঞ্চিতা। বিভিন্ন পত্রিকা ও ম্যাগাজিন যখন হাতবদল হয়ে এসে কোনক্রমে ছাত্রীমহলে পৌঁছায়, তখন বছর ঘুরে যায়। এ বিষয়েও আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কেননা, ছাত্রীরা শুধু পুঁথিগত পড়াশুনো করতেই এখানে আসেনা। তারা বহির্জগৎ সম্বন্ধেও উৎসুক।

আমাদের পূর্ব্বসূরীরা শুধুমাত্র ছাত্রীদের উদ্যোগে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমরা সে ধারাকে বজায় রেখে গৌরব অর্জ্জন করতে পারবো কিনা, সে সম্বন্ধে আশা বা আশঙ্কা কিছুই পোষণ করি না।

এবার বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অনেক ছাত্রীই অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং সাফল্য অর্জ্জন করেছিলেন। ছাত্রী সংবাদ আপাততঃ এই।

ঝরণা সেন—সম্পাদিকা, গার্লস্ কমনরুম

ইতিহাস সেমিনার :

কলেজ পত্রিকার গত সংখ্যা প্রকাশ এবং আমার সম্পাদকীয় দায়িত্ব গ্রহণের মধ্যবর্তী সময়ে ইতিহাস সেমিনারের দুটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল—যাদের সম্ভাবনার কথা আমার পূর্ববর্তী সম্পাদক গত সংখ্যায় জানিয়েছিলেন। এ দুটিতে দীপ্তেন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অসীন দাসগুপ্ত যথাক্রমে "প্রাচীন ভারতে রাজবর্জিত রাষ্ট্র" এবং "ইতিহাসের ধারা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং পাঠান্তের আলোচনায় উপস্থিত ছাত্ররা এবং শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকমণ্ডলী অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ করে দ্বিতীয় অধিবেশনটিতে আলোচনার তীব্রতা লক্ষ্যণীয় ছিল।

বিদায়ী ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে সেমিনারের এবছরের কাজ সুরু হল। অধ্যাপকমণ্ডলী এবং বিদায়ী ও নবাগত সেমিনার-সভ্যদের একত্র সমাবেশে আন্তরিকতাময় এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল সে অনুষ্ঠানে যা উপস্থিত সকলের মনেই গভীর রেখাপাত করেছিল। তবে সেমিনারের দায়িত্ব আমাদের হাতে আসার পরেকার সময়ের স্বল্পতা এবং এর মধ্যেও অনেকটা সময় সবাই বার্ষিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকায় আমাদের পক্ষে মাত্র দুটির বেশী অধিবেশনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি। এর প্রথমটি ছিল একটি বিশেষ অধিবেশন। এতে আমাদের প্রাক্তন অধ্যাপক ডাঃ চারুচন্দ্র দাসগুপ্ত 'স্লাইড' সহযোগে "প্রাচীন ভারতে গুহা-মন্দির" সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। দ্বিতীয়টিতে আমাদের সহপাঠী বিনোদ শংকর দাস "বংগ-সংস্কৃতি ও কালান্তর" শীর্ষক একটি বাংলায় লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং পাঠান্তের আলোচনায় উপস্থিত অনেকেই যোগদান করেন। গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে আর একটি অধিবেশনের আয়োজন করার ইচ্ছাও আমাদের আছে।

সেমিনার লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যা বর্তমানে একশরও বেশ কিছু বেশী। তাছাড়াও বিলেতের The Historical Association এর মুখপত্র History নামক ষাণ্মাসিক এবং বংগীয় ইতিহাস পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'ইতিহাস' পত্রিকা নিয়মিত আসে। সেমিনারের সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীসুশোভন সরকারের নির্দেশে কলেজ লাইব্রেরী থেকে অনার্স্ ছাত্রদের অবশ্য প্রয়োজনীয় আরও কিছু বই সেমিনারে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হচ্ছে। আশা করি গরমের ছুটি হওয়ার পূর্বেই এ প্রচেষ্টা কার্যে পরিণত করতে পারবো।

সেমিনারের নানা কাজে সহযোগী বন্ধুদের কাছ থেকে যে-সহযোগিতা পেয়েছি সেজন্য তাঁদের আন্তরিক

ধন্যবাদ জানাই। আশা করি তাঁদের সাহচর্যে এবং শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপকদের অনুপ্রেরণায় ঐতিহ্যময় ইতিহাস-সেমিনারের গতিধারাকে প্রাণবন্ত রাখতে সক্ষম হবো।

নীতিশ সেনগুপ্ত—সম্পাদক

অর্থনীতি-দপ্তর :

এটা রিপোর্ট নয়, জবাবদিহি। অনেকটা ব্যাঙ্কিং হিসেবনিকেশের মতো। সারাটা বছরের (মানে তৃতীয় বর্ষের) শেষ ছ'-মাসের যে-কাজ এবং কাজের চেয়ে বেশি যে-ওজর তারই 'লাল-সুতোয়' গাঁথা ফিরিস্তি। 'পুরোনো কাসুন্দী ঘেঁটে লাভ নেই' এটা মহাজনের বাক্য হলেও মহৎজনের বাক্য নয়। আর বিশেষ করে এখানে মহাজন যখন পাঠক আর সম্পাদক !! তাই অথ বিবরণী ঘটিত।

প্রথমেই সুরু উদ্যোগপর্ব। সূচনাতেই, লাইব্রেরী আর সেমিনার, একতলা আর দোতালা—এই করে করে পায়ের চটি-জুতোর আয়ু ক্ষীণ হবার যোগাড়। অবশেষে লালফিতে-নীল-হয়ে-যাওয়া একবিকেলে লাইব্রেরী হতে বইগুলোর স্থানান্তর ঘট্‌লো সেমিনারের স্বল্পালোক কক্ষে।··

আটাশ খানা বইয়ের ওপর বত্রিশটি বিদগ্ধ মনের যে কৈবল্য-কৃষ্টি ঘট্‌লো তাতে অকালে রাঁচিবাস করতে না হলেও 'ভাস্করের' মুক্তকচ্ছ-সমিতি-তে যোগ দেওয়ার উপক্রম। এই পুস্তক-স্বল্পতা-ই এই পাঠগোষ্ঠীর প্রাণ। আর প্রাণী-সংখ্যা বত্রিশ জন। এখানে বইয়ের কণ্ট্রোল আছে, রেশনিং নেই। তাই যখন ক্লাস-মার্কেটে রেফরেন্স-বই Quote হয়, তখনই 'বেয়ার' আর 'বুলের' খেলায় 'হাণ্টিং' সুরু হয়।···

কালে কালে 'বাদল' ঘিরে আসে, তেতলা চুঁইয়ে দোতালায় টপ্‌টপ্‌ করে জল পড়্‌তে সুরু করে। ভাবি কখন এই Leakage এর সাইক্‌ হতে মুক্তি পাবো! মাঝে মাঝে কথা ওঠে, সেমিনারের স্থানান্তরীকরণের কথা। সমস্বরে ঐক্যতান-দাবী করতে থাকি,—'আলো চাই, প্রাণ চাই, চাই মুক্ত বায়ু'। যেখানে Competition আছে (মায় 'লাল-ফিতে' সমেত) সেখানে Welfare নেই।···

পূর্ববর্তী বহু সম্পাদক তাঁদের গতানুগতিক অভাব-অভিযোগ জানিয়ে গিয়েছেন। তবু কাজ কিছু হয়নি। তাই অন্য-অভিযোগ ফিরিস্তি হতে বিরত রইলাম।···

অন্যবারের মত তৃতীয়বর্ষের যে সাধারণ কাজ-কর্ম তা যথারীতি চলেছে। সেই ট্রাডিশন-সমানে-চলার-মতো। কয়েকটা 'প্রবন্ধ-পাঠ-প্রচেষ্টায়' খুব উৎসাহ দেখা দিয়েছিল, যেমন 'Vernalization in India', 'The malady in our agronomy,' 'Consumers' Surplus—a theoretical toy' আর 'Recent Developments in the theory of Consumer-behaviour'—কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলোচনা-সভা হয়ে ওঠেনি; অপ্রকাশিত রচনা-সংগ্রহ প্রকাশ হবার আশা আছে আগামী চতুর্থ-বর্ষের সুরুতেই। ছাত্রছাত্রীদের তরফ হতে সহযোগিতা ও সাহচর্যের ঋণ, আর অধ্যাপকপ্রধান শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল-মহাশয়ের উৎসাহ ও উদ্দীপনার যে সক্রিয় নির্দেশ, তা আমাদের স্মরণীয়। তাই আগামী-সম্ভাবনা-কেও স্মরণ রেখে সাদর স্বীকৃতি জানালাম।

যতিকুমার সেনগুপ্ত—সম্পাদক

রাজনীতি সেমিনার :

রাজনীতি পাঠগোষ্ঠী আমাদের হাতে আসার পর কাজ যা হয়েছে, তাতে আমরা গর্ব্বিত নই, কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে নজর রাখলে নিরাশ হবারও কিছু নেই।

অর্থনীতি বিভাগের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে আমাদের কাজ আরম্ভ হয় এবং এই অনুষ্ঠানে অর্থনীতি পাঠগোষ্ঠী আমাদের সঙ্গে একযোগে অংশ গ্রহণ করেছিল। অধ্যক্ষ জে সি সেনগুপ্ত ও

বিভাগীয় অধ্যাপকদের উপস্থিতিতে সভার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। ছাত্রীরা কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের সাহায্যে সকলকে আনন্দদান করেন। সভান্তে কিঞ্চিৎ জলযোগের পর তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের নিয়ে একটা গ্রুপ ফটো তোলা হয়।

বইয়ের আদান-প্রদানের কাজে কোন অভিযোগ ওঠেনি—এটা সহযোগিতার পরিচায়ক। প্রসঙ্গতঃ, আমরা কয়েকটি প্রয়োজনীয় বইয়ের অভাব অনুভব করছি, এবং এই সম্পর্কে আশ্বাসদানের জন্যে অধ্যাপক ঘোষালকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এ পর্য্যন্ত কোন আলোচনা সভার আয়োজন করা নানাকারণে আমাদের পক্ষে সম্ভব হ'য়ে ওঠেনি, তবে তার সময়ও চলে যায়নি। ইতিমধ্যে আমরা অধ্যাপক শ্রীরমেশ ঘোষের অ্যারিস্টট্‌ল্ সম্বন্ধীয় দুষ্প্রাপ্য বইটি 'সাইক্লোস্টাইল' করিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করেছি। এ বিষয়ে ছাত্রবন্ধু সুখময় চক্রবর্ত্তীর সাহায্য প্রশংসনীয়।

আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রকে ভবিষ্যতে প্রসারিত করা আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। আমাদের বিশ্বাস, ছাত্রদের সহযোগিতা ও শিক্ষকদের মূল্যবান উপদেশ পেলে আমাদের কর্ম্মপন্থা সাফল্য লাভ করবে।

রণবীর দাশ—সম্পাদক

দর্শন পরিষদ :

বর্তমান বৎসরে পরিষদের অধিবেশন হয়েছে এ পর্যন্ত তিন বার। ১৪ই ফেব্রুয়ারী "ধর্ম ও বিজ্ঞান" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন ঝর্ণা সেন ; ২৮শে ফেব্রুয়ারী তাঁর প্রবন্ধের ভিত্তিতে সভ্যবৃন্দ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি আলোচনা করেন, এবং ৬ই মার্চ সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণে, ধর্ম ও বিজ্ঞানের প্রকৃতিগত অবিরোধ নির্ণয়ে, আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটে।

গত বৎসরের পূর্ণ কার্যবিবরণী না পাওয়ায় পূর্বানুসরণ সম্ভব হল না।

দর্শনশাস্ত্রে বৈচিত্র্যের অবকাশ অপেক্ষাকৃত কম—মর্মান্বেষী সুগভীর জিজ্ঞাসাতেই তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা। আনুষ্ঠানিক অধিবেশনের বাইরে, দর্শন-জিজ্ঞাসার উদ্বোধনে সভ্যবৃন্দের পারস্পরিক সহযোগিতায় পরিষদ অধিকতর সাফল্য ও প্রসার অর্জন করুক, এই প্রার্থনা।

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—সম্পাদক

বাংলা সেমিনার :

গত জানুয়ারী মাসে আমার হাতে বাংলা সেমিনারের ভার পড়ে। অন্যান্য সেমিনারের মত আমাদের সেমিনারে গোলমালে-ভরা কোনরূপ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়নি। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর মনোমোহন ঘোষ আমাকে বাংলা সেমিনারের সম্পাদকের পদে মনোনীত করেন।

বাংলার প্রিয় কবি, ছন্দের যাদুকর স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৩০শে মাঘ জন্মগ্রহণ করেন ; সত্যেন্দ্রনাথের জন্মদিন-উপলক্ষে তাঁকে নূতন করে স্মরণ করব বলে আমরা ফাল্গুন মাসের প্রথম দিনে মধ্যাহ্ন সময়ে কলেজের ১০নং ঘরে এক ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছিলাম। এইটিই বাংলা সেমিনারের বর্তমান বছরের প্রথম অধিবেশন। নানা কাজে বিশেষ ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও আমাদের অনুরোধে অধ্যাপক ডক্টর মনোমোহন ঘোষ এই অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। অধ্যাপকদের মধ্যে শ্রীক্ষুদিরাম দাশ, শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য ও শ্রীভূদেব চৌধুরী সভাতে উপস্থিত থেকে আমাদেরকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিলেন। এই সভায় নির্মলকুমার

চট্টোপাধ্যায় 'কবি সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর কাব্য' শীর্ষক স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন ; প্রবন্ধটিতে প্রধানতঃ সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য ও ছন্দের বৈচিত্র্য সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটির উপরে এবং সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যের নানা ধারা নিয়ে সভাতে অধ্যাপক শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক শ্রীক্ষুদিরাম দাশ বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন ; ক্ষুদিরামবাবুর বক্তব্য বিশেষ যুক্তিপূর্ণ হয়েছিল। প্রবন্ধটির উপরে ছাত্রদের মধ্যে সুধীর রায়চৌধুরী ও বিনোদশঙ্কর দাস আলোচনা করেছিলেন। এ-ছাড়া এই উপলক্ষে বরুণা ভট্টাচার্যের 'প্রণাম' শীর্ষক মৌলিক কবিতা পাঠ, বেদুইন চক্রবর্তীর সত্যেন্দ্র-আলোচনা, কালিদাস রায়চৌধুরীর নজরুলের 'সত্যেন্দ্রপ্রয়াণ-গীতি' শীর্ষক কবিতা-আবৃত্তি ও সুধীর রায়চৌধুরীর রবীন্দ্রনাথের 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' শীর্ষক কবিতা-আবৃত্তি অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। পরিশেষে, সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর মনোমোহন ঘোষ তাঁর সুচিন্তিত অভিভাষণে সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করলে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়। অন্যান্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা সভায় উপস্থিত থেকে আমাদের প্রথম অধিবেশনটি সাফল্যমণ্ডিত করেন।

গত ৮ই মার্চ মধ্যাহ্ন-সময়ে বাংলা সেমিনারের ঘরে আমাদের দ্বিতীয় অধিবেশন গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটক ও তৎসম্পর্কিত আলোচনাই ছিল এই অধিবেশনের বিষয়। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ মনোমোহন ঘোষ এবারও সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের পঞ্চম-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তপন বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকখানির উপরে স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। তপনকুমারের দীর্ঘ প্রবন্ধটি চিন্তাপূর্ণ ও তথ্যসমন্বিত হয়েছিল। ছাত্রদের মধ্যে সুধীর রায়চৌধুরী ও বিনোদশঙ্কর দাশ প্রবন্ধটির উপরে আলোচনা করেন। অধ্যাপক শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য উক্ত প্রবন্ধটির উপরে এবং 'রক্তকরবী' নাটকের বিভিন্ন ধারা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত আলোচনা করেন। সভাপতির অভিভাষণে অধ্যাপক ডাঃ মনোমোহন ঘোষ বিশেষ যুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছিলেন; সেমিনারের উদ্দেশ্য কী সে-সম্পর্কে তাঁর অভিমত মূল্যবান। 'রক্তকরবী' নাটকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে তার নাট্যলক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ডক্টর ঘোষের সুচিন্তিত আলোচনা ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ প্রয়োজনে লাগবে। সভার শেষে ছাত্রদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত ও সমর্থিত পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্রভাষা-সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এবার অভিযোগ-অনুযোগের পালা। সেমিনারের অধিবেশন-উপলক্ষে বিশেষভাবে কয়েক জায়গায় 'নোটিশ' দেওয়া ও প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা সত্ত্বেও সভায় যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্রছাত্রী উপস্থিত হন নি। তাঁদের এই বিরূপ ও নিস্পৃহভাব আমাদেরকে বিশেষভাবে হতাশ করেছে। অনুষ্ঠান-উপলক্ষে যাঁদের যাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা চেয়েছিলাম, তাঁদের অধিকাংশই কোনরূপ সাহায্য ও সহযোগিতা করেন নি। পাঠ্য-বিষয়ের বাইরে যে সেমিনারে অন্য কোনো বিষয়ে আলোচনা হয়, তা নাকি কয়েকজন ছাত্রছাত্রী পছন্দ করেন না এবং বাইরের কোনো ছাত্র এসে প্রবন্ধ পাঠ করুক—এটাও-তাঁরা চান না! এঁদের এই অদ্ভুত মনোভাবের উপযুক্ত নিন্দা করবার ভাষা নেই। এ-ছাড়া কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর যে বিরাগপূর্ণ উদাসীন-ভাব ও অধ্যাপকদের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখেছি তা কোনোমতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

বাংলা সেমিনারের উন্নতিকল্পে সাধ্যমত চেষ্টা করব বলে আমরা সংকল্প করি। সেমিনারের নানা কাজে সহপাঠী ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতা সর্বদাই পেয়েছি। সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকগণের আন্তরিক স্নেহ ও শুভেচ্ছা আমাদের উৎসাহিত করেছে। বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তায় নানারকম অসুবিধা ক্রমশঃ বিদূরিত হচ্ছে। যাতে এই বাংলা-সেমিনার সর্বপ্রকার বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে আদর্শস্থানীয় হয়ে ওঠে ও নবগৌরবে বিভূষিত হতে পারে, তার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি হবে না।

নির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়—সম্পাদক

শারীরবৃত্ত পরিষদ :

অল্প কাজ আর বহুল প্রচার আমাদের স্বভাব নয়। বেকার ল্যাবরেটরীর ত্রিতলে একান্তে আমরা কাজ করে যাই, সপ্তাহিক সভা-সমিতির আয়োজন করি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, বিজ্ঞানের শুষ্ক পরীক্ষাগারে আমরা শোনাই শ্বেত-কমলাসনার বীণার ঝঙ্কার।

আমাদের অভাব বহুতর, স্থানের অভাব—অথচ আমাদের বিভাগের উভয় পাশে ছাদ জুড়ে নূতন কক্ষ নির্ম্মিত হ'লেও আমরা তার অংশমাত্রও পাইনা। অভার অর্থের। অভাব আমাদের কম নয়।

তবু অভাব অবহেলার মধ্য থেকেই আসে প্রাণের স্পন্দন।

গত পূজার ছুটিতে বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অধিনায়কতায় পরিষদের সদস্যেরা গিয়েছিলেন দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে। মাদ্রাজ, মহীশূর, বাঙ্গালোর, উতকামণ্ড, কুনুর, মহাবলীপুরম, পুরী—শুধু বিজ্ঞানের গবেষণাগারগুলি নয়, প্রকৃতির নিভৃত সব লীলানিকেতন, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সব প্রাচীন প্রাসাদ আর দুর্গ, স্থাপত্য আর ভাস্কর্য্যের সব স্মৃতি-চিহ্ন তাঁরা পরিদর্শন করেন।

আমাদের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান এবার ডিসেম্বর মাসে শারীরবৃত্তের প্রাক্তন ও বর্ত্তমান ছাত্রদের সম্মিলন অনুষ্ঠান। এবারের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ আর প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়। অভিনয়ে, ঋতুরঙ্গে, ক্রিকেট খেলায়, হাস্যকৌতুকে, গীতি-বিচিত্রায় দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠান সার্থক হয়ে ওঠে। এই উপলক্ষ্যে আমরা প্রকাশ করি-শারীরবৃত্ত পরিদের এক বার্ষিক পত্রিকা।

ইংরাজী নতুন বছরের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এবার সুরু করেছি পাক্ষিক এক প্রাচীর-পত্র—'প্রাচীরিকা'র প্রকাশ। 'দেয়ালী'র থেকে সে কোনো অংশে কম নয়।

গীতবাদ্যে নতুন বছরকে আবাহন জানিয়েছি আমরা—গত ১লা বৈশাখের অপরাহ্নে। আমরা আয়োজন করেছি বিদায়ী ছাত্রদের সম্বর্ধনা সভা, অনুষ্ঠান করেছি বহু শিক্ষামূলক ছায়াচিত্র প্রদর্শনীর; ডাঃ নির্মল সরকার, ডাঃ দুর্লভ রায় প্রমুখ প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের আমন্ত্রণ করে এনেছি সাপ্তাহিক আলোচনার আসরে। আমাদের সাপ্তাহিক সভাসমিতির আয়োজন অত্যন্ত নিয়মিত আর তাতে বক্তারূপে যোগ দেন প্রধানতঃ ছাত্ররাই। বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আলোচনা সভা আয়োজন করা হয় নিয়মিতই।

মাত্র দেড় বছরের মধ্যে আমরা যে-কাজ দেখিয়েছি, আশা করছি আমাদের পরবর্ত্তীরা তার ঐতিহ্য রাখবেন অটুট আর তার বিনিময়ে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ দেবেন অধিকতর সহযোগিতা।

দেবজ্যোতি দাশ—সম্পাদক

উদ্ভিদবিদ্যা সেমিনার :

গত কয়েক বছর ধরে উদ্ভিদবিদ্যা সমিতি ক্রমশঃ উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। উদ্ভিদবিদ্যা বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রী সমিতির অন্তর্ভুক্ত। এই ছোট্ট সমিতির কার্য্যধারাকে সবরকমে পুষ্ট ও সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর চেষ্টা অপরিসীম। সভাপতি ডাঃ হীরালাল চক্রবর্ত্তী ও অধ্যাপক শ্রীশ্যামাশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের আন্তরিক উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় সমিতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। অনেকগুলি সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেছিল ছাত্রছাত্রীরা :

The antibiotics produced by fungi—মালতী মুল্‌কি

Tissue culture with reference to plants—কবিতা সিংহ

Flora of Darjeeling—পাঁচুগোপাল কুণ্ডু।

The Heterocyst—A Botanical Enigma—অশোক লাহিড়ী

The origin of cultivated plants—বিভা ভট্টাচার্য্য

পাঠের শেষে প্রত্যেকটি প্রবন্ধ আলোচিত হয় ও ছাত্রছাত্রীরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। বিগত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে উদ্ভিদবিদ্যা সমিতির সভ্যেরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। সমিতির আমন্ত্রণে অন্যতম বৈদেশিক প্রতিনিধি ও পৃথিবীখ্যাত উদ্ভিদবিৎ Prof. Hitoshi Kihara "Polyploidy breeding in Japan" শীর্ষক একটি বিশেষ তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। অধ্যক্ষ ডক্টর জে সি সেনগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং স্থানীয় অনেক বিদ্বন্মণ্ডলী ও শিক্ষার্থী এই সভায় যোগদান করেছিলেন।

এবছর সমিতির উদ্যোগে নিম্নলিখিত ছায়াচিত্রগুলি প্রদর্শিত হয়েছিল :

"The Gift of the Green."

"Historical Death Valley,"

"In the Beginning."

সমিতি অন্যান্য বছরের মত এবছরেও বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল। উদ্ভিদ তত্ত্বের বিভিন্ন শাখার চিত্তাকর্ষক দ্রষ্টব্যের পরিচয় চিত্র, মডেল ও পরীক্ষাদির দ্বারা পরিবেশন করা হয়েছিল। এই প্রদর্শনী সকলের যথেষ্ট প্রশংসা অর্জ্জন করেছিল।

সভ্য সভ্যারা অন্যান্য বৎসরের মত বহুস্থানে শিক্ষা-পরিক্রমায় বেরিয়েছিল। প্রকৃতি ও গাছপালার সাথে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ ক'রে প্রত্যেকেই যথেষ্ট শিক্ষা ও আনন্দলাভ করেছে।

চতুর্থ বার্ষিক ছাত্রছাত্রীদের বিদায় অভিনন্দন ও সম্বর্দ্ধনার জন্য সম্প্রতি এক সুন্দর অনুষ্ঠান করা হয়। সভাপতিত্ব করেছিলেন অধ্যক্ষ ডক্টর জে সি সেনগুপ্ত। সঙ্গীত, ভাষণ, আবৃত্তি, কৌতুক ও জলযোগের সঙ্গে অনুষ্ঠানটিকে সর্বতোভাবে মনোজ্ঞ করা হয়।

ছাত্রছাত্রীদের পরিচালনায় সম্প্রতি এক মনোজ্ঞ বিভাগীয় পত্রিকা প্রকাশনারও বন্দোবস্ত হয়েছে।

রবীন মুখোপাধ্যায়—সম্পাদক

ভূজ্ঞান পরিষদ :

ভূজ্ঞান পরিষদ দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই অধিবেশন, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, Excursion, পাঠচক্র এবং পত্রিকা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ভূজ্ঞান পরিষদকে সুষ্ঠ ও সবল করিয়া তুলিয়াছে। এই উন্নতির মূলে আছে আমাদের ছাত্রবন্ধুদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং অধ্যাপক মণ্ডলীর সহায়তা।

কলেজে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস-এর অধিবেশনকালে দেশ-বিদেশ হইতে আগত এবং স্থানীয় সকল ভৌগলিকগণকে ভূজ্ঞান-পরিষদ একদিন বৈকালে চা-পানে আপ্যায়িত করে। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীশীতাংশু মুখোপাধ্যায়, লুধিয়ানা কলেজের অধ্যাপক শ্রীওম্‌প্রকাশ ভরদ্বাজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ এস, পি, চ্যাটার্জ্জি এবং বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরীর বক্তৃতা অধিবেশনটিকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য করে। ভূজ্ঞান-পরিষদ সকলেরই প্রশংসার বস্তু হয় এবং পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীনিশীথরঞ্জন কর পরিষদের তরফ হইতে বক্তৃতাদান করেন এবং ইহার কার্যাবলী সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা করেন।

ইতিমধ্যে দুইটি অধিবেশন সংঘটিত হয়। প্রথম অধিবেশনটিতে পরিষদের সভ্যসকল নির্ব্বাচিত হন এবং তাহা ছাড়া Excursion এবং পাঠচক্রের উপযুক্ত বন্দোবস্ত সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনটিতে

"ভূজ্ঞান-পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা" সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এবং পত্রিকা ও একটি আলোকচিত্র বিভাগ বাহির করিবার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

তিনটি চলচ্চিত্র প্রদর্শনের বন্দোবস্ত করা হয়। প্রথম চলচ্চিত্রটিতে অধ্যাপক শ্রীনিশীথরঞ্জন করের গবেষণাক্ষেত্র পূর্ব্বহিমালয়ের স্বগৃহীত চিত্রসমূহ দেখান হয়। ইহা যে ভূজ্ঞান ও ভূবিদ্যার ছাত্রদের নিকট কতদূর শিক্ষামূলক তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহা খুবই প্রশংসা অর্জন করে এবং অধ্যাপক কর চিত্র প্রদর্শনকালে ইহার বিশেষ ভৌগোলিক ব্যাখ্যা করেন।

অবশিষ্ট চিত্র দুইটি P. A. A.-এর সাহায্যে প্রদর্শন করা হয়। প্রথমটিতে "City of Paris" এবং "South America" এবং শেষটিতে "Eternal City of Rome" এবং "Hawaii" দেখানর বন্দোবস্ত হয়। চিত্রগুলিতে যথেষ্ট ভৌগোলিক তথ্য ছিল।

Excursion ভূজ্ঞান-পরিষদের কার্যাবলীর একটি বিশেষ অঙ্গ। ইতিমধ্যে ২টি Excursion-এ যাওয়া হয়। কলিকাতার নিকটে ভাঙ্গরে জলযোগে যাওয়া হয় এবং কলিকাতার Peripheral Zone-এর rural geography নিরীক্ষণ করা হয়। এই Excursionটিতে সকল অধ্যাপকগণ ও সম্মানের ছাত্রগণ যোগদান করেন।

অপর Excursionটি রাঁচি ও হাজারিবাগ সম্মানের ছাত্রগণের field work-এর জন্য সংঘটিত হয়। সপ্তাহ যাবৎ এই Excursionটি হয় এবং কর্মক্ষেত্রে গৃহীত চিত্রসমূহ একদিন ভূজ্ঞানের ছাত্রদের দেখান হয়।

দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের Excursionএর উপযুক্ত বন্দোবস্ত হয় নাই। যাহাতে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রগণ Excursion-এ যাইতে পারেন তাহার উপযুক্ত বন্দোবস্ত হইতেছে।

পত্রিকা ও আলোকচিত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠার আয়োজন গ্রীষ্মের ছুটির মধ্যে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আমাদের পরিষদের এই সুষ্ঠু কার্যাবলীর জন্য আমরা বিদায়ী চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রভাতকুমার সেন—সম্পাদক

গণিত সেমিনার

মাত্র দুবছর আগে আমাদের প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়, এর মূলে রয়েছে অধ্যাপকমণ্ডলীর এবং ছাত্রদের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং নিবিড় সম্পর্ক।

এবারের সেমিনারের প্রথম অনুষ্ঠান ছিলো আমাদের বিদায়ী অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন এবং অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসকে বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন, সভার সভাপতিত্ব করেন ডাঃ বিভূতিভূষণ সেন। সভান্তে অধ্যাপকদের নিয়ে একটা গ্রুপ ছবি তোলা হয়।

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী সম্পাদক শ্রীপূর্ণেন্দু সেনগুপ্তের আমলেই কয়েকটি অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছিল। অনেকের উপস্থিতিতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ আলোচিত হয়ঃ—

১। Indian Mathematical Genius—Ramanujam.

২। Theory of Real Numbers.

৩। Convergency and Divergenoy of Series.

গত বৎসরে প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক শ্রীসত্যেন বসু তাঁর সাম্প্রতিক ইয়োরোপ-ভ্রমণ সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

এ-বৎসরে অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস জ্যোতি-র্বিজ্ঞানের 'Stellar system' সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন। Slideএর সাহায্যে বিষয়টিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। অল্প জলযোগের মধ্য দিয়েই সেদিনের অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।

শিক্ষা-বিভাগের কর্ম্মকর্তাদের নির্দ্দেশে আমাদের বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ বি. বি. সেনকে বদলী হয়ে যেতে হয় হুগলী মহসীন কলেজের অধ্যক্ষের পদে—তাঁর অভাব আমরা অনুভব করছি অন্তরে অন্তরে। কিছুদিন হলো অধ্যাপক মণীন্দ্রকুমার রায় এসেছেন আমাদের বিভাগে দার্জ্জিলিং গভর্ণমেন্ট কলেজ থেকে—আমরা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। আমাদের আরও একটি আনন্দের বিষয় হলো প্রবীণ অধ্যাপক গুরুদাস ভড় 'সিনিয়র সার্ভিসে' উন্নীত হয়েছেন, আমরা তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

অন্যান্য সেমিনারের ন্যায় লাইব্রেরী আমাদের অমূল্য সম্পদ। কিন্তু পুস্তক সংখ্যা বড়ই নৈরাশ্যজনক—বর্ত্তমানে আমাদের পুস্তক হচ্ছে ৭৭, তাই আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে একটু দৃষ্টিপাত করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সেমিনারের কাজে সর্ব্বদাই সহপাঠী ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতা পেয়েছি—আর সামান্য কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনে অধ্যাপকমণ্ডলীর সঙ্গে যে নিবিড় সম্পর্ক তাকে আর ছোট করতে চাই না। তবুও বলা দরকার যে আমাদের এই সাফল্যের মূলে রয়েছে প্রধান অধ্যাপক ডাঃ সনৎকুমার বসুর প্রচেষ্টা এবং অদম্য উৎসাহ।

সবশেষে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক অমিতাভ গুপ্তকে—সকল পরিকল্পনার মূলে রয়েছে তাঁর একান্ত উৎসাহ।

হেমন্তকুমার বসু—সম্পাদক

ভূবিদ্যা পরিষদ

ভূবিদ্যা-পরিষদ ৪৭তম বছরে পদার্পণ করেছে। এ বছরের কাজ চালাবার জন্যে বার্ষিক অধিবেশনে এঁদের নির্ব্বাচিত করা হয়ঃ—

সভাপতি—	অধ্যাপক	শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহঃ "	"	শ্রীসন্তোষ রায়
	"	শ্রীপতাকী চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক—		সুব্রত সিংহ
কোষাধ্যক্ষ—		অতনু গোস্বামী

এ পর্য্যন্ত বার্ষিক অধিবেশন ছাড়া তিনটি সভার ব্যবস্থা হয়—এবং তিনজন আমন্ত্রিত বক্তা তিনটি বক্তৃতা দেনঃ—

ডক্টর আস্থনম্—'Glass and its raw materials'.

ডক্টর এস কে ব্যানার্জ্জী—'Post-glacial climate and its present trend'.

শ্রী জি এন দত্ত—'Reconnaissnace expedition to Mt. Everest, 1951'

তাছাড়া প্রাচীর পত্রিকা ও আলোক-চিত্র বিভাগ চালানো হচ্ছে, তবে এ বিষয়ে আরও সহযোগিতা আশা করি। আগষ্ট মাসে একটা আলোক-চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করছি—তাতে আমাদের সদস্যবর্গের তোলা বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ চিত্র দেখানো হবে। অন্যান্য বছরের মত মাঝেমাঝে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ও কাছাকাছি শিল্পকেন্দ্রগুলিতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়। প্রকাশনা বিভাগ থেকে দুটো ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্ত্তী 'ভূবিদ্যা' প্রকাশের প্রস্তুতিও চলছে। প্রকাশনা বিভাগের সম্পাদনায় নিযুক্ত হয়েছেন বরুণ সেনগুপ্ত। পাঠচক্রগুলি পূর্ণোদ্যমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের দেশের ছাত্রপরিচালিত বৈজ্ঞানিক সংস্থাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন—আমাদের পরিষদটি বরাবরের মত এই বিভাগের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করছে।

সুব্রত সিংহ—সম্পাদক

PRESIDENCY COLLEGE ATHLETIC COMMITTEE, SESSION 1951-52

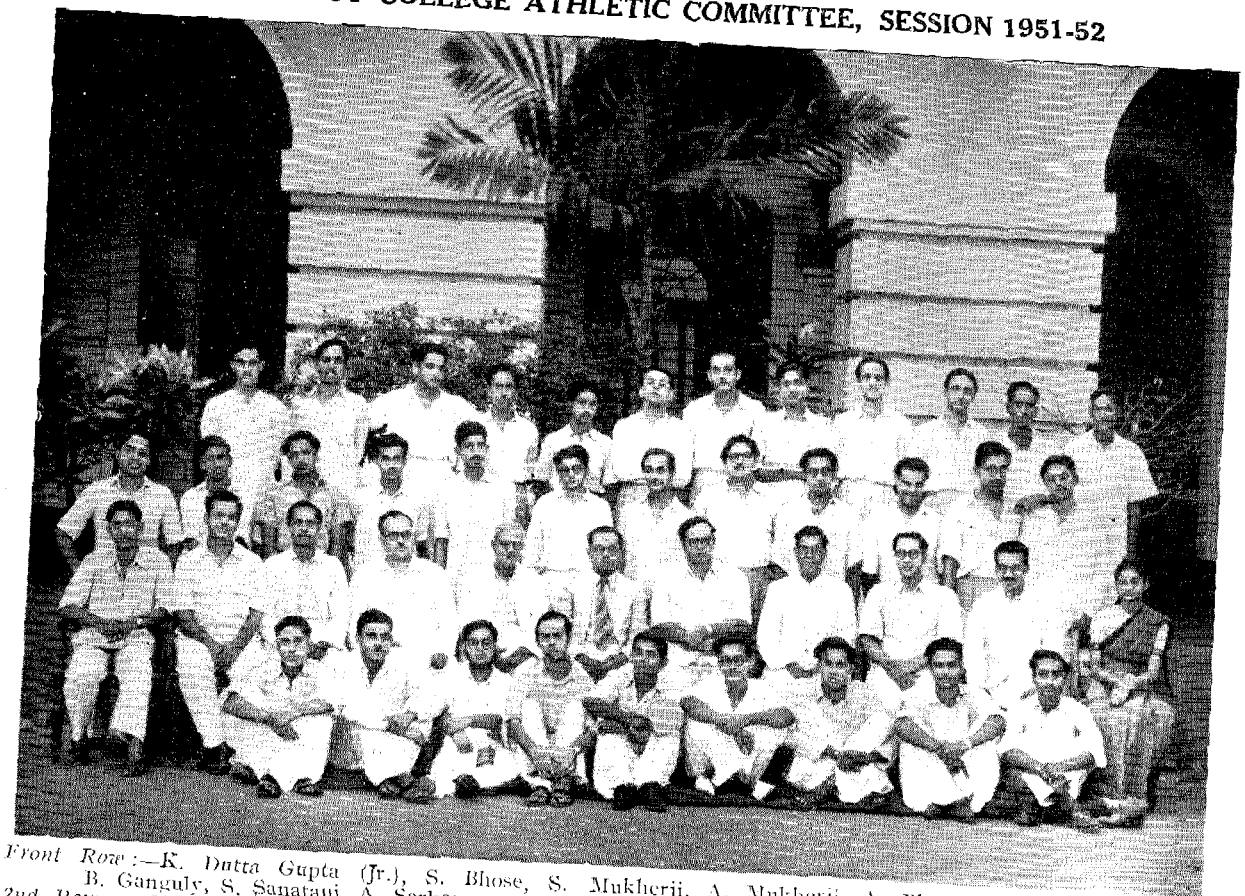

Front Row :—K. Dutta Gupta (Jr.), S. Bhose, S. Mukherji, A. Mukherji, A. Bhattacharya, M. Mukherji, B. Ganguly, S. Sanatani, A. Sarkar.

2nd Row : – K. Dutta Gupta Sr. (Gen. Secy., Football Capt.), Prof. A. W. Mahmood, Prof. S. K. Roy, Prof. N. G. Chakraborty, Prof. G. D. Bhar, Prof. S. K. Indra, Dr. J. C. Sen Gupta, Prof. N. K. Sen, Prof. J. K. Chowdhury, Sri N. N. Chatterjee, Miss C. Sarkar (Secy., *Girls' Section*).

3rd Row :—D. Ghose (Rowing Secy.), P. Nag, S. Biswas, N. Ganguly (Cricket Secy.), A. Pal, A. Mitra, S. Chakraborty, B. Barman, S. Karmakar (Capt. Volley-ball team), S. Sarkar (S. A. Secy.), B. De (Tennis Secy.), P. Das. *Back Row* :—N. G. Dutta, T. Ghosh, D. Ghosh, S. Sen, A. Bannerji, A. Chakraborty (Hockey Capt.), D. Bannerji, A. M. Roy, A. Roy (Cricket Captain). *Narsing and Chandra* (Bearers).

THE PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

Notes and News

The new year opens with a batch of our students going up to face yet another academic hurdle. Words cannot express either the horror that an examination is for the examinees, nor the sympathy of those who are aware that their turn too will come. Of the many invisible ties that link us, students, irrespective of age and year, the University examinations are undoubtedly one of the strongest. They may even be the poet's original 'silver link' knitting many hearts and minds together. Be that as it may, our heartiest wishes go with our candidates to the examination hall.

Meanwhile, College life moves on with no perceptible break. The Union and Seminars have passed into new hands, and our many-sided activities go on as before. The Peace Festival Week organised by the Union reflects the spirit of the time, and is worthy of the College which has responded in some measure to the progressive thought of decade after decade in its long life.

A second floor to the Baker Laboratory is nearing completion and will relieve to some extent the present congestion in our Science classes. But a real building programme to remove our long-felt wants like an Assembly Hall still continues to be a cry in the wilderness. Some pressing reforms in our academic life are however easy enough if the authorities concerned deign to listen to the voice of the student world. We would include in such a list of urgently-needed easy reforms—the multiplication of copies of standard text-books in all our Seminars for the relief of the poorer students ; the opening of regular Seminar classes in the College for post-graduate students in every department ; the fusion between our under-graduate and postgraduate hostels ; the relaxation of the recent enhance-ment of 'percentages' for our examinees ; the examination in one paper a day for our Honours candidates ; and the speedy publication of examina-tion results.

* * * *

There is much enthusiastic talk of doing away with English as the medium of our higher education. Ultimately the vernacular can and must

replace English, but this will be very difficult to accomplish before we have at least some text books in Bengali, which will be adequate and up to the Honours and postgraduate standard. As things stand, it is hardly surprising that students appearing in the higher examinations generally do not attempt to write in their own language, even if permitted.

The attempt to render technical terms into Bengali has also been rather frustrating, not only in the result but in the intention. This seems to be to force new, strange, Sanskritized words on our ordinary speech and writing, rather than allow us to absorb familiar foreign terms naturally, in the manner of all healthily-growing languages. English has taken for its own even some words of Hindi extraction, and no one will say it has suffered in consequence.

Meanwhile, the suggestion which crops up every now and then of subordinating our provincial languages to the use of the Rashtrabhasa as a sort of common medium in our national life had best remain a dream. If Hindi is really forced on our peoples—to whom it is almost as foreign as English—for other than purely all-India official business, it will be a form of 'language imperialism' as bad as the domination of Great Russian in the Tsars' prison of nations. Such absurd and reactionary attempts have nothing to do with real national unity, which can never be brought about by suppressing a people's own language and culture. The federal unity of the Indian State does not necessarily presuppose the domination of one language for it is simply not a fact that Indians have one language, and it is folly to ignore the deep-seated regional languages dear to millions of people.

On the entire issue of the relation between the Rashtrabhasa and the National Languages, we draw the attention of our readers to the views (which we fully endorse) of our distinguished ex-student Sri Atulchandra Gupta in his presidential address to the 1949 session of the Prabasi Banga Sahitya Sammelan at Delhi, an address which should be more widely known.

* * * *

The language movement in Eastern Pakistan has been a bitter and grim struggle of the sort that is undertaken only by a nationality fighting for the most precious of its national distinctions—the people's language. How serious the upsurge became may be judged from the drastic steps taken by the government—arrests in high places, closing down the Dacca University and firing on demonstrators. On their side, the people and students responded with prolonged strikes and demonstrations in and outside Dacca, the centre of the movement. Such popularity and spontaneity is not to be explained away as the machinations of this or that malcontent group ; it has its roots in the social situation, in the hearts of a people itself.

* * * *

The excitement of the elections is over. While they lasted, the elections registered a number of surprises and shocks. The striking thing is not that Congress, which had at one time commanded the allegiance of all, should have emerged with an absolute majority in most of the provinces, but that it should have experienced so much of signal defeat. There are a few outstanding lessons to be gleaned from our first democratic elections. Congress commands a hard core of support in upper and central India—mainly Hindi-speaking tracts; but along the frontier—in the entire South and in large parts of East India—it has lost more ground than was generally expected. Secondly, Congress has failed to win a majority of votes cast in state after state. Thirdly, the elimination of the Socialist Party as the middle of the road way of life and the Second Party in our politics cannot be explained away in the manner of its leader ; the causes must lie deeper in the policy itself of the party. In the same way the Leftist victories cannot be ascribed merely to a blind anti-government feeling. The electorate was more discerning than those who apologise for it, and picked and chose with remarkable effect from among the large mass of non-Congress candidates. It is also significant that a vast uneducated electorate of ordinary men and women should turn away so decisively from all the communal and pseudo-communal parties in the land.

The talk of a coalition ministry of the Democratic Front in Madras is a clear measure of the new popular temper. It must be added that the inherent possibilities before the Democratic Front are more than what it has been prepared so far to utilise. There still remains however much confusion and vacillation in the electorate, which has not been properly tapped by any of the organised parties. Perhaps that is why so many independent candidates were returned. It now remains to be seen how the fruit of the election ripens, during the next five-year lease of parliamentary life, which may be decisive for the future of our Republic.

* * * *

The outstanding foreign news in recent months relates to trouble in North Africa and the Near East. Egypt, Iraq and, more recently, Tunisia, have risen against Anglo-French control. Most illuminating are the steps taken by the Great Powers involved to master the situation. They range from the demolition of houses in the Canal Zone to indiscriminate street shootings. Arbitrary arrests, martial law and mass eviction have all been carried out in the most approved and familiar imperialist fashion, and the features of a colonial war have appeared on the scene. This includes, as in Egypt, the development of two wings of resistance—the orthodox nationalist and the social-radical (as explained by the veteran journalist Alexander Werth in a recent despatch)—which run parallel up to a point, but come into constant friction after that.

The Egyptian government and its police have been no less anxious to curb the too-militant strikes and student demonstrations than to carry on endless arguments with the British. Meanwhile the Tunisian struggle is being supported by demonstrations in neighbouring Algeria and Morocco. The entire area is in a ferment, and the Atlantic Powers' anxiety to keep it well in hand is quite understandable in view of the Middle East Command project. This, as a complement to NATO and the 'European Army', cannot be easily given up if the Western bloc moves along its present lines of building up military strength.

The US Secretary of State greeted "the dawn of a new day" for Europe in a speech after the Lisbon meeting of NATO. Among the rays emanating from this new dawn are a strengthened North Atlantic Organisation, a six-nation army for Europe, and a Western Germany definitely hitched to the star of remilitarisation for 'defence'. It is a long way from the time the Western Powers let Hitler slip into Czechoslovakia and France on the assumption that he was really headed for the eastern horizons. Will they now rectify Hitler's 'error' and take the long march at last upon themselves? The US government may not share the utopian zeal of Mr. J. B. Priestley, who, writing for an American magazine, gave a vivid account of Moscow when it would fall to the 'liberators'. Its feverish activities, however, are more than a little reminiscent of a certain Priestley heroine with her 'bows of burning gold' and 'arrows of desire'.

It will be presumptuous on our part to offer any advice to the Indian Government on its foreign policy. But countless Indians all over the country will feel relieved and delighted if our Government can categorically proclaim from the housetops that if a World War does actually break out, India at any rate will certainly take no part in it, nor allow any facilities whatsoever to the combatants. That at least can be a worthy memorial to Gandhiji by whom our rulers swear. And yet we find our Ambassador in the USA going all out to assure the Americans that India will not remain neutral.

March 1952.

Economists and Policy-makers

IT was a recurrent complaint of the academic economist in India during British rule that he was completely ignored when the government decided on matters of economic policy. The work of the academic economist was quantitatively small before the First World War but in the late twenties and throughout the thirties our economists poured out a large volume of published work. One remembers the prolonged debate over the Reverse Council blunder of 1920, the protective policy of the twenties, the never-ending 'ratio question', the managing agency system, and also the acrimonious discussion on the gold exports of the thirties. All these debates centred round particular government policies, but it seemed that policy-making on the government side and critical discussions of our academic economists were on planes that did not meet. There was an excess of suspicion on both sides; the economists often started with the presumption that government policies were deliberately meant to further interests other than Indian, and Finance Members like Grigg publicly made sneering remarks about *Indian* economists.

There was, of course, some justification for the sneer. A very large part of the output of our economists in the inter-war period was pure polemics; the attitude was that if there was an argument on one side there must necessarily be a counter-argument on the other. Arguments could thus be rushed forth without a complete examination of the logic of the basic pattern and one noticed—for instance, in the ratio controversy—a clear inability to grapple with all the fundamental issues simultaneously. The inadequacy of statistics was a help rather than a hindrance, and the *Statistical Abstract*—always three years out of date—could be depended upon to prove almost any thing. Intellectual lethargy was encouraged by the fact that one could always get a hearing and often an acclamation from an expanding nationalist-minded reading public.

There were rare occasions when the government sought the help of non-official economists and businessmen in preparing committee or commission reports on important matters. But many of those invited were amateurs with great enthusiasm and without any systematic training in economic analysis. That was one of the reasons why there was always the inevitable minority report and why the minority report was always effusive. One solid exception was Malaviya's dissenting minute attached to the Industrial Commission report of 1916-18. Purshottamdas Thakurdas was also cool in his arguments but one cannot forget that Bombay had cotton mills and that cotton mills required a low-valued rupee. A few

academic economists like L. K. Hyder had played minor parts. Here again an important exception was Jehangir Coyajee, but one has to remember that a government college teacher in the twenties was a state-official first and last.

It is interesting to note that the one economist who brought 'Indian Economics' into being and was able to influence public policy to some extent as early as the eighteen-nineties, was not a University teacher but a High Court judge. Ranade was undoubtedly the only economist of note that India produced in the 19th century. Looking back, one can perhaps compare India's position at the close of the century with that of Germany in the early years of the *Zollverein*. Germany required an economist to put all her problems into a proper theoretical pattern and found him in Friedrich List ; in India, Ranade played almost the same role. It is generally recognised that Ranade's start is still working itself in our economic discussions ; it is also necessary to remember that he was able, long before even the Minto-Morley reforms, to influence public policy in many respects. One important instance is the success he had in leading the government towards the implementation of the Nicholson report on co-operative societies, and one can trace his influence in the land reform laws of those days and in the creation of an Industries Department under the government.

Naoroji and Romesh Dutt were not certainly Ranade's equal. Naoroji was a politician first and he used his economics as a strong political weapon. And Romesh Dutt was not really writing the economic history of India ; he was only collecting and arraying historical material for proving certain points. He was in fact more an historian with a mission than an economist and he was more at home in the dissection of blue books than in tackling the many-sided issues of an economic problem. It is almost painful today to read his one-sided justification of the Cornwallis Settlement in his much-boosted 'Open letter', written when more than a century had shown the great evils of the system and when the Tenancy Act was already standing as an open argument against Zemindari tenures. The unfortunate fact in Indian economic discussions has been that Romesh Dutt's methods have often been too closely followed ; we have had more advocates than analysts.

It was of course historically inevitable in a dependent country that this should happen and that economists and policy-makers would not clasp hands. Parallel cases are difficult to find, because India had the unique distinction of being a dependent country with a fairly vocal intellectual class. One does however note that the attitude and tone of the few local writers who discuss the economic problems of British West Africa (especially Nigeria) or of the West Indies are very similar to what we have generally expected from Indian writers. A very good example is W. A. Lewis, a Jamaican who has been able to rise to a professorship at Manchester, who

writes rigorously neat papers on the pure theory of overhead costs, but puts all his emotion into effect when writing about labour problems in Jamaica plantations.

It was natural that economists and policy-makers would not meet on the same level under British rule. The gulf between the two should however have become smaller in course of the last five years. It is here that one has reasons to feel surprised. There seems to exist as yet little co-ordination between the academic economists' opinions and the decisions of the government policy-makers. This is all the more surprising because the economists of our country who were attacking government policy in the inter-war years are mostly still active—and in fact they have won some of their points. Government views about population and food have changed appreciably during the last few years. A sound attitude has developed in the official circles regarding the role of revenue surpluses or deficits in an expanding economy and about the role of the net balance of payments position *vis-à-vis* the inflationary pressure. The Planning Commission would have gladdened our economists twenty years ago one remembers how eagerly they welcomed the half-baked National Planning Committee. The government departments are providing more and better statistical material than they ever did. We have some not-too-undependable estimates of our national income and we know something even about the 'invisibles' in our balance of payments.

But there are important sectors where economists have failed to influence policy. One good example is the hurried relaxation of controls soon after independence, a step which no sensible economist could support One can be very strictly 'anti-control'; but that does not prevent him from recognising the danger of a sudden move from a controlled system to an uncontrolled one. Another notable example is with regard to the food rationing and import policy. It is not of course possible here to say that professional economists would be unanimous on any one side, but one feels that there has been an imperfect cooperation between the non-official economists' opinions and government decisions.

This is still more surprising when one notes the steady increase in the number of trained economists in the government administrative departments, many of whom were academic economists in their early life. Perhaps, however, the departmental economist does not have a large measure of freedom of opinion or action, and it is also possible that he is not a policy-maker at all. One hears often the story of the expert economist or statistician in high office whose main work is to grant or turn down the leave applications of his many subordinates.

It is easy to hold that government policy-makers do not come out as much as they should to seek the opinion of academic economists. That is an argument which could easily be true. But it is no use concealing the more important fact that suitable institutions and machinery

for bringing policy-making and economic opinion together have not yet developed. A large part of the fault—in the present-day context—lies with the economists themselves. The best among us are either in government departments or indifferent. The large volume of discussion that goes on in print is largely second-rate, and is sometimes deservingly ignored.

If the sloth of the able academic economist is due to intellectual snobbery, it is unfortunate. There is no reason why the person who derives great pleasure from the matrix multiplier should not have something to say on a bullion market débâcle or a sharp inventory recession. One can master the Keynesian esoteric and still be Keynesian enough to write, as the Master did, week after week on current economic problems. Keynes' weekly articles in the *Nation* did not always gain their point; in fact in the twenties these were deliberately ignored by men like Winston Churchill. In 1939, Keynes, whether in government office or not, was the greatest policy-making force in British economics. Hubert Henderson was also a cloister economist ; but he wrote regularly in Keynes' paper—and he would have been an important policy-maker in the 'Can-Lloyd-George-do-it' programme if the Liberals could come back. In recent years, the academic economist who has worked hardest to influence government policy in England has been Roy Harrod. At exactly the same time when he was writing his tough essays in economic dynamics, he was also writing his famous matter-of-fact articles on Britain's post-war economic policy.

It is of course true that the independent economist here does not always get a proper forum—unless he chooses to be an independent pamphleteer also. Leaving out the just-born venture of the Delhi School of Economics, there is only one important economic journal in India. One of the issues of this—the bulkiest—is filled with undergraduate essays described pompously as papers read at the Indian Economic Conference. The three other thin issues can accommodate very few articles. And, after all, a quarterly journal is supposed to be a high-brow affair and is not quite a suitable medium either for educating the public opinion or for influencing the policy-makers. The few specialised weeklies that exist are mostly owned by group interests. The time-honoured English custom of writing to the *Times* has not yet developed its Indian counterpart.

Keynes' deferred pay scheme, one remembers, first came out in the *Times*. The *Times* correspondence on the dollar gap of 1949 in which almost every well-known English economist took part (including age-ridden Pigou) was an important factor determining government's exchange and trade policy. In India there is no paper which enjoys a comparable status, and there has not yet developed anything similar to the well-known English respect for the letters that have passed the hands of the *Times* editors and have been allowed to appear in print. And in any case

a letter on an economic problem cannot command very serious attention when it is preceded by a tirade against the booking clerk of a branch-line station and followed by angry outbursts against the mathematics paper-setter at the School Final.

There are however other important and effective ways in which policy-makers and economists can come closer. One is to organise here something like the London and Cambridge Economic Service. The main function of this Service is to analyse current statistics and to tell the outside world the academic economists' views about the continuing problems of wages, prices and profits, of output and employment and of the balance of payments. The Service is run by the London School of Economics and Cambridge University jointly and the periodical reports at present are mainly the work of a team led by Meade, Paish, Tress, Austin Robinson and Stone.

Inter-university cooperation of this type should not be impossible in other countries. It is necessary perhaps to remember that the London School of Economics was at first a Fabian reaction to the solidly respectable Cambridge of Marshall, but that did not prevent close coordination on matters of common interest. At present the problem has become simpler. Cambridge and London have come close together ; Cambridge economics has become more liberal and the London School has become eclectic. It is interesting to note how frequently Robbins agrees with Robertson and Austin Robinson with Meade.

One great difficulty in our country will be that of long distances. The telephone and the non-stop train have made London and Cambridge neighbours ; it will be a long time before Calcutta can work in such close cooperation with Patna or Cuttack. But a place like Calcutta ought to be able to run an Economic Service by itself. The University and the Colleges and bodies like the Statistical Institute should not find it difficult to work together and to provide a field for the study of current economic problems.

In England during the last few years there have grown specialised research organisations attached to universities. There is for example the Applied Economics Institute at Cambridge ; the Institute of Statistics and the Agricultural Economics Institute at Oxford are also specialised bodies. These perform a two-fold function. They undertake the recurrent task of interpreting and improving the factual data available and of drawing policy-conclusions therefrom. The results of their work come out frequently in the form of bulletins read widely by other economists and considered carefully by policy-makers at Whitehall. During the war, the studies of the innumerable small details of rationing and control made by the Oxford Institute of Statistics were very fully considered by the government economic advisers and one notes the influence of these studies on the sequence of legislative provisions on the subject.

These specialised bodies also perform the task of organising team-research on planned projects. A large part of the post-graduate research done directly at the universities is for the purpose of earning degrees, and is therefore subject to certain obvious limitations. And such research is most often purely individual. There is no over-all planning for the research work done at the universities. And it is neither easy nor desirable for a university to refuse facilities to a student who wants to do a thesis on the economic postulates of Duns Scotus or on the methodology of seventeenth-century economists.

The specialised bodies can fill in the deficiency. They can plan for research and can set different individuals to work on different sections of a single problem with full facilities for continuous comparison of results. In the Indian context, there is an excellent field for such work in regard to capital formation. On this important matter we know very little and it is practically impossible for any one individual to undertake a full study. A government research unit can do the work, but there is no reason why a team of independent workers should not be able to make a thorough examination.

The Gokhale Institute at Poona is perhaps the only body of this type in India. There could easily be some more. These institutions should be closely connected with the universities but should also have an independent power of initiating research and enquiry and of publishing the results freely. The main difficulty will of course be finance. It is difficult to visualise any large help from government funds and the universities themselves are absolutely poor. The only other alternative will be private munificence, but private gifts generally imply the existence of private axes to grind. One however notes that the Nuffield grant to Oxford was unconditional and Calcutta at least has known large benefactions without any strings. It is difficult to believe that there could not even be three or four high-grade economic research institutions in the whole of India.

Another alternative is the Swedish method of bringing academic economists directly in touch with policy-makers through quasi-government institutions. It should be remembered that Sweden has been one of the few countries where academic economists have always played an important role in policy-making and even in governing. This has partly been due to the extremely high regard that the Swedish people have for university professors (Herr Professor can always expect the best room in the hotel—or at least, could, until the dollar-spenders came in), and also partly to the other fact that university professors there are often important figures in political parties. Bertil Ohlin is the leader of the Liberal Party and may any day become Prime Minister. The great Uppsala economist Lindahl is the most well-known spokesman of the Socialist Party.

But these are only recent cases. Even when teachers were not politicians, academic opinion was greatly influential in shaping policy. Wicksell

did not spend all his time developing the theory of the cumulative process and Cassel was for long the *de facto* policy-maker in economic matters. In the early thirties, Sweden was the first country to apply successfully the anti-cyclical measures which administrators in other countries spurned as text-book prescriptions.

At the present day, cooperation between academic opinion and policy-making is secured mainly through bodies like the *Konjunkturinstitute*. This is a research organisation working alongside the Finance ministry, but headed by a university teacher, Erik Lundberg. The link with the Finance ministry makes it possible for the institute to have full access to unpublished departmental material and the link with the universities makes available the work and opinion of teachers and research workers. This institute has been doing excellent work. Perhaps the most important part of its work is the annual computation of the potential inflationary (or deflationary) gap. This computation leads to two figures every year—one based on the assumption that the improving trends visible in the recent past will continue and the other on the assumption that the trends will be reversed. The Riksdag accordingly passes two budgets every year—the ordinary one based on optimistic assumptions, and also an emergency one to be put into operation without further legislation when certain specified index numbers have gone below defined minimum limits.

But then Sweden is a very rich country with a very small population nd the political stability has been remarkable. The institutional arrange-ients possible in such a country may not be immediately practicable in ndia and it would also be premature to expect here that a government-nanced research body will be able to speak out strongly against actually dopted policies. But there should be some immediate prospect for a few pecialised research bodies associated with universities. On a smaller scale ie Economics department of every university should be able to make a egular practice of studying current problems and publishing the results i the form of periodical bulletins. It should be possible, for example,) visualise a Calcutta University Economics Bulletin which need not be very large affair but should be weighty in respect of content. This should t no way prejudice the publication of technical journals like the London chool *Economica*. Delhi has made a welcome beginning in this respect id there are at least four other Universities in India with economics epartments large and strong enough to provide material for running a iperior-type journal.

The superior-type journal is however meant only for the initiated. conomists, like scientists, have also an important social role, and the unction can be partly discharged by telling the policy-makers what they el and also by telling the makers of the policy-makers. The apparently spectable but easy argument that economic science is not yet ready for olicy-conclusions is only escapist. Whatever the level of development

of economics as a science, economic policies have to be chosen, and in the matter of such choice the trained economist should be able to judge somewhat better than others. There is every prospect that his opinions will go unheeded, but that is absolutely beside the point. It sometimes takes a long time before the right opinion comes to be accepted, and there is no presumption in what has been said above that the academic opinion is necessarily right. The essential point is that if there are people trained in economic analysis, society has an elementary claim to know what they are thinking about the actual problems of the day. And it is perhaps the basic principle of a good democracy that if you do really have an opinion, it is your duty to tell everybody about it.

B. D.

Satyagraha—The Gandhian Means to Resist Evil

NITISH SEN GUPTA—*Third Year Arts*

WESTERNERS have usually translated Satyagraha as passive resistance —a misleading term which has, in fact, led many to erroneous impressions. Of the true nature of Satyagraha and the success it is capable of accomplishing most people are unaware. Contrary to the popular idea, it is not the means of the weak and the feeble.

There is little passive about this non-violent means of resisting evil, and, as Mahatma Gandhi himself pointed out, it is active enough. Satyagraha is a "positive doctrine of work, organisation, struggle and resistance".

The conception of Satyagraha is based upon the fundamental proposition that human nature is essentially good. Every man has, in the inmost core of his heart, a corner of goodness. Whatever man does, this good aspect of his heart points out to him whether or not his action is right. Even the most wicked evil-doer hears a voice from within his heart condemning his action when he is about to do something wrong. Mahatma Gandhi put much emphasis on this aspect of human nature —the "inner voice" as he called it. The presence in human nature of this inner voice, or the more popular expression 'conscience', is a clear proof of the fundamental goodness of human beings. The true end of resisting evil, said the Mahatma, is to revive and strengthen this inner voice of the evil-doer. Those who are in favour of violent resistance are

wrong in supposing that such kind of resistance permanently drives out the evil. In reality, however, violent resistance, although it may be successful at first, seldom succeeds in attaining its proper end in the long run. If by resistance we are to mean merely putting aside the evil for a time without thinking of the possibility of its reappearance, there is no doubt that violent resistance seems to be more effective than non-violent resistance. But what effect non-violent resistance produces is permanent, and one need not be afraid of the possibility of the evil being revived. For non-violent resistance aims at something more than merely subduing the evil. Its real aim is to change the heart of the evil-doer by organised and non-violent resistance not of the person of the evil-doer, but of that aspect in his character which causes all evils. This is why the success which a Satyagrahi attains is not apparent like that of the armed resister. Although a much delayed one, his success is something abiding and unique. For he causes a revival in the evil-doer of the inner voice which henceforth checks the evil spirit in him.

It would be a mistake to suppose that Satyagraha encourages a negative feeling of non-resistance and that armed resistance is more glorious and honourable than Satyagraha. What the Mahatma really laid stress upon is that every man must resist whatever seems to him to be evil and harmful. Ninety-nine per cent of the tyrannies of this world are rendered possible only by the willing or unwilling co-operation of people. And once this co-operation is withheld, the evil will collapse at once. What Gandhiji was anxious about was that man must not lack the courage to give up his life to resist evil-doing. He would have preferred being killed with sword in hand to ignominious tolerance of oppression. But as a means of resistance he regarded Satyagraha as superior to violent resistance. He did not believe in the dangerous doctrine that the end justifies the means, and was convinced that noble ends must be achieved through noble means. Satyagraha is the product of a life-long endeavour for the attainment of Truth, Love and Non-violence.

The old doctrine of non-resistance to evil is a purely spiritual one and has nothing to do with group conduct except in so far as the individuals affect it. Satyagraha is "both an individual obligation and a social and political duty". The underlying aim is not violence, coercion or revenge, but the observance of one's duty which "entails the right to refuse all co-operation and support to a system which works for one's degradation and enslavement". And under such circumstances a Satyagrahi must not be an emotional resister, but he must raise his struggle to a higher moral plane, bearing no falsehood, ill-feeling or violence. He is no believer in non-violence of the old and negative type. But believing, as he does, in the superiority of Satyagraha to armed resistance he should make his principle active and dynamic and one of unbending resistance. He must bear in mind that his resistance should not cost anybody his limb or life.

If however necessity arises, the reformer must be prepared to make the sacrifice himself. His feelings should be more of a physician who is trying to cure a disease than of a soldier who is fighting the enemy. The struggle of a Satyagrahi is against the evil-doing and not against the evil-doer. Thus Satyagraha cannot be called dishonourable or inglorious, when we see that in respect of ideology it is far superior to the method of bloody violence.

Yet Satyagraha is, strangely enough, considered by many as impracticable and utopian and the absence of its example in history is put forth as an argument in favour of the view. Undoubtedly Satyagraha, as conceived and applied by Mahatma Gandhi, was something non-existent in history, although isolated examples of non-violent resistance are not lacking. But all the doctrines and theories that we apply cannot be traced back to the dim past. Most have their birth somewhere in history. If men of the 18th century refused to abolish slavery, simply because history does not record any such abolition, there would have been nothing more shameful and ridiculous. And now shall we cease to apply Satyagraha in personal, national and international fields on the ground that examples of such a movement are absent in history?

The world is to-day lumbering towards a great crisis and it is clear that if it is to be averted, sharpening the instruments of destruction is an ineffective means. Most men to-day do not want war, and yet they fail to raise their voice against the incessant war preparations, because they are afraid to stand against the arms of the war-mongering people. It is thus that "the vicious circle, created by violence and hate keeps on spreading its wide net". If this is to be broken, it can only be done by an organised Satyagraha movement. Those who wage war will no doubt try to tyrannize over ourselves and we must be prepared for sacrifice. If six hundred Satyagrahis resist evil, they will be killed or imprisoned. If six thousand do the same, they will also have the same fate. But if six hundred thousand people are prepared to give up their lives to resist the tyrant, saying, "You might kill us, but there shall be an end of all this," what will be the result? Maybe, some will be killed or put to prison. But something more is bound to happen. For such a wonderful resistance will undoubtedly change the heart of the evil-doer, and this will be for the better. The results achieved so far by Satyagraha have been startling. The successes achieved in Champaran, Bardoli and Kaira and in the three great all-India movements against oppression and tyranny are also pointing to the immense promise of Satyagraha. And is it not time that we give up the beastly practice of violent resistance and be convinced that "not by hate, but by love alone can hate be overcome, and not by violence, but by non-violence can violence be overcome"?

In Praise of Shakespeare

PRAHLAD KUMAR BASU—*Fifth Year Arts*

KEATS said that the poetry of earth is never dead. I realised it first on reading five Shakespeare plays. There is poetry not only when Ariel brings the crew of the wrecked ship on shore, or Orlando seeks Rosalind, or Hamlet plans for the murder of his uncle, but also when Lear goes out mad in the tempest and lightning—when bleak winds howl and rains drop down on the earth. Indeed life itself is poetry and is full of music. Shakespeare has proved it to be so.

But Shakespeare is dead these three hundred years or so. Are these centuries completely barren from the point of view of literary creation? Or, what is the secret of Shakespeare's appeal? What is it that makes Shakespeare endure as the supreme dramatist of the world? The answer is that he was a great genius. Besides being a dramatist, he was a poet ; and besides being a poet, he was a philosopher. He was as much a king as he was his messenger ; he was as much a lover as he was a man. Thus he could speak through Prospero and Caliban at the same time ; through Lear and the fool in the same play ; through Rosalind and Adam ; through Hamlet and the gravedigger. Shakespeare could produce the evil and the good simultaneously, the beauty and the beast in the same scratch of his pen. Thus he could produce Desdemona and Goneril side by side, Kent and Edmund in the same play, Cordelia and Emilia together—of course in different plays.

Shakespeare combines all the qualities that make literature living. He combines wisdom to understand and charity to forgive human frailties. Gaiety, lightheartedness, laughter, pity, tears, passion are all his. Sunrise and sunset, the beauty of the dawn as also that of the dusk are also his. His work has the ease and careless grace of all masterpieces. And above all, it is charming to the ear. As Ben Jonson truly said, "Shakespeare was not of an age, but of all time", and he knew what he was talking about:

"The rest may reason and welcome ; 'tis we musicians know".

* * * * *

Although I began with the Tempest yet it is better to be chronological. None of the five plays belong to the first two periods of Shakespeare's creative age. As You Like It was composed in 1599, when the period of

maturity was just beginning ; and Hamlet, Julius Caesar and Twelfth Night were all of this period. With Othello began the fourth period, when Shakespeare was writing with the very edge of his creative razor and composed the highest themes of tragedy, such as Macbeth, King Lear, Antony and Cleopatra. The Tempest was his last work written in that serene and blessed mood in which affections gently led him on.

Shakespeare's plots are great. Not that they are great in length and breadth, but in their simplicity, having a beginning, a middle and an end. As You Like It is a simple and essential plot. Two undeclared lovers meet, Rosalind and Orlando ; Rosalind in disguise challenges Orlando to woo her as his mistress ; when Rosalind is assured of his affection, she discloses herself and all ends happily. And Shakespeare has set his plot in such environments of men and nature that it takes us far from the real theme of the play. We relish the green-wood drama in the Forest of Arden when the Duke and his men live like the old Robin Hood of England. Some say that As You Like It is a comedy of dialogue: to some, it is rather a comedy of incident. To me, it is a beautiful love story, a most adorable play of boyhood, in those days not second even to the Tempest, in terms of colour, if I may so put it. The play is 'As You Like It', a woodland play treated courtly wise or a courtly play treated woodland wise.

Besides, what beautiful characterisation comes out of this little play! In Rosalind, character and situation cannot be dissociated. Love and wit are the two traits of her character—thus she is unique among Shakespeare's women. Her fancy catches fire from feeling, and rises in brilliant coruscation. This is the peculiar quality of her wit. But in As You *Like It*, Shakespeare improving on *Lodge*, invented Jacques and Touchstone. Both are piquantly out of place, while most picturesquely in place. Their removal would entirely alter the composition of the play. Jacques is a foil to half the other characters—to the Duke in his melancholy, to the lovers in his philosophy and to Touchstone in his humour. He could suck melancholy out of a song. He sees life in its mean, ludicrous and pathetic aspects. All the same, Jacques shines bright against the artistic contrast of Touchstonian humours and witticism. Indeed, the dullness of the fool was the whetstone of his wits. With what a whoop of delight the one critic harps on the other!

Jacques. A fool, a fool! I met a fool in the forest,
A motley fool ; a miserable world!
As I do live by food, I met a fool ;
. . . . . .
. . . . . .
O noble fool! A worthy fool!
Motley's the only wear. (II, vii)

Jacques moralises in detachment and Touchstone comments and plays the fool. 'As all is mortal in nature, so all nature in love is mortal in folly'. Thus Touchstone, whom Jacques addressed as 'Knowledge-illinhabited', blushes out in Shakespeare's hand as the running commentator of the whole As You Like It.

Above all, to my mind, as perhaps Quiller-Couch mentioned, As You Like It is less a comedy of dramatic event than a playful fantastic criticism of life. The woodland life, exempt from public haunt, 'finds tongues in trees, books in running brooks, sermons in stones and good in everything!' How sad and bad and mad it was, though sweet! Rosalind's statement that 'men have died for time to time and worms have eaten them, but not for love!' sounds buoyant and somewhat unshakespearean. But the philosophy of Jacques sounds true specially as it is served in detachment far from the madding crowds of ignoble strife. Indeed, this world is a stage and we, all men and women, are merely actors—who in their turn play seven acts for the seven stages of our life. But in Shakespeare's gentle mockery at Touchstone:

> Invest me in my motley: give me leave
> To speak my mind, and I will through and through
> Cleanse the foul body of the infected world
> If they will patiently receive my medicine. (II, vii)

Jacques rises to a height, where he turns out the forerunner of later Hamlet.

* * * * *

For the mass of readers and of playgoers, Hamlet has no rival in Shakespeare's works:

> Rightly to be great
> Is not to stir without great argument
> But greatly to find quarrel in a straw
> When honour's at the stake.

Herein lies the key to Hamlet's character. He is a young man of noble breeding, educated in Wittenberg University, the best of its kind. Naturally he is generous and brave, though thoughtful and sensitive. He is a man, we must take him for all in all, for, we shall not look upon his like again. Yet at the bar of a false criticism, he too is made guilty of the catastrophe. But Shakespeare, who watched his hero as he saw him being drawn into the gulf, passed no judgment. Hamlet is presented with a choice, which is impossible. His mother's faithlessness has given him cause for deep unrest and melancholy: he distrusts human nature and longs for death. Then the murder is made known to him.

> Hamlet. The time is out of joint. O cursed spite,
> That ever I was born to set it right. (I, v).

He sees the reality beneath the plausible face of things, and thenceforth the Court of Elsinore becomes for him a theatre where all powers of the universe were contending: but he can not escape since the Ghost advises Hamlet to 'murder and revenge and yet not to taint thy mind'—the touch is characteristically Shakespearean. Thus his nobility and generosity are in sharp conflict with the very idea of murder and slaughter. He turns mad as the sea and the wind, when both contend which is the mightier.

> Hamlet. O that this too too solid (sullied) flesh would melt,
> Thaw and resolve itself into a dew!
> Or that the Everlasting had not fixed
> His canon 'gainst self-slaughter. O God! O God!
> How weary, stale, flat and unprofitable
> Seem to me all the uses of this world!
> Fie on it! ah fie! 'tis an unweeded garden
> That grows to seed; . . . . . .
> . . . . . .
> . . . . . .
> But break, my heart, for I must hold my tongue! (I, ii)

It is against this mirror that we have to analyse the actions and contemplations of Hamlet—his "unpractical temperament"—the portrait of a dreamer. He kills Polonius on the spur of the moment and when he finds his mistake, brushes it aside like a fly, to return to the main business. Before murdering his uncle, he is all through trying to convince himself of the King's guilt. Thus he is hesitant even at the last minute, when he actually stabs the King. And though his own life is taken by treachery, his task is accomplished, now that the story of murder cannot be buried in his grave.

> Hamlet. I am very proud, revengeful and ambitious, with more offences at my back than I have thoughts to put them in, imagination to give them shape, or time to act them in. (III, i)

Hamlet is great because its appeal is undying. It is in Hamlet that we find the greatest drama of character. But it is an untrue assumption that his character is the chief cause of dramatic situation. It is we who are Hamlet. When once we are caught in the rush of events we judge him no more than we judge ourselves. Thus although the plot in Hamlet can scarcely come upto nature, yet it has the vital 'spark', which we all possess and whose expression we all feel at different turns of our life. It is this humanistic touch of Shakespeare that makes his characters live. Hamlet is one of the few world characters, just as Shakespeare's works are one of the few "world-books".

But Hamlet is pre-eminently a tragedy of thought. What Hamlet does is of little importance: nothing that he can do would avert the tragedy, or lessen his own agony. It is not by what he does that he appeals to us, but by what he sees and feels. It is the most "contemplative" of Shakespeare's plays. The questions that confront Hamlet perhaps knock for answer at every heart.

> To be, or not to be, that is the question ;
> Whether 'tis nobler in the mind to suffer
> The slings and arrows of outrageous fortune,
> Or to take arms against a sea of trouble
> And by opposing end them?

But if to die is to sleep, then in that sleep of death, dreams may come and disturb the spirit. And if there is a divinity that shapes our ends, then it is futile to regulate it. What a piece of work is man! how noble in reason: how express and admirable in action: how like an angel in apprehension: how like a god, the beauty of the world ; the paragon of animals. And yet to Hamlet, what is this quintessence of dust? Man delights him not. He is in a pessimistic mood and imagines that to be honest is to be one picked out of ten thousand. But he is generous and passionate. Although occasionally he is overcome with sentiments, yet there is a tragic touch of gentleness in his replies towards his uncle and his mother: "What is the reason that you use me thus: I loved you ever but it is no matter" (V, i). Again, just before the sword-play, Hamlet retorts to such sentimentalism by repeating these words to Horatio ; "But thou wouldst not think how ill all's here about my heart, but it is no matter." Indeed, these are things fundamental, things that touch all, that permanently interest mankind.

* * * * *

But Othello, unlike Hamlet, is a drama of destiny and not one of character. Othello is the least introspective of Shakespeare's characters. His own account of himself is true:

> A man not easily jealous, but being wrought
> Perplexed in the extreme.

There is not another of Shakespeare's plays, which is so white hot with imagination, so free from doubtful or extraneous matter, and so perfectly welded as Othello. The noblest qualities of his mind are the instruments of his crucifiction.

> O, beware, my lord, of jealousy
> It is the green-eyed monster, which doth mock
> The meat it feeds on ; (III, iii)

Thus jealousy is the central theme of Othello, just as ingratitude is the central theme of King Lear:

Lear. Ingratitude, thou marble hearted fiend
More hideous when thou show'st thee in a child ; (I, iv)
Lear. Filial Ingratitude!
Is it not as this mouth should tear this hand
For lifting food to it?

But the difference is that in Othello, it is "destiny" which is shaped by character that is important. In the first two acts, everything that follows helps to raise Othello to the top of admiration. Scene follows scene, and in every one of them, it might be said, Shakespeare is making his task more hopeless. But at last, he invents Iago, the embodiment of the "motive-hunting of a motiveless malignity", whom even luck favoured at every step of his purpose. Even upto the very last, Othello trembles and shudders that:

If she be false, O, then heaven mock itself!
I'll not believe it.

Is it then true to say that in Othello, character is destiny? Othello is not a jealous man. It is not jealousy but the wreck of his faith and love from where the feeling gushes out. The temptation attacks Othello on his blind side. His unquestioning faith in Desdemona is his life ; what if his faith fail him? He knows nothing of those dark corners of the mind, where passions germinate. The man who comes to him is one, whom he has always accepted for the soul of honesty and good comradeship—a trusted friend and familiar, quite disinterested, highly experienced in human life, all honour and devotion and delicacy—for so Iago appeared. He should have struck Iago at the bare hint, as he smote the turban'd Turk in Aleppo. But Iago gives his victim no chance for indignation. Any one who would take the measure of Shakespeare's almost superhuman skill when he rises to meet a difficulty, should read the Third Act of Othello. The quickest imagination ever given to man is there on its mettle and racing. There is a horrible kind of reason on Othello's side when he permits Iago to speak. He knew and believed Iago ; Desdemona was a fascinating stranger. Her unlikeness to himself was a part of her attraction ; his only tie to her was the tie of instinct and faith.

Ah, what a dusty answer gets the soul
When hot for certainties in this our life!

Once he begins to struggle with thought, he is shipwrecked and is in the labyrinth of the monster and the day is lost. But if Othello is simple as a hero, Desdemona is simple as a saint. To the end, she simply can not believe that things are beyond recovery by the power of love. Thus

simplicity and purity of these two characters give to Iago the material of his craft, who has been enthroned as a kind of evil God. But Shakespeare flinches at nothing. There is a strange sense of triumph even in this appalling close. Iago was hoisted with his own petard and the avalanche, which he created by putting fire to the mines of sulphur, caught him too at the end. Knavery's plain face is never seen till used.

Thus we are not left with an utter sense of waste and frustration. Othello and Desdemona must suffer for their greatness. In life they suffer silently. In Shakespeare's art they wear their crown. Act of death turns out to become the act of sacrifice—where evil is chastised and the good comes out in triumph.

* * * * *

With King Lear, perhaps, this tragic course is completed. In Hamlet, the force of evil is active and sinister, though still the prevailing note is weakness of character. Othello gives us, if I may so put it, Shakespeare's earliest creation of a character wholly evil, and at the same time Iago's victim is blameless—human weakness is no longer allowed to share the responsibility with heaven. King Lear carries us right to the edge of the abyss, for here horror is piled upon horror and pity on pity, to make the greatest monument of human misery and despair in the literature of the world; and one purpose of this tremendous catastrophic play was undoubtedly to bring home to those who watched it the terror of life and the unspeakable depths of man's brutality. To hold a mirror up to nature!

Yet Shakespeare the inquisitor is only part of the story. Strangely and wonderfully, there is Shakespeare the lover to be reckoned with too. This then is the secret of his technique. He kept all along that tragic balance between truth and beauty, between inexorable judgment and divine compassion—which was at once a supreme spiritual achievement and a triumph of dramatic technique. Finally, his victory was the victory for the whole human race. King Lear is a piece of exploration, more dearly won than that of a Shackleton or an Einstein; for while they have enlarged the bounds of human knowledge, Lear has revealed the human spirit as of greater sublimity than we could otherwise have dreamed.

King Lear combines the method of Hamlet with that of Othello. It is at once a drama of character and a drama of destiny. Lear is a king 'more sinned against than sinning'. Lear has sinned, so that the play is not a picture of goodness overwhelmed by evil but also of an irascible old tyrant, spoiled by a long life of uncontrolled and immoderate use of power, rising through the discipline of humiliation and disaster to a height unequalled elsewhere in Shakespeare. Gloucester's cry.

> As flies to wanton boys, so we to Gods,
> They kill us for their sport, (IV, i)

is perhaps the moral of the play and there is much to support it. Lear invokes the heavens against filial ingratitude, but instead, the heavens join together with the two pernicious daughters to chastise him. At every turn, destiny pursues him as with hatred until we feel that we are merely helpless puppets in the hands of our fate. But in the final and terrible scene, when Lear enters with Cornelia dead in his arms, we can not think of him as a fly or a puppet. What the meaning of Life may be, we know no more than before, but we marvel at the greatness of man and at what man can endure. Lear is like an eternal and sublime symbol of the majesty of humanity, of the victory of spirit over the worst that fate can do against it. Lear cries out—

> O, Lear, Lear, Lear,
> Beat at this gate, that let thy folly in
> And thy dear judgment out—

even though he is on the brink of incipient madness.

And there is something more. The Lear that dies is not a Lear defiant, but a Lear redeemed. The tempestuous old despot has now no claim except for forgiveness and no desire except for love. And as we turn our eyes from a scene too terrible and pitiable to be endured, is it our weakness or a hint of the Truth that brings back to us words uttered by Lear himself on the way to prison just before?

> Upon such sacrifices, my Cordelia,
> The gods themselves throw incense. (V, iii)

* * * * *

Men will discuss the meaning of Shakespeare's tragedies to the end of time ; as they will discuss the meaning of the universe, for the two meanings are the same. His messages are many. Truth and beauty are the eternal tenets of his faith. "In King Lear Shakespeare succeeded in showing Truth, at its bleakest and most terrifying, as Beauty ; in the Tempest he succeeded in showing Beauty, at its serenest, most magical and most blessed, as Truth." Good can not be finally overwhelmed by evil in Shakespeare's hands, for, after all,

> The Gods are just and of our present vices
> Make instruments to plague us—(Lear. V, iii)

"This is the excellent foppery of the world that when we are sick in fortune—often the surfeit of our own behaviour—we make guilty of our disasters the sun, the moon and the stars". But in the end, the wheel is come full circle.

Another certain message of his tragedies is his views of life and death.

Glou. Alack, Alack the day—
Lear. When we are born, we cry that we are come
To this great stage of fools. (Lear. IV, vi)

The fool does think he is wise, but the wiseman knows himself to be a fool. So some time we shall weep out, the rest we shall whistle. After all, Lear and Cordelia are "not the first, who with their best meaning have incurred the worst". We can but bear free and patient thoughts.

Men must endure
Their going hence, even as their coming hither
Ripeness is all; Come. (Lear. V, ii).

"There's a special providence in the fall of a sparrow. If it be now, it's to come; if it be not to come, it will be now; if it be not now, yet it will come; the readiness is all; since no man has aught of what he leaves what is't to leave betimes"? (Hamlet. V, ii). Herein lies the profoundest philosophy of Shakespeare. Nothing is certain. Shakespeare has no solution to offer, but he gives us something far greater. He has fashioned a mirror of art in which, more successfully than any man before or since, he has caught the whole of life and focussed it to one intense and burning point of terror and beauty. And in so doing he found salvation. But although life is burnt to ashes, yet the soul survives—which is immortal and eternal.

Ham. Why what should be the fear?
I do not set my life at a pin's fee;
And for my soul, what can it do to that
Being a thing immortal as itself? (I, iv)

* * * * *

In the Tempest, "the burthen of the mystery"

the heavy and the weary weight
Of all this unintelligible world,

is growing ever lighter as

that serene and blessed mood
In which affections gently led him on

became more and more habitual. There is no more wonderful description of poetic ecstasy in all poetry than this passage of Wordsworth; and there is no better illustration of its truth than the Tempest. Wordsworth explains the last plays of Shakespeare, and the last plays lend to Wordsworth's lines the force of a new revelation. Prospero's charms work on

the men of the island so strongly that Ariel wants now to befriend them and asks his master if he thinks fit to set them free. And Prospero replies:

> And mine shall.
> Hast thou, (which are but air), a touch, a feeling
> Of their afflictions and shall not myself,
> One of their kind, that relish all as sharply,
> Passion as they, be kindlier mov'd than thou art?
> Though with their high wrongs I am struck to the quick
> Yet with my nobler reason 'gainst my fury
> Do I take part; the rarer action is
> In virtue than in vengeance; they being penitent
> The sole drift of my purpose doth extend
> Not a frown further:

All this is Shakespeare's mellowness. It is here that we are in a realm beyond reason or belief; we are sharing in the beatific vision of the *greatest of all dramatic poets*,

> While with an eye made quiet by the power
> Of harmony and the deep power of joy,
> We see into the life of things.

The Tempest altogether transcends the aim and scope of its predecessors. For what is the enchanted island but Life itself—it is life seen in the mirror of ripe dramatic art, life seen

> not as in the hour
> Of thoughtless youth: but hearing oftentimes
> The still sad music of humanity
> Nor harsh nor grating; though of ample power
> To chasten and subdue.

It is Life as Shakespeare himself sees it with his "recovered" vision. Once it was in the domain of a foul witch, but now beneath the sway of a magician, who has banished fear from it.

> Be not afeared, the isle is full of noises,
> Sounds and sweet airs that give delight and hurt not;
> Sometimes a thousand twangling instruments
> Will hum about mine ears; and sometimes voices
> That if I then had waked after long sleep
> Will make me sleep again—

How like that is to Wordsworth in feeling, how unlike in expression: and it is, wonder of wonders, Caliban who says it.

What then is Prospero who works these marvels? He reminds us of Lear—but a happier Lear with his Cordelia to share his banishment.

There is too much of Shakespeare himself in him ; and I have no doubt that the dismissal of Ariel and the lines :

I'll break my staff,
Bury it certain fathoms in the earth,
And deeper than did ever plummet sound
I'll drown my book—

are his hinted farewell to the theatre.

If Prospero be Shakespeare then Ariel is Shakespeare's poetic imagination, and the Tempest is the play on the life of Shakespeare. Indeed, the very turning point of the play, that is the conversion from the thought of revenge to the thoughts of pity and forgiveness, is not only the turning point of Shakespeare's life but it is also the turning point of all Shakespearean tragedies. Did he really discover that life and tragedy were the same, as Dover Wilson says he did ?

And yet this conversion of thought is prompted not by moral or religious consideration but by poetic imagination. And the apocalyptic vision of the universe to which he gives utterance at the end of his masque (in the Tempest) what is it but an interpretation of Life as a sublime dramatic poem ?

Be cheerful, sir ;
Our revels now are ended. These our actors,
As I foretold you, were all spirits, and
Are melted into air, into thin air ;
And like the baseless fabric of this vision,
The cloud-capped towers, the gorgeous palaces,
The solemn temples, the great globe itself,
Yea, all which it inherit, shall dissolve
And like this unsubstantial pageant faded
Leave not a rack behind ; we are such stuff
As dreams are made on ; and our little life
Is rounded with a sleep.

In all the work of Shakespeare there is nothing more like himself than these quiet words of parting—"Be cheerful, sir ; our revels now are ended."

Yet they are not ended. "Thou wast not born for death, immortal poet"; and the generations who have come after him and have read his books, and have loved him with an unalterable personal affection, must each, as they pass the way that he went, pay him their tribute of praise. His monument is still a living, a "feasting presence"—as Raleigh phrases it—full of light. Now three centuries and a half have passed since King Lear was written ; and we still rub our eyes, and wonder and render thanks.

Impact of Islam on India

AMITAVA MUKHOPADHYAYA—*Sixth Year Arts*

PROF. HUMAYUN KABIR has truly remarked : "The story of India's civilization is the story of synthesis and assimilation." So immense was the assimilative potentiality of the old Indian civilization that the earlier invaders of the country—the Greeks, the Scythians, the Parthians and the Huns were all, within a few generations of their settlement, absorbed within the fold of her population and completely lost their identity. It was because of the stubborn vitality of the ancient Indian civilization that this blending of races in our country did not lead to that intellectual and moral deterioration, which is found among the 'creoles' of what was once Spanish America.

But it did not happen so with the Muslim invaders of India. The advent of the Turko-Afghan invaders was not a national migration, like that of the Scythians, the Huns or the Yuehchi tribes. Even after they settled down in this country, the Muslim ruling classes looked to their native lands for culture and civilization, and several centuries they retained this extra-Indian direction of their hearts. Their social and religious ideas also differed fundamentally from those of the Hindus. Islam, in practice, if not in theory, is a finely monotheistic or aggressive religion where no virtue is attached to tolerance or moderation. It cannot compromise with polytheism or admit plurality of deities. Hence the absorption of the Muslims in the fold of Hinduism by recognizing 'Allah' as one of the numerous incarnations of 'Vishnu' and 'Muhammad' as an inspired sage was impossible. In respect of religion or culture the Muslim invaders were not so backward as the Scythians or the Huns. The Islamic social structure based upon the stern principles of social equality of all believers and social humiliation of all non-believers could hardly reconcile itself with the caste-ridden Hindu society, divided into artificial watertight compartments. The political relations between the two communities were often characterized by bitter strife. Another important thing which prevented the fusion of the conquerors and the conquered was that, from the thirteenth century onward to the middle of the sixteenth, the Muslim state and society retained their original military character and the ruling classes lived in isolated and well-protected urban areas like armed camps in the land. As Sir Jadunath has observed, "down to the time of Akbar the Muslim settlers of India used to be in the land but not of it". For this spirit of non-co-operation, which prevailed for a long

time, the Hindus themselves were also to blame. From the eighth to the tenth centuries A.D., the fluid elements of Hindu society were being poured into a mould where they acquired permanent rigidity for all time to come. A passion to revert to the pristine purity of blood was noticed everywhere. In the 11th century A.D., as the famous scholar and historian Al-beruni (who is renowned for his impartial estimation of Hindu civilization) tells us, the Hindus wished to live in complete isolation from other nations of the earth, whom they called 'Mlechhas' and regarded as definitely inferior to themselves. The religious aversion of the Hindus was naturally strengthened by occasional attempts at forced conversion and destruction of temples and idols on the part of the Muslim invaders.

Yet whenever two types of civilization come into close contact with each other for centuries, both are bound to be influenced mutually. Thus through long association, the growth of the numbers of the converted Muslim community, and the influence of several liberal movements in India, "the Hindus and the Muslims came to imbibe each other's thoughts and customs, and beneath the ruffled surface of storm and stress there flowed a genial current of mutual harmony and toleration in different spheres of life". Sir John Marshall has aptly remarked that "seldom in the history of mankind has the spectacle been witnessed of two civilizations so vast and so strongly developed, yet so radically dissimilar as the Muslim and the Hindu meeting and mingling together. The very contrasts which existed between them, the wide divergences in their cultures and their religions make the history of their impact peculiarly instructive". The Sultanate of Delhi did not lead this movement for collaboration. It was left to the Hindu and the Muslim masses and some enlightened provincial governors like Zainul Abidin of Kashmir and Hussain Shah of Bengal to take the initiative in this matter.

We shall first study the results of this Islamic impact in the political sphere. The Muslim domination over India continued for a period of nearly five hundred years and so we might have expected many important changes in the political field. Unfortunately, however, no big fundamental changes took place in India during this period. The Turko-Afghan state which was established here was a completely feudal state, possessing all the evil features of such an anarchical system. Some historians have found in the rise (towards the end of the 14th century A.D.) of various local states like Bijapur, Orissa, Bengal, Mewar and Vijaynagar the beginnings of modern national system. But the word 'national' has a definite historical connotation,—nationalism being inextricably connected with the growth of capitalist society—and it can hardly be used to describe the character of these states. They did not even cover in all cases some definitely homogeneous linguistic groups. The rise of these states rather demonstrates the temporary triumph of the spirit of local

independence, which has always tried to manifest itself in the body-politic of India.

In spite of a religious belief in the brotherhood of Islam the early Muslims were classbound and feudal in outlook. In matters of local administration they followed the policy of minimum interference, and in respect of the central government no comprehensive scheme of administration was evolved before the time of Sher Shah. Both Sher Shah and Akbar tried to effect a coalescence between the ancient Hindu and Muslim ideals and thus strike a new administrative synthesis. In some important spheres of administration like the revenue system, the police system and the village administration, the old Hindu pattern was followed, but foreign elements predominated in the organisation of the royal court, the higher officialdom and the bureaucracy. The very arrangement of the departments, church-policy, taxation and even the titles of nobles and officials were borrowed from outside India. The provincial administration was also based on the Perso-Saracen model. This scheme of administration was adopted almost in its entirety by all of Akbar's successors and some of its salient features were copied even by the British rulers of India. An independent potentate like Sivaji, who was a life-long enemy of the Mughals, did not hesitate to copy Akbar's system.

Employment of the Hindus in important administrative offices was a necessity of the Muslim rule in India. Besides retaining the existing machinery of local administration, the Hindu headmen and accountants of the villages, the Muslim state had to employ a large number of Hindus in key-posts of administration. Even in the army of the idol-breaker Mahmud of Ghazni, there was a large number of Hindu archers under a Hindu commander named Tilok. The Arab rulers of Sind as well as the so-called slave rulers of Delhi retained the Hindu staff of the previous Hindu rulers, familiar with the work of civil administration. In the Turko-Afghan period we come across the names of several prominent officials like Medini Rāi of Chanderi in Malwa and Purandar Khān, Rup and Sanātan in Bengal. Many of the Muslim rulers took the advice of the Brahman legists on the administration of Hindu law, and Brahman astrologers helped in the performance of their general functions. Their coins were also struck by Hindu goldsmiths. On the other hand, the Vijaynagar emperors employed Muslims in their military service since the days of Deva Rāy II. Hāmir Deva of Ranthambhor gave shelter to a rebel chief of Alauddin at the risk of incurring the Sultan's wrath. The Rajput hero Rānā Sanga was chivalrous enough to respect the independence of his vanquished foe Māhmud II of Malwa. Many of the Muslim rulers were very popular with their Hindu subjects. Sultan Zainul Abidin of Kashmir anticipated Akbar in his pro-Hindu and liberal policy. The Muslim subjects of Ibrāhim Ādil Shāh of Bijapur described him as 'Jagadguru' for his patronage of the Hindus in his state. The Hindus

also went perilously near to making an 'avatar' of the emperor Akbar. The whole Mughal empire was built upon the solid support of the Rajput princes and soldiers, who did not hesitate even to sacrifice their lives in its cause. Akbar sent Mān Singh of Ambar to fight Rana Pratāp Singh while Aurangzeb sent Sawai Jai Singh,—when all his Muslim generals failed him—to check Sivaji. In the early days of his rule even Aurangzeb had a Hindu minister named Raghunāth. Persian was the language used in all official records. The same Mughal coins circulated throughout the whole of India. Officials and soldiers were frequently transferred from one province to another. The native of one province was not quite alien to another. Traders and travellers passed most easily from city to city, 'subah' to 'subah', and all realised the imperial oneness of this vast country. Even outside Mughal territory proper their system of administration, court etiquette and monetary types were borrowed by the neighbouring Hindu 'rājās'. In some native states of Rajputana and Malwa, as late as the thirties of the 20th century the official language was Urdu and the Persian script was used in the state-records instead of Devanagari.

In the economic sphere, the Islamic impact produced very little changes, if the increased momentum of commercial enterprise is ignored. The conquerors did not disturb, even in the slightest degree, the existing productive organisation of the country. This continued as before and all the people—Hindus, Muslims or others—fitted into it.

But the Muslim conquest of India meant a restoration of India's touch with the outer world, which had been established in the early Buddhistic age but was lost with the growth of conservatism in Hindu society. This meant the revival of an Indian navy and India's sea-borne trade both of which had been destroyed with the decline of the Pālas in the north and the Cholas in the south. The Muslim conquest restored India's touch with the rest of Asia and the nearest parts of Africa at the end of the 12th century but with a difference. The Hindus no longer went outside. Only many thousands of foreigners poured into India and some Indian Muslims went abroad every year. In the Mughal period was a great revival of foreign trade and commerce both by land and sea. Through the passes of the Afghan frontier the stream of population and trade flowed into India from Bokhārā, Samarqand, Balkh, Khorāsān, Khwarizm and Persia, because Afghanisthan belonged to the ruler of Delhi as late as 1739. Through the Bolan Pass lay the trade route between Multan and Qandahar and along this route as many as 14000 camel loads of merchandise passed every year in the reign of Jahangir. Another trade route lay from Lahore to Kabul. The main seaports of India were Lahori Bandar in Sind ; Surat, Broach and Cambay in Gujrat ; Bassein, Chaul, Goa, Calicut and Cochin on the Malabar and Negapatam and Masulipatam on the eastern coast, and Satgaon, Sripur, Sonargaon and

Chittagong in Bengal. From these ports ships laden with indigo, cotton textile, pepper, opium and other drugs, sailed for Ceylon, Sumatra, Java, Siam and even China. The main articles of import were bullion, horses, metals, ivory, precious stones, velvet, brocades, perfumes and African slaves. The Mughals also developed a strong navy, which kept the Portuguese, the Mug and the Arakanese pirates in check in the Arabian Sea and the Bay of Bengal and which also took some part in trade and commerce, as the author of 'Ain-i-Akbari' informs us. Towards the end of Akbar's reign India was opened up to Europe by the activities of the Portuguese and Dutch traders. This was a part of the bigger movement towards linking up the different continents of the world. The Muhammadans were the only foreign traders of India if we leave out the few European sojourners in the land.

In agriculture, however, which was the main occupation of the people of Mughal India, there were no changes either in the implements and methods of production or in the agricultural organisation (except the introduction of some new plants like tobacco and sweet potato and some new fruits like grapes and musk melons) and the flourishing external trade did not bring about any amelioration in the conditions of the masses.

In the social sphere there were many important changes. The coming of Islam and of a considerable number of people from outside with different ways of living and thought affected the age-old fixed beliefs and the rigid social structure of the Hindus. A foreign conquest with all its evils has one advantage ; it widens the mental horizon of the people and compels them to look out of their shells.

After the first shock of conquest was over, Hindus and Muslims began to live side by side not so much in the village areas, where superstitions were deep-rooted and the Hindu caste-system was rigid, but in the urban and semi-urban localities. But before long, the two communities made a gradual and hardly conscious approach towards each other's thoughts and ways of life. As of old, India was unconsciously relating to the new situation, trying to absorb the foreign element and herself changing somewhat in the process. Several intercommunal marriages between the ruling members of the two communities helped this rapproachment and some again were the result of it. Firuz Shah Tughluq's mother Nilādevi was a Hindu woman of low origin. So also was the mother of Ghiyasuddin Tughluq. In the south a Muslim ruler of Gulbarga—Firuz Shah by name (1397-1422)—married a Hindu princess of Vijaynagar with great pomp and ceremony. All the big Mughal rulers from Akbar to Aurangzeb had one or more Hindu wives. Jahangir himself was born of a Hindu queen and so also was Khasru. Akbar deliberately followed a policy of matrimonial alliances with the important Rajput royal houses for securing their friendship and active support. Such intercommunal

marriages though rare among the masses and often looked with suspicion did much to soften the acrimonious differences between the two communities and assist the imbibing of each other's customs. In the villages both inter-communal marriages and community-dinners were rare, but the life of the majority of the population had a much more corporate and joint basis. The village Muslims, who were almost invariably Hindu converts, were bred in and surrounded by the old traditions and this was a large factor making for Hindu-Muslim unity. Thus there grew up numerous common traits of life, common habits and ways of living and common tastes in music, painting and architecture as well as in food and dress. They spoke the same dialect, lived in more or less the same manner and faced identical economic problems. Festivals and celebrations like Holi, Dewāli, Dasherā, Bāsanti Panchami, Baisākhi and Muharram were jointly celebrated by members of the two communities. A famous Muslim general Asad Khān of Bijapur was once invited to Vijaynagar to witness the Mahanavami festival. The nobility and the landed gentry taking their cue from the court developed a highly intricate and sophisticated common culture. They wore the same kind of clothes, ate the same type of food, had common artistic pursuits and military pastimes and the same kind of indulgence in hunting, chivalry and games. Polo, hunting, hawking and elephant fights became popular with both the Hindu and the Muslim rulers and nobles. Some Muslims of aristocratic Hindu origin and living in a Hindu environment assimilated the Hindu customs of *Sati* and *Jauhar*. Even in the eighteenth century, which was a period of all-round decline, the continuity of the process of Hindu-Muslim rapproachment formed a redeeming feature of the social life of our country. The 'Jam-i-Jahan Numa', a Persian weekly of the nineteenth century, tells us how the Durga Puja was celebrated at the Delhi court so late as 1825. On his death-bed Mir Jafar drank a few drops of water poured in libation over the idol of Kiriteswari near Murshidabad. Daulat Rao Sindhia along with his officers joined Muharram processions in green dress. The Muhammadans introduced in our country the refinements for which Iran was famous. Some new articles of food and new styles of cookery also came into vogue. In aesthetics, perfumery, and also in music and dancing though not so completely, the Muslim royal family guided the taste of the entire Indian society. Delhi, U.P. and the Punjab formed the centre of development of this mixed Indo-Muslim culture.

The Islamic outlook upon social life was democratic. It set little value upon birth and heredity and its influence quickened in Hinduism the feeling of social equality and tended to break down social barriers or at least counteract the fissiparous tendencies of caste. On the other hand, Islam also gave rise to two great social evils—the seclusion of women and prolific growth of slavery.

There was some segregation of sexes among the aristocracy in ancient India, Iran and Greece and almost over the whole of Western Asia. But nowhere there was any strict seclusion of women. The system originated in the Byzantine courts where eunuchs were employed to guard women's apartments. This Byzantine influence travelled to Russia and the mixed Arab-Persian civilisation was largely affected by it. Yet there was no seclusion of women in Persia, Arabia or Central Asia till the middle of the 13th century. The 'purdah' system spread very rapidly in Mughal times when it became a mark of status and prestige among both the Hindus and the Muslims. The Indian women had now less chances of being educated and their activities were largely confined to the household. This seclusion of women arrested the development of social life and resulted in the degeneration of womanhood. The institution of slavery had also a prolific growth under the Turko-Afghans. The number of slaves of some of the Turko-Afghan rulers like Firuz Tughluq rose into lakhs, and these slaves embroiled themselves in disgraceful intrigues and added to the disorders of the time. The existence of predial slavery in the Mughal period is also definitely known.

In the sphere of religion the first important fact to be noted is the growth of the numbers of the converted Muslim community. The Islamic idea of brotherhood and that of the theoretical social equality of its adherents had a powerful appeal to those in the Hindu fold who were denied any semblance of equal treatment. This together with the imposition of the *Jaziya* helped the spread of Islam. This was also largely due to the proselytizing efforts of a host of Muslim saints and missionaries like Khwaja Mainuddin Chisti of Ajmere, Shaikh Jālāluddin Tabrezi, Qutubuddin Bakhtiyār Kaki, Pir Sadruddin (founder of Khojah sect) and others of less renown, who poured into India since the time of the Ghaznavid invasion. There were many conversions among the lower classes, especially in Bengal. Among such people those who lost caste in Hindu society for some supposed irreligious acts readily became Muslims. Among the lower classes conversions were always group conversions or village conversions, and this explains why some particular occupations and crafts are to-day monopolised entirely by Muslims. For example, most of the weavers, the shoe-merchants, the butchers, the tailors and various other artisans and craftsmen are generally Muslims. Among the upper classes conversions were very rare and piecemeal, and these were actuated mostly by political or economic motives and in some cases dictated by real change of religious belief. As a result of these conversions, Buddhism was completely ousted from the land of its birth, but Hinduism in all its varieties continued as the dominant faith of the land—solid, extensive, self-sufficient and self-confident. The upper caste Hindus had no doubt in their minds about their own superiority in the realm of ideas and thought. The large majority of the Hindu population

remained loyal to their ancient faith. The old Brahmin (Zunnar-Dar) at the time of Firoz Shah Tughluq and their lives rather than change their religion. The Turks, Afghans and Pathans, who attempted the earliest conversions in India, were satisfied with the lip-service of the converts, the reading of the Kalema and the change of name as in China. Even to-day there are numerous religious sects scattered all over India—the Rasul Shahis of the Punjab, the Bhats of U.P., the Maimans of Cutch, the Dude-kulas of Madras, the Turk-nowas of Eastern Bengal and a host of others, whose religious practices and social customs show a curious mixture of Hinduism and Islam. The Deccan remained the stronghold of Hindu orthodoxy, and the reaction against Islamic proselytizing activities in the north was found in the advocacy of stringent caste regulation by Raghunandan and others.

After nearly three hundred years of its stay in India, Islam gradually lost its aggressive and militant character. The wholesome spirit of mutual toleration found expression in the growing veneration of the Hindus for the Muslim saints, particularly of the mystic school, and a corresponding Muhammadan practice of venerating Hindu saints. As Cunningham has observed: "Pirs and shahids, saints and martyrs equalled Krishna and Bhairava in the number of their miracles and the Muhammedans almost forgot the unity of God in the multitude of intercessors, whose aid they implored." Sitalā, the goddess of pox is worshipped even to-day by Pindi Mussalmans, while the Mirasis of Amritsar give offerings to Durga Bhawani. Satya Nārāyana Pir is a combination of Hindu God Nārāyan and Muslim saint Satya Pir. The Baul cult is an extreme form of Hindu-Muslim sublimation. The same spirit is breathed by the Āllopanishad, written by the Hindus themselves. It was out of this desire for mutual understanding that Sanskrit religious literature including the two epics was studied and translated or summarised into Persian or Urdu under the patronage of Muslim rulers like Zainul Abidin of Kashmir, Hussain Shah of Bengal, Akbar and Prince Dara Shukoh. Muslim preachers and saints, were attracted to the study of Hindu philosophy like Yoga and Vedānta. Thus new ideas began to ferment all over the country and new ideas began to trouble peoples' minds. Dr. M. L. Roy Chowdhury has pointed out that this was not an isolated movement or a sporadic growth. "It is in the nature of the world thought movements that civilizations of a more or less similar stratum are affected consciously or unconsciously by common currents. In Europe the intellectual sphere was pulsating with a new wave of scholasticism leading to the Renaissance. The Islamic world and the Indian mind were the recipients of the same thought-currents. The rise of Rāmānanda, Ravidās, Kavir, Chaitanya, Dādu, Nānāk, Nāmdev, Mirābāi and others on the one hand and Saber, Ābu Āli Kālandār, Nizāmuddin Āyulia, Bahlol and others on the other hand were in part due to the same time force." The Hindu

reformers preached on the unity of Godhead, and the fundamental equality of all religions and evolved the liberal and devotional Bhakti cult. They held that the dignity of man depended upon his actions, and not on his birth, protested against excessive ritualism, formalities of religion and domination of the priests, and emphasized simple devotion and faith as the means of salvation for one and all. All of them rose above fanaticism, which was a characteristic of the Middle Ages. The reformers who thus deliberately tried to harmonize Islam and Hinduism often condemned the caste system and made converts freely from Hindus and Muslims. Yavana Haridās was a famous disciple of Chaitanya. The influence of these reformers went far beyond the limits of the particular sects that grew up after them. Hinduism as a whole felt the impact of the new ideas and the Sūfis also tried to benefit by them. What really happened after the Muslim conquest was that these dissenting or reforming movements among the Hindus received a great impetus from the presence of the Muslims in their immediate neighbourhood. "The example of Islamic society acted as a solvent on Hindu prejudice."

The Sūfi movement also afforded a common platform to the more learned and devout minds among the Hindus and the Muhammadans. Unlike the popular religions of mediaeval India, Sufism never extended to the illiterate people, though some Sufi saints came to acquire great personal influence over people of both the communities. It was an intellectual -cum-emotional enjoyment reserved for philosophers, authors and mystics freed from bigotry. Muslim Sūfi saints had come to India with the Arab conquest of Sind (8th century A.D.). According to some scholars like Yusuf Ali, Sufi influence can be traced even in Rāmānuja's (12th century A.D.) doctrine of 'qualified monism' (Viśistādvaita) with its central figure of a personal God and its insistence on salvation by faith and adoration. After coming to India Sūfism was much influenced by the Vedāntic doctrines of the Hindus. By the 16th century Sūfi teachers divided themselves into various orders according to their religious experiences and in India there were as many as seventy-two sects (Bāhāttar Ferqa). From the time of Akbar, Sūfism began to spread very rapidly in India. Its growth was facilitated by the Mahdi movement which preached that after 1000 years of Muhammad's advent (a time which coincided with Akbar's rule in India) a Mahdi would appear to set all disorders at right. Badaoni, a contemporary historian says that "Questions of Sūfism, scientific discussions, enquiries into philosophy and law became the order of the day". This was quite in consonance with the spirit of the time in India. The movement towards theism, which is a living force in modern Hinduism, is largely the result of Sūfi influence.

Under the fostering care of Akbar, Hindu and Muslim thought formed a close union. Akbar's synthetic religion, the Din-i-Ilahi, was

really a code of ethical principles which are common to all religions. But it had no church, no priests and no sacred book of its own and it was definitely not a negation of Islam as Dr. Smith would have us believe. Akbar deliberately made it elastic but he never tried to enforce it on his subjects. The Emperor in the height of his power and glory perhaps refused to realise that it was a hopeless task to construct creeds as a tailor shapes and stitches coats, but his sincerity cannot be questioned. Akbar's mantle as an eclectic and peacemaker in religion fell on his great-grandson Dārāh Shukoh, who openly declared that he had found the fullest pantheism only in the Vedānta, and prepared Persian translations of some of the Upanishads, the Gita and the Yogabāsistha Rāmāyana and wrote another book of Sūfism bearing the significant title of "Majmua-ul-baharain" or 'the mingling of the two oceans'.

The Hindu-Muslim collaboration was not confined only to the sphere of religion and philosophy. The reformers were trying to reach the masses and spread enlightenment. This they could do only through the medium of provincial languages and hence different provincial literatures spread very rapidly. Thus Rāmānanda and Kabir preached in Hindi, Nāmadeva in Marathi, Mirābāi and others in Brajabhāsā, Nānak in Punjabi or Gurumukhi, and Chaitanya and his followers in Bengali. Their writings or songs were, however, more in the nature of aphorisms and not literature proper. Towards the end of the Turko-Afghan period, Bengali literature was embellished by the writings of Vidyāpati and Chandidās, the famous Vaisnava poets, as well as by the compilation of the Bengali Rāmāyana by Krittivās. Sultan Nasarat Shah of Gauḍ had the Mahābhārata translated into Bengali while Mālādhar Basu translated the Bhāgavata under Hussain Shah. In the Mughal period the first great literary works were written in Bengali by the followers of Chaitanya—the Chaitanya Bhāgavat (1537), the Chaitanya-Charitāmrita (1582) and the two Chaitanyamangals (1575). The Mangala Kavyas of Bengal as well as the Mahabhārata of Kāsirām also belong to this period. In the late 17th century a Muslim poet Āl-Alwal of Chittagong wrote poetical romances in Bengali. In the Mughal period there was a brilliant development of original Hindi poetry as a result of the comparative peace secured by a strong government and the stimulating effect of the long glorious and victorious reign of Akbar, who was always anxious to recognize Hindu merit. The greatest man in this field was Tulsidās, whom Dr. Smith describes as "the greatest man of his age in India". Born in 1529 he began his famous classic, the "Rāmacharita Mānasa", when he was well over forty. The second place after Tulsidās may be accorded by unanimous consent to Sūrdās, " the blind bard of Agra". The Hindi literature was embellished also by the writings of some Muslim poets like Mālik Muhammad Jaisi, the author of "Padmāvati" (1540). "Mrigāvat" (1502) and Akbārābat ; Usman, the author of Chitrāvati (1613) and Abdur Rahim Khān Khānān, the son of

Bairam Khān, who wrote poems in praise of Akbar's opponent Rānā Pratāp. Khān Khānān was also a good Sanskrit scholar. The most famous of the Indian poets who wrote in Persian was Amīr Khasrū of U.P. (13th century), "the parrot of Hindusthan". Being born of a Hindu ironsmith girl and himself liberal in outlook, he was sneered at by the orthodox Muslims but he defended his position spiritedly. He not only followed the Indian style but combined it with Sanskrit and Hindi and the topics of his poems were always taken from Indian life and landscape. He has left innumerable folk-songs, some of them written in Hindi, which are sung in many rural areas of U.P. even to-day, nearly 600 years after their composition. Another famous Persian poet was Faizi, the poet-laureate of Akbar. Many important books on history, biography, theology and law were written in Persian in the Turko-Afghan as well as in the Mughal periods. Some Hindu writers also wrote in Persian on Muslim literary traditions as Rai Bhana Mal did in his chronicles. Chandra Bhan Brahman, courtier and diplomat of Shah Jahan, also wrote in Persian.

The necessity of a cosmopolitan language was soon felt for mutual interchange of ideas, and the growth of Urdu (the camp language) out of the mingling of Arabic and Turkish words and ideas with languages and concepts of Sanskritic origin was the result of a linguistic synthesis. This came into being in the 16th century but only as a vulgar spoken tongue, and it became a literary language in the north only at the end of the 18th century, Wali of Aurangabād (1710) having been its first poet of note. But the southern Urdu or Rekhta had produced good poetry a century before Wali.

Another gift of the Muslims to India is historical literature. Before the Islamic conquest, the Hindus had produced only a few books which might be described as true history. Their chronological sense was very imperfectly developed. On the other hand, the Arab intellect is methodological and matter-of-fact. All their records contain a chronological framework, and in them we get a solid basis for historical study. The Persian chronicles which were written under every Muslim dynasty in India, and in every reign under the Mughals together with the biographies and letters of the Muslim rulers form a vast and varied body of historical literature. They not only served as materials of study in themselves but also furnished an example which Hindu writers and rulers were not slow to imitate.

In the domain of fine arts the impact was responsible for the evolution of the Indo-Saracenic school of painting and a new style of architecture. In the earliest Muslim paintings to reach India, namely those of Khorasān and Bokhārā, we see complete Chinese influence. In the court of our truly Indian king Akbar, this Chinese or extra-Indian Muslim art

mingled with pure Hindu art, whose traditions had been handed down unchanged since the days of the Ajanta frescoes and the Barhut and Ellora reliefs. The process of the Indianization of the Saracen art continued after Akbar's time till at last in the reign of Shah Jahan the Chinese influence entirely disappeared, the Indian style became predominant and the highest development was reached in the delicacy of features and colouring, minuteness of detail, wealth and variety of ornamentation, approximation of Nature and other details. The Indo-Saracen art in which the highest genius was displayed by the Indian artists was entirely developed in the courts of the Mughal emperors. Both Akbar and Jahangir gave enthusiastic support and patronage to the artists and the latter was himself an excellent connoiseur of art. This style lingers on in our own time under the name of "Indian art" or "Mughal painting".

In the field of architecture the Muslim rulers destroyed many Hindu architectural monuments but evolved a new style of Indo-Islamic architecture, deriving its character from both Hindu and Muslim elements. The amalgamation of exotic and indigenous styles of architecture was due to certain factors. The Muslims had, of necessity, to employ Hindu craftsmen and sculptors, who were naturally guided in their work by the existing art traditions of this country. Further, in the earlier period of Muslim rule, mosques were constructed out of the materials of Hindu and Jaina temples, and sometimes the temples themselves were only modified to some extent to suit the requirements of the conquerors. There were two characteristic features common to both these styles, which favoured their fusion e.g., the open court, encompassed by chambers and colonnades, and their inherent decorativeness. In the new synthetic style that was evolved the basic element was Hindu, but the form and finish were Muslim. The art of Delhi in the period of the Turko-Afghan Sultanate, however, did not reflect this assimilation, but the Mughal architecture reflects a happy blending of Muslim and Hindu art traditions. Among the architectural monuments of the period, the mausoleum of Sher Shah at Sāsārām, the Jahangiri Mahal of the Agra fort, the tomb of Humayun at Delhi, some buildings of the Fathepur Sikri, Akbar's mausoleum at Sekandrā, the Lahore fort and the Taj in some particulars represent the synthetic style of architecture.

The new art of calligraphy and bookmaking reached a high state of excellence. Among the famous penmen of Akbar's court of whom the Āin has preserved a list, the most distinguished was Muhammad Hussain of Kashmir, who got the title of 'Zarin Qalam' (gold pen). Illumination of manuscripts was introduced by the Mughals and from Akbar's time onward Hindi and Sanskrit works were finely copied and illustrated for the sake of the Hindu Rājās. The Persian book-illumination and calligraphy then done in India enjoys deserved fame in Europe. We owe to the Muhammadan influence the practice of diffusing knowledge by the

copying and circulation of books and the establishment of big royal libraries in our country.

In the field of science the Hindus had inherited a highly developed system of mathematics, astronomy and medicine, and the Arabs, who came to Sind, borrowed much from them in these subjects. But they borrowed also a great deal from Greece and on the combined basis of Hindu and Greek ideas they built up their original systems, which were in no way inferior to those of the Hindus. The Hindu astronomers borrowed from the Muslims their technical terms, the Muslim calculations of latitudes and longitudes, some items of the calendar (Zich) and a branch of horoscopy called 'tajik'. Maharaja Jai Singh of Jaipur (1686-1743) reformed the Hindu calendar, established observatories at Jaipur, Mathura, Delhi and Benares and had some Arabic works in astronomy translated into Sanskrit by his own Hindu pundits. In medicine the Hindus borrowed from the Muslims the knowledge of metallic acids and some processes in iatro-chemistry. The best medical men of the age were the Muslim physicians or 'hakims' practising the Graeco-Arab system of medicine. The art of warfare was also highly developed by the Muslims, partly by borrowing from Europe through Turkey and through Persia to a lesser extent. The imperial Mughal army served as a model for native Indian rulers. The system of fortification was greatly improved, gunpowder was introduced in warfare and cavalry rose to a great prominence eclipsing the elephants of the old Hindu days. The elephant now ceased to be an arm and continued as a mere transport agent. All told, the Mughal period witnessed a distinct improvement in the general standard of Indian civilization.

In fact, in different aspects of life,—arts and crafts, music and painting, in the styles of buildings, in dress and costumes, in games and sports and even in language, literature, religion and culture, the assimilation between the two communities had progressed so much that even when Babur came to India, he was compelled to notice the peculiar "Hindusthani way".

Trends of Modern Literature

SANTA DAS—*Fourth Year Arts*

MODERN trends in literature are driving us to the conclusion that the old order in literary forms is changing. This change has been a gradual process, but however gradual, it has had such a cumulative effect that not only the outward form and structure of literature but the very expression of the author and the poet, his feelings and emotions have assumed a new colour. Behind this change are not single and isolated master-minds, but many years of thinking, of experiencing in common by the body of the people. And so it is the disposition of the reader, more than anything else, that determines the course which literature will follow. There have been literary artists who independent of the public taste have steered literature into new path-ways. But this is genius and genius is rare.

The modern man is steadily growing more pressed for time and his disposition has a restlessness born of the times that cannot be ignored. As a result, brevity in form and realism in spirit are the predominating features in modern literature. A revolution in thought has made men think that spiritualism, imagination, transcendental thoughts are just drugs to the mind and the intellect, that which can be seen, touched and analysed, is regarded as the only truth to be realised. An active reason and a keen analytical power has established itself in literature. All the various forms of literature have been more or less affected by this new trend in thought. Literary forms are changing, long-established popular forms are yielding place to fresh forms that have not only the allurement of newness but have also made a compromise with the spirit of the times.

The future of the novel has been the object of much controversy. Experiments with it do not lead to anything new. The once fruitful source has been dried up and the novel is on the decline. It does not seem likely that novelists like Henry James or Harrison Ainsworth will recur in our times. Though Elizabeth Bowen brings to the modern novel a wonderful craftsmanship, the demand for detail and pattern, of slowly evolving narrative has passed away. A prose style in the pattern of Lamb's—meandering, without suspense but elegant and charming—is doomed. We may regret its disappearance but we cannot preserve it.

To-day the pleasures of reading are restricted to the minimum of time and labour spent in acquiring it. And so in the novel it is required that

---

* Read before the English Seminar.

retaining its essential parts, it should work speedily to the climax, the whole should be well-constructed, breathing the air of the present but containing truths that are eternal.

It is out of this want that the short story has leapt into prominence. Not only is its form and structure suited to the modern age but it has scope for experiments. The quickness with which it is written and its adaptability to the stage, screen and radio ensure its success in the modern age.

But the literary form most affected by this state of affairs is poetry. There is no time to-day to recollect emotion in tranquillity. Poets to-day cannot afford to devote their time wholly to the contemplation of the muses. Poems in the form and style of "Paradise Lost" are not only impossible for the modern poet to attempt but also unacceptable by the age. The "week-end" poets of the modern age succeed the best if like Auden they can find inspiration from the every day objects of the common world. This world of machines and trains, of the sights and sounds of modern life, can help the poet to find a new domain for his poetry and also help him to reveal the beauty of strength and symmetry which were so long ignored. The modern poet even more than the Romantic poet is prepared to admit the personal element in poetry. This element is so pronounced and the poet is so very conscious of it that along with simplicity and realism, symbolism is gradually developing in modern poetry.

Modern poetry as a whole gives impressions not only of the present age but also of the poet's reaction to it, his thoughts, his doubts and also his hopes about it. This life, this world may seem a "waste-land" to it but it has the courage to hope to create a new earth, for the modern mind is courageous.

We thus see that modern literature does not merely give a faint echo of the age but reflects it vividly both in its outward form and in the feeling that is embodied in it. The influence of the times has brought a brevity of form and an ever-increasing economy of expression in literature.

Grace, pomp and elegance have disappeared with the sedate age of complacency. It remains to be seen in the future how these trends in literature will be further developed. Whether at length we will find that the old order was best for literature or whether all controversy will end for good in the decision that the new order will be able to open out a greater world of beauty, of truth, and lead us on in the search for perfection.

Liquid Fuel to the Rescue Again

SUSHIM DATTA—*Fourth Year Science*

IT was a hot and dusty February afternoon, seven miles off Dhanbad. We were travelling in a motor-lorry across the parched and dried coal-area. Suddenly an oasis leapt into our view, a set of yellow buildings enclosed by green lawns and beds of season flowers greeted our burning, thirsty eyes. It was the Indian Fuel Research Institute.

After showing us through the research-rooms, the official guiding us importantly announced that he was going to show us the machine-shop of the Institute where a pilot plant of the Fischer-Tropsch process had been recently erected. Now, you must know that together with the Bergius process, this Fischer-Tropsch process, developed and nurtured in Nazi Germany, had provided for that country's enormous war-time demands for gasoline. What we saw however was a top-heavy, drum-like apparatus, from the bottom of which a rubber-tubing led into a glass-bottle. A few drops of gasoline were trickling down into the bottle. Despite our parched throats, we could not suppress a laugh.

Yet those drops can be turned into millions of gallons of gasoline, genuine India-made gasoline, and economically too. The countries deficient in natural petroleum can produce their own gasoline from coal by the Bergius and the Fischer-Tropsch processes. These are known under the general name of coal-hydrogenation processes. They are carried out with advantage with the low-grade coals which have a high volatile content —and India has plenty of such coal.

Of the two processes mentioned above, the Bergius process is the more direct one. This process can be roughly outlined as follows—

The coal is finely powdered and washed with dilute hydrochloric acid to remove the pyridine bases and the allied basic substances. It has been seen that this washing boosts up the yield of gasoline. The treated coal is next dried, pulverized and screened to obtain particles about one-tenth of a mm. in size. This powder is then pasted with mineral-oil which does not boil below 350°C at atmospheric pressure. The catalyst is also mixed with the paste at this stage. The catalyst generally employed is stannous oxalate. The final paste contains from 35-50 p.c. of coal.

This paste is fed into the liquid-phase hydrogenation unit. This unit consist essentially of a gas-fire furnace, a heat-exchanger and a converter. The coal is charged into the converter under pressure ranging from 250

to 700 atmospheres. The converter is heated to about 400°-480°C and the coal-paste meets a stream of hydrogen here. Incidentally, the hydrogen is prepared from water-gas by a continuous catalytic process. An industrial size converter is about 4 ft. inside diameter, and 40 ft. high. Usually, three or four of them are used in series. The coal is here converted into liquid and gaseous products although some solids, which are mainly coke, ash and catalyst, are also there. The stream of hot hydrogen gas leaving the converters carries away the gaseous and volatile products with it. The gases are passed through condensers and condensate-traps where the liquids are collected. The gas is then scrubbed with oil under pressure to remove the gaseous hydrocarbons and the pure hydrogen is recycled. The crude condensate is distilled and separated into three fractions: (1) The light fraction boiling below 200°C, known as liquid-phase petrol, (2) the middle fraction boiling between 200°C and 300°C, and (3) the heavy fraction boiling above 300°C. The coal-ash, coke and unreacted coal-particles are discharged suspended in a heavy oil consisting of hydrogenated coal of high molecular weight. The chemical composition of the ash is somewhat important because it governs the formation of deposits in the converter. The ratio of the evaporated products and the heavy oil is so adjusted as to provide sufficient heavy oil to be recycled. The adjustment is effected by regulating the reaction temperature and the velocity of the coal-oil paste. The latter is usually such as to allow an average contact time of two hours. It must be clearly understood that the vaporized products have a contact-time much less and the heavy-oil a contact time much more than this average value. However, the slurry coming out of the converter is centrifuged in the sludge-recovery plant to separate the solids and these latter are carbonized when some heavy oil and coke are obtained.

In reality, the term liquid-phase hydrogenation is a bit of a misnomer, for a large amount of the products are vaporized in the stream of hydrogen. However, the term serves to distinguish the process where a fixed catalyst is used and almost all the feed-material is vaporized.

The middle fraction from the liquid condensate is fed into the vapour phase converter where it meets about 10-20 times its vapour volume of hydrogen, preheated to 480°—510°C and is passed through a bed of catalyst material under pressure ranging from 250 to 700 atmospheres, although lower pressures are favoured. The usual composition of the catalyst is 10—30% sulphide of molybdenum or tungsten on a supporting material of 70—90% alumina, activated clay or iron sulphide. The vaporized oils leaving the converter are condensed and the residual gas is passed through an oil-scrubber for the recovery of surplus hydrogen. The throughput in the vapour-phase is 1—2 volumes of liquid oil per volume of catalyst per hour. The liquid product is dehydrated and distilled at atmospheric pressure into two fractions: (1) crude vapour-phase petrol

boiling below 200°C and (2) an oil boiling above 200°C which is re-cycled into the vapour-phase preheater.

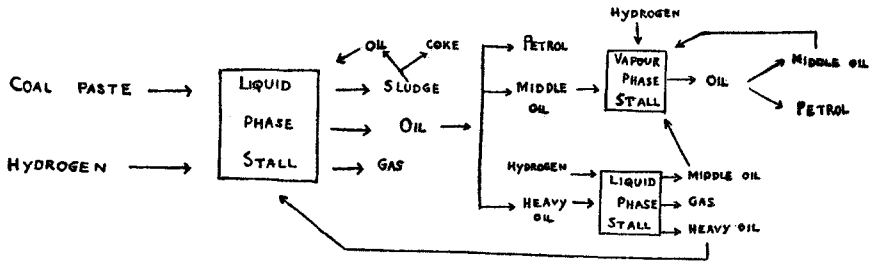

FIG. DIAGRAMMATIC FLOW-SHEET OF THE BERGIUS PROCESS

The vapour-phase petrol and the liquid-phase petrol are collected separately, because they have entirely different physical properties. Both are, however, chemically treated. The gasoline is isolated from the wash liquids and is purified by distillation. The resulting material is a variety of what is known as synthetic petrol. About 4·5 tons of coal are necessary to produce one ton of gasoline. This also includes the amount necessary for generating 75,000 cubic feet of hydrogen, and also for supplying all heat and power-requirements of the process. This process, if judiciously carried out, will provide a valuable use for the enormous lignite deposits occurring in Madras and elsewhere in India. The one supreme advantage of the process is that it does not need high-grade anthracite coal and that it is a compact unit using cheap raw-materials. The Imperial Chemical Industries (U.K.) have been producing gasoline by this process at cheap rates. Following is a detailed production-sheet of the Bergius process.

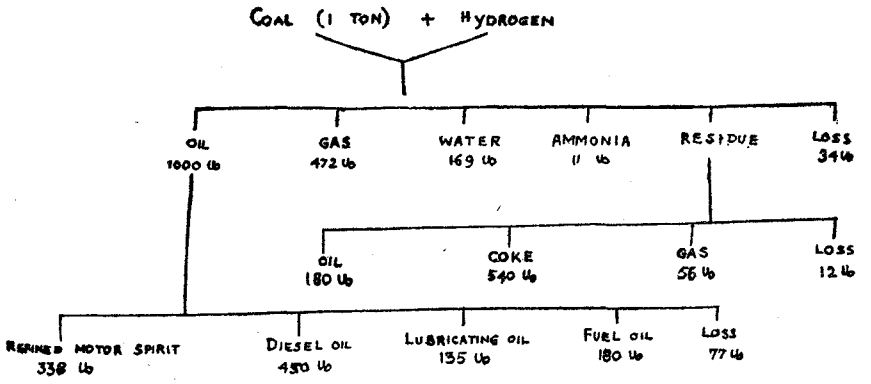

The other coal-hydrogenation process is the Fischer-Tropsch process, otherwise known as the Kogasin process. Essentially it consists in the

catalytic conversion of a mixture of carbon monoxide and hydrogen into synthetic petrol. What is actually done is that air and super-heated steam are alternately blown over a layer of strongly heated coke in a gas generator. As a result a mixture of carbon monoxide and hydrogen, also containing some carbon dioxide, nitrogen and an excess of oxygen, is generated. This mixture is then catalysed at 350°C into a mixture of hydrocarbons. The first reaction is probably the formation of a mixture of carbides and oxides of the catalyst metal. These are then reduced by hydrogen into the unstable methylene and water. The methylene then polymerizes and condenses with more hydrogen, thus forming the desired hydrocarbons. The reaction conditions have to be carefully controlled. However, the feed gases are washed in a spray of water and filtered to remove coal-dust and entrained solids. The gases are then passed through the primary desulphurizing unit where the hydrogen sulphide present as impurity is absorbed in layers of iron oxide. The gases are next fed into the secondary desulphurizing unit where organic sulphur compounds are catalytically decomposed and absorbed in beds of alkanized iron oxide heated to 280°C. This unit was a secret which was well-guarded by the Germans till the end of the second world war. The gases thus purified are passed through the catalyst chamber at a pressure of 1-2 atmospheres. The temperature maintained in the catalyst chamber is 180°—200°C. In the low-pressure process, the catalyst chamber takes the form of a rectangular steel-box about 15 ft. long, 8 ft. wide and 5 ft. high containing horizontal tubes between which the catalyst material is deposited.

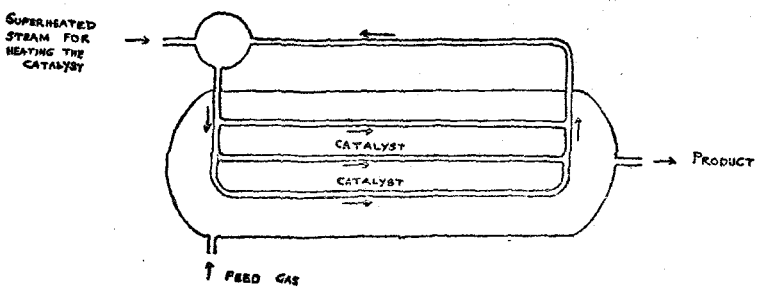

FIG. DIAGRAMMATIC SKETCH OF FISCHER-TROPSCH CATALYST CHAMBER

The purified gases are passed through a heat-exchanger previous to entering the catalyst chamber and the temperature is controlled within narrow limits. The composition of the catalyst varies. A usual composition is cobalt 100 parts, thoria 18 parts, kieselguhr 100 parts and magnesia not more than 2 parts. The gases leaving the converter are led into the condenser where the oil condenses. Other easily condensible portions are trapped by water and oil-scrubbers. The gaseous hydro-

carbons are entrapped in a bed of active charcoal in the absorption tower, and the exit gases are allowed to escape. The process can be utilized within a pressure range of 1 to 10 atmospheres and it has been revealed that the Germans used the low-pressure, medium-pressure and high-pressure plants in co-ordination. The Burmah-Shell Oil Company has erected a Fischer-Tropsch plant in the U.K. Prospects of the process in India are bright. Millions of tons of bunker-coal are lying waste in the coal-regions of India and they can be very profitably exploited by this process. A great advantage of this process is that it is a low-pressure process thus obviating the maintenance of complicated machinery and highly efficient technical staff. This was a widely exploited process in war-time Germany and provided the major portion of her consumption of motor-fuel.

In view of the rapidly dwindling amounts of natural gasoline as also of the enormous increase in the demand of motor-fuel, these synthetic processes provide a new hope to the industrial world and a new, undeveloped field for the industrial chemist. Thus the black and long-ignored coal, that has proved to be the most versatile mineral in supplying man's daily needs, has again come to the lime-light, this time as a saviour.

It is widely known that India is not self-sufficient in motor fuels and she has to import annually millions of rupees' worth of petroleum. It probably remains for young Indian chemists to turn their eyes in this direction and make India self-sufficient in this respect.

Progressive Thought and the Presidency College*

Introduction

OUR heritage—the famous Presidency College tradition—is many-sided. It does not merely include the concept of a 'nursery' of a legion of famous men successful in life, or the sweet ties of comradely happy days remembered in tranquillity, or even the record of startling academic or less spectacular athletic successes. We claim association with what was progressive thought, epoch after epoch, in the wider life of our country in the last five generations. Men connected with our College figure in that history, supplying leadership or participating in the successive waves of thought and action which must be deemed progressive in the perspective of different periods.

We recall today the proud memory of memorable deeds in the lives of such men—the makers, the teachers, the students of the College—a sacred fellowship of diverse elements. Of course only a few names can appear in a short narrative, but all of these we claim as members of this fellowship.

The five generations may for convenience be labelled as the years—1817-1855, 1855-1885, 1885-1905, 1905-1932 and post-1932.

I

1817-1855

First of all, there were the Founders of the Hindu College who in 1816, under the patronage of Chief Justice Hyde East, took the momentous decision to start and maintain an institution to be the fountain of modern Western education in a land where education was overladen with traditional lore often useless for new conditions of life. For the upper classes at least they opened on January 20, 1817, a closed door which would lead on to the wide expanse of the Bengal Renaissance.

Standing aside from the circle of the Founders to avoid unnecessary friction were two pioneers—a foreigner and a heretic. David Hare, the founder of a network of private schools and the School Society, and the great-hearted friend of a generation of students, devoted the last thirty

* This paper was prepared by a committee and read before the Presidency College Peace Convention (March 1952).

years of his life to the spread of modern education in Bengal. Rammohan Roy was the morning star of our Renaissance, and a synthesis of the best thought, eastern and western, of his time. He rescued Hindu theism from the clutches of dead tradition, reinterpreted foreign Christianity in a liberal fashion, initiated the leaven of the Brahmo movement in our life, launched a crusade against social evils, pioneered educational reform in the country, established Bengali prose as a medium of dignified serious thought, paved the path to the first constitutional agitations, and boldly asserted his sympathy with the international liberalism of his day.

The Hindu College, his spiritual child, created a stir in our intellectual life. In the second decade of its existence shone out the genius of Derozio whose admiring students formed the group of Young Bengal, more radical than Rammohan and his associates, and drinking in the intoxicating values of English radicalism and the French Revolution. Derozio founded the Academic Association to teach his boys to debate freely and question authority, and wrote our first patriotic poetry. He was removed from his post in 1831 by the alarmed College authorities. But his disciples kept his memory green even after his premature death in the same year. They brought out the 'Enquirer' and the 'Jnananvesan' in 1831, kept up the Academic Association till 1839, founded a General Knowledge Society (1838) and a Mechanical Institute (1839), and started in 1842 the 'Bengal Spectator'—an organ which advocated even widow remarriage.

Young Bengal was a group of brilliant individuals knit together by the memory of their master and mutual affection, though they failed to give much concrete shape to the liberal values they imbibed or to develop a growing school of thought attracting new adherents from wider circles. They included Tarachand Chakravarti who upheld the right of free speech even in the face of the College Principal ; Krishnamohan Banerji, expelled from home for unorthodoxy, who startled society by becoming a Christian and a missionary ; Ramgopal Ghose, the 'Indian Demosthenes', who protested against European privileges in the Black Acts controversy (1849-1850) ; Rasik Krishna Mallik who left home for the sake of his conscience ; Ramtanu Lahiri, a poor teacher respected by all, who had the courage of his conviction in renouncing the 'sacred thread' in 1851 ; Dakshinaranjan Mukherji, the rich young man whose gift made possible the foundation of the Bethune School and College for Women ; and the two friends Pearychand Mitra, the centre of Calcutta's Public Library, and Radhanath Sikdar, who fought for the rights of the poor 'coolies' in his government department—two friends who also experimented with a monthly magazine in the popular style of the spoken language.

The College was connected also with other men less brilliant than Young Bengal, but engaged in the work of constructive progress. Kasiprasad Ghose wrote patriotic English verses. Prasannakumar Tagore,

son of one of the Founders, conducted a moderate organ—'the Reformer'. Principal D. R. Richardson introduced enthusiastic young men into a new world of appreciation of Shakespeare. Debendranath Tagore turned abruptly away from the life of princely luxury, founded in 1839 the Tatvabodhini Sabha and in 1843 the 'Tatvabodhini Patrika', and breathed new life into Rammohan's Brahmo Samaj by the solemn initiation of himself with twenty associates into the new faith on the Seventh Poush, 1843. In 1851 was formed the British Indian Association which drew in all the trends, radical, moderate and even conservative, with Debendranath as the Secretary, and in 1853 was started its organ, the 'Hindu Patriot'. The 1852 Petition of the Association summed up the first naive political aspirations of the waking middle class—including admission of Indians to higher posts, state aid for Indian industry, and a legislature with Indian majority.

II

1855-1885

The Revolt of 1857 left educated Bengal generally cold, but the Indigo Struggle of 1859-1860 lashed up bourgeois indignation against the planters voiced by the 'Hindu Patriot'. In a white heat of fury Dinabandhu Mitra penned the 'Neel Darpan' (1860) which moved the reading public as few books ever do, and another ex-student of the Hindu College, Madhusudan Datta, rendered it into English. The Indigo Commission of 1860 had to utter a moral condemnation of planter rule in the countryside in the face of this storm.

The outburst was perhaps ephemeral, but now began the creative flowering of the Renaissance literature and learning—the poetry of Madhusudan Datta, the drama of Dinabandhu Mitra, the prose of Bankimchandra Chatterji. Madhusudan came back to Calcutta in 1856, broke away from traditional patterns with the staging of his first drama in 1859, wrote plays of social satire in 1860, and in the same year gave a new turn to Bengali poetry by introducing blank verse. Next year came his epic masterpiece with a daring modern treatment of classic themes, and 1865-1866 saw his introduction of the sonnet form. Dinabandhu was more ordinary though his 'Neel Darpan' soared to great heights and his social plays revealed keen wit and great talents. Bankimchandra evolved a prose style, midway between the heavy classic form and the vulgar colloquial idiom, which was to be our standard for a long period to come. He popularised the historical romance in 1865, the social novel in 1873, the social essay in 1879, and the patriotic novel in 1882. His *Bande Mataram* hymn with all its limitations stirred up the national fervour in succeeding times. Others who shared in the glory of the

literary renaissance were the patriotic minor poets Hemchandra Banerji and Nabinchandra Sen whose verses breathed forth the new national fervour ; and Pearychand Mitra who persisted in his 'Alal' (under the nom-de-plume of Tekchand Thakur, 1858) with the colloquial prose style. Intellectual activity of other sorts was also noticeable—Mahendralal Sarkar founded the Indian Association for the Cultivation of Science in 1876 and Gourdas Basak left some mark on antiquarian research. Sanskrit studies received a great stimulus from Professor E. B. Cowell.

The same exuberance we notice in progressive religious thought as well. Keshav Chandra Sen pulled Brahmoism out of stagnation, made it a force in national life, attracted young men round him, conducted rousing mission tours, became a 'whole-timer' in religious work. He broke away from the original church and caste prejudices, introduced civil marriage, started a pice daily for ordinary people while his associates ran working class education centres. But his mysticism and autocracy soon nettled many of his young comrades who moved on from criticism to open revolt. In 1878, the Young Brahmoes seceded to form the Sadharan Brahmo Samaj under the leadership of Anandamohan Bose among others, drawing to their support the Young Bengal veterans—Sibchandra Deb (the benefactor of his native Konnagar) and the saintly Ramtanu Lahiri. The organ of the new church declared in 1882 that their ideals included universal liberation of all peoples under the banner of democratic republicanism. Brahmoism had not then lost its heroic idealism and many young people all over Bengal cheerfully faced persecution from conservative society and gave up their ancestral homes and property.

Brahmo intransigence produced in reaction Hindu revivalism which emphasised the virtues of social tradition. But revivalism did contribute to the progressive awakening of national pride, though its Hindu bias carried with it a future danger of alienating the non-Hindu elements. Bankimchandra Chatterji stimulated this revivalism though its high priests were Rajnarayan Bose and Bhudev Mukherji. Rajnarayan and his associates organised the Hindu Mela movement from 1867 onwards through the medium of annual fairs of a new type, tried to encourage Indian arts and crafts and to stimulate patriotism through patriotic songs written by Satyendranath Tagore and others.

Finally, this was the age of sustained political agitation. The Indian Association, a true precursor of the National Congress, was established in 1876, by Anandamohan Bose and his friends and the Derozian veteran Krishnamohan Banerji capped his long career as its president. The Association conducted the first all-India political campaigns on issues like the Press and Arms Acts and the Ilbert Bill, and its orators addressed big mass meetings in the districts attended by thousands, and tried even to organise tenants' unions.

III

1885-1905

The Indian Association held the first National Conference in 1883 but the National Congress was founded in Bombay in 1885 when the popular Bengal leaders were deliberately excluded by the sponsors. But in 1886, the second Congress session in Calcutta marked a fusion between the two groups and Bengal came into its own. The early presidents included Ananda Mohan Bose and Ramesh Chandra Datta. The latter was making his mark as our first economic historian and a successful writer of patriotic historical and social romances. The Bengal Provincial Conference was inaugurated by Mahendralal Sarkar in 1888 and the Industrial Exhibition in connection with the Congress by J. Chaudhuri. The protest against Curzon's Convocation Address slanders against Bengal in 1905 was headed by the eminent lawyer Rashbehari Ghose.

This was also the age of the climax of the Renaissance in the emergence of Rabindranath Tagore with whom also our College had a fleeting connection.

The real beginnings of Indian Science on the other hand arose strictly within our portals. Jagadis Chandra Bose was the first to gain international renown in this domain while Prafulla Chandra Ray began his life's mission of training up a host of young scientists who achieved fame in the next epoch. A thrill of justifiable pride passed over the educated classes at this unexpected revelation of new power.

Other famous teachers who left their mark on the cultural history of the period in different branches included C. H. Tawney, H. M. Percival, Prasannakumar Ray, Haraprasad Sastri, Harinath De and Benoyendranath Sen. The last-named and Gurudas Banerjee strove to develop the strength of character of the entire student body. Mention may also be made of Sarodaranjan Ray whose contribution to the rise of Indian cricket is still to be remembered with its stimulus to opening a new line of healthy outdoor activities for our youth.

IV

1905-1932

The fourth generation represents the heyday of our middleclass national awakening from the Swadeshi Movement to the Civil Disobedience. The Partition of Bengal produced a storm which shook educated Bengal to its depths and the consequent agitation influenced countless homes. Ananda Mohan Bose blessed the movement on his deathbed, Rabindranath Tagore gave expression to it in songs and essays, Dwijendralal Ray popularised the weapon of patriotic drama, Benoykumar Sarkar tried to give an intellectual basis to the upsurge.

An offshoot was the cult of revolutionary terrorism and our College also broke new ground by contributing martyrs—from Ullaskar Datta who spent years in the Andamans to Sushil Sen, killed in action, and Santoshkumar Mitra shot down in a British prison. College students, many of them unknown to fame, were drawn into this whirlpool of ecstatic self-sacrifice ; and legend has it that the Eden Hindu Hostel, founded in 1888 as a haven of quiet study, developed into a storm-centre and citadel of revolutionary activity. Practically for the first time, the general student body also was drawn into direct action, Subhas Chandra Bose beginning his famous career in this style.

Nationalistic politics was an absorbing pursuit in this epoch, especially after Non-co-operation gave a mass basis to the Congress. Non-co-operation led to the self-sacrifice of Chittaranjan Das who became a national leader while Nripendra Chandra Banerji and Jitendralal Banerji abandoned for the Cause their professional careers, educational and legal. The orthodox Congress leadership was strengthened by Rajendra Prasad, Lalitmohan Das and Prafulla Chandra Ghose, while Sarat Chandra Bose and Tulsicharan Goswami were luminaries in Swarajist politics in the wake of Chittaranjan himself. Satish Chandra Dasgupta organised Khadi work and helped Prafulla Chandra Ray in running large scale relief to the distressed, conducted by youthful nationalist volunteers. Indubhusan Sen turned towards the first trade union and labour politics, while more and more, Subhas Chandra Bose developed into a leader of the Congress left. All this while, from Non-co-operation on to Civil Disobedience, the actual College students were drawn off and on into strikes and demonstrations which earned for them a notoriety in the eyes of Authority and a reputation in the country at large.

Less interesting but still important was the intellectual endeavours of the period which read like a catalogue but which did establish our national self-respect. Asutosh Mukherjee made our University a teaching centre of higher studies and the College of Science arose on the princely gift of Taraknath Palit. Our self-confidence was stimulated by the work of Satyendranath Bose and Meghnad Saha in physics, Jnanchandra Ghose and Jnanendranath Mukherji in chemistry, while new avenues were opened by Girindrasekhar Bose in experimental psychology and Prasanta Chandra Mahalanobis in statistics. In the domain of philosophy, towered Brajendranath Seal, Krishnachandra Bhattacharya and Surendranath Dasgupta. Historical research came into its own with Jadunath Sarkar, Akshaychandra Maitra, Rakhaldas Banerji, Rameshchandra Majumdar and Hemchandra Raychaudhuri. Serious thinking was stimulated by Hirendra Nath Datta and Ramendrasundar Tribedi, art criticism by Ordhendu Coomar Ganguli. Tae modern style of literary expression was moulded by Rabindranath Tagore, seconded by Pramatha Chaudhuri in his 'Sabuj Patra' and his lieutenants like Atulchandra Gupta. Mohitchandra Sen was

the first editor of Tagore ; Rajsekhar Bose enriched alike Bengal's industry and literature ; Nareshchandra Sengupta preached modernism in literature. Within the precincts of the College, students thrilled to the teaching of the poet Manmohan Ghose and the scholar Prafulla Chandra Ghose and Principal James gained renown as the protector of his wayward students and the champion of the rights of the College.

V

After 1932

The national movement became a much broader stream in the Thirties, but it also entered a period of crisis which emphasised inherent contradictions and began to widen the gulf between a shift towards the right on the part of the older leadership and a swing towards radical dangerous thoughts of new leftism. The crisis represented a process of exhaustion and paralysis creeping over the intellectual middle class which had made the Bengal Renaissance, and a process of awakening of new social classes which are as yet beyond the pale of our educated culture. But it needs courage, faith and vision to realise a parting of the ways, and it is no wonder that the prolonged crisis of the last two decades has brought to most of us frustration, despondency and fits of escapism.

In a fitful, spasmodic manner, life in the College has responded in a fashion to the national crisis. There were hectic moments in the late thirties and the forties when College students were drawn into demonstrations in sympathy with happenings outside and linked up with student agitations or constructive national work like famine relief and anti-riot work. Years of pressure have led to the restoration of the elected College Union suppressed by Authority in the previous period, and the organisation of the Hostel Association on a representative basis. The student body has been more democratised by the recognition of merit rather than family connections as the basis for admission (this has led to the influx of a mass of poorer students new to our College history) and by the opening of the doors to women on a footing of equality. A new momentary solidarity at least found expression in the great strikes of early 1948 and late 1949 when united fights were waged against maladministration and repression.

It is natural that in such a period of hesitation, our middleclass College would lag behind and limp under the control of established yet decadent Authority. In the new circumstances, it is well-nigh impossible for mere Presidency College men to give leadership to the broad currents eddying outside, though two older leaders, Subhas Chandra Bose and Sarat Chandra Bose leaned heavily towards the left. Yet from out of our College fellowship have continued to issue forth volunteers who have tried to identify themselves with the new progress of our times. Enumeration

of names may be invidious and certainly incomplete. Still mention may be made of Kshitish Prasad Chattopadhyaya, the champion of civil liberties ; Rebati Barman and Nirendranath Ray, Marxist critics ; Nirmal-Kumar Bose who has tried to maintain unsullied the Gandhian idealism ; Saumyendranath Tagore, who prefers to run a party of his very own ; Nirmal Bhattacharya, who tried to organise the unfortunate teachers ; Bankim Mukherjee and Hirendranath Mukherjee, silver-tongued orators of the Left ; Nikhilnath Chakravarti, who belongs to the iron frame of what is now the second party in the land ; Subrata Banerjee, who forsook an army career to work for the workers ; Sunil Sen, who has thrown in his lot with the peasants of North Bengal ; Ranajit Guha who rose to the leadership of the students' international ; Golam Quddus, progressive poet and political worker ; and Kalyan Datta who has sacrificed much of his scholastic prospects by following an unpopular path. The list is of course merely illustrative and by no means complete. But it serves to show that our fellowship has not yet lost touch with what happens to be the new thought of a particular period.

Conclusion

We have gone into the past and placed on our roll of honour names linked with what was progressive and vital in each successive period. For this it has of course been necessary to separate two strands in the entity that is the historical character of the Presidency College, to emphasise one tendency and exclude the other. Born under the stimulus of middleclass awakening, our Colege has always reflected the peculiar dual character of a semi-colonial bourgeoisie. We have turned out 'successful' men as well as patriots, men who used their talents to build up worldly careers, as well as men who, in spite of contradictions and limitations, again and again responded to the risky call of the democratic cause of the age.

Whatever the changes in the situation, the College in our days retains this general tendency. Taking part in the Presidency College Peace Week, one feels that once again, and in greater number perhaps, we have marched with the times to take up the banner unfurled by progressive mankind. Peace is on the agenda as the most imperative necessity of the day, and our College has joined up with a far-flung movement.

We live in days when crisis and struggle have overtaken the class that made the Bengal Renaissance. Tortured by doubts, our generation stands at the crossroads—for a road leading away from decay and reaction is being built by the organised movement for freedom and democracy. To many, the future is dark and its problems insoluble ; but surely it is also a future of unprecedented possibilities which cannot but be broadened and deepened by our student youth, who are the heirs of the ages.

The Peace Festival

Peace, they say, is normally and eternally the basic ingredient that makes life sweet. When a 'cold war' solidly plants itself in our midst, and the horrors of atomic and germ devastation loom on the horizon, Peace becomes something equal to life itself.

Our College, evergrowing community of young people for whom life is only just in flower, could not and did not stay passive in the face of the threatening blight. In a spirit of unity and comradeship that shook the cynicism of many people, the College Union took up the issue and acted as one man to bring about the Presidency College Peace Festival. A broadbased Committee was formed with all the sectional secretaries and a number of others, and the General Secretary as Chairman. Every Union department contributed something to create a Peace Festival Fund. There were busy days and harrassed moments until finally, in March, the arrangements were complete and all the letters of invitation to the Calcutta colleges had been sent off.

First on the agenda came a Peace Symposium, regarding which the plans were changed somewhat towards the last. Originally, it was decided to have prominent outsiders and intellectuals take part in the discussion. Ultimately, however—and partly because the speakers somehow failed to turn up—the Committee seized upon the much happier idea of having a more restricted, strictly College convention, with visitors representing the University and Medical College.

No one can pretend that our entire student body attended the meeting, but about two hundred people had gathered in the Physics Lecture Theatre by the time the Chairman of the Committee rose to read his report. Then he read out a Peace Appeal drafted by his Committee—an appeal unanimously adopted by the meeting which was a ringing call for colonial liberation and antiimperialist struggle. As the meeting went on, this Appeal, together with that of the Peace Council, was taken round, and signed by every person present. The Peace Council Appeal was the well-known one, calling for a Five Power Peace Pact, wholehearted work for peace, and banning of the atom bomb.

The work of the meeting was based on three papers, prepared each by a special committee appointed by the Peace Committee. The papers were entitled, respectively, "Progressive Thought and the Presidency College" (a brief historical study of the links our College forged with what was progressive in every different age), "Peace and Literature" (discussing peace as a value in literature) and "Peace and National Reconstruction" (emphasising the necessity and possibilities of a peace economy). A fourth paper—on "Peace and Science" could not be read. At the end of every paper there was some discussion drawing in the visitors as well as the College boys.

Due to unavoidable circumstances, the idea of a poster exhibition had to be dropped but the festival part of the business was a huge success. One summer evening, with the well-lit library hall crowded to capacity, and a vast, good-humoured audience taking active interest in everything, the call of peace once again rang out insistently, in music, poetry and song. All our local talent had been mobilised and they responded splendidly; the items ranging from a spirited rendering in duet of Sukanta Bhattacharya's "Runner", to the recitation

by Dipen Bannerji of one of his own poems. A visiting batch (PG Geography) gave us 'Lili Marlene', in Bengali,—a song underlining 'the pity of war'. One or two 'peace' songs of Tagore were sung.

As the evening wore on, and the tempo rose, the audience thrilled to three items presented by the 'Bahurupi' artists to whom we owe our heartiest thanks. Their 'Kabuki'—based on Japanese technique and a very real national content—presented everyday laughter and romance—and then sudden death, as hot lead pours down on hunger marchers in the street. Skilfully juxtaposed lines from Tagore recited singly, in duet or in chorus, carried a concrete and complete meaning to the listeners. Last came Sambhu Mitra's inspired recitation—'Madhu Bansir Gali'—vigorous promise of a happier tomorrow. Another outsider to whom our thanks must go is the poet Bimalchandra Ghose who read his well-known poem on Peace.

The festival was over in two days but one may safely assert that it lives in many minds. Not only because of the preparatory work among the students, like the mass signature campaign, or the exhibition debate on Peace which came little later. But the issue of Peace is so clear and living and non-controversial. 'Dewali' the Union wall-newspaper had been doing its bit, with Peace editorials and a special Peace Number. The latter brought out many poems, written by persons of varying opinions in other matters, but only one opinion on Peace. But then, this is only natural. For Peace is not simply a word in poetry, nor the Dove a mere work of art. Peace is an issue that confounds those mischief-mongers who try to represent it as a slogan of this party or that ideology. It is the most urgent, democratic and loudly-ringing call of the day, enriching life and art with a new meaning, gathering to itself a company whose name is legion.